## প্রথম প্রশ্নোত্তর

স্থান—ঢাকা, মোহিনী বাবুর বাটী। সময়—২০ মার্চ, ১৯০১, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা

প্রশ্ন। কর্ম্ম কি? যজ্ঞাদি কর্ম্মই কেবল কর্ম্ম-সংজ্ঞক কি না?

উত্তর। 'দানমেকং কলৌ যুগে' কলিযুগে দানই কর্ম্ম। যথা—বিদ্যাদান, অর্থদান, অন্নদান, প্রাণদান ইত্যাদি। 'পুণ্যং পরোপকারে চ পাপঞ্চ পরপীড়নে।' স্বার্থত্যাগই প্রকৃত মহত্ত্বের নিকষ। প্রকৃত মহাপুরুষের দ্বেষবুদ্ধি নাই।

## দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর

স্থান—উক্ত মোহিনী বাবুর বাটী সময়—২১ মার্চ, ১৯০১।

প্রশ্ন। স্বধর্ম্ম কি?

উত্তর। এ বড় শক্ত প্রশ্ন। স্বধর্ম্ম—প্রকৃতি অনুসারী ধর্ম্ম, অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

জ্যোতিষে প্রকৃতিজ ধর্ম্মের কথা লইয়া ব্রাহ্মণবর্ণ, শূদ্রবর্ণ প্রভৃতি হইয়াছে। আবার গীতাতে অর্জ্জুনের প্রতি ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে। আমার মতে প্রকৃতিজ ধর্ম্ম হইলেই যেন ভাল হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকাতে দুইটি মাত্র বক্তৃতা করেন। প্রথমটি ১৯০১ সালের ২০শে মার্চ অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় তখনকার জগন্নাথ কলেজের হলে টিনের ঘরে প্রদত্ত হয়। উহার বিষয় ছিল, 'What I have learnt?' আমি কি শিখিয়াছি? সৌভাগ্যক্রমে উক্ত বক্তৃতাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং উক্ত বক্তৃতাটি যতদূর সম্ভব বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় আমার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উক্ত বক্তৃতাতে তাঁহার মুখে এই মহাবাক্যটি প্রথম শ্রবণ করি:—

'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ'

তিনি বলিলেন—'First, a human birth is neccessary. Next,

you should have a thirst for God and spirituality. This is admitted by all universally. Next point is peculiar to your religion.—you require a Mahapurusha—a Guru. He must be a ব্রহ্মবিৎ,—he must know God, before he can make you know God, for the blind cannot lead the blind অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' ইহার ভাবার্থ এই :—প্রথমতঃ মানবজন্ম আবশ্যক, তৎপরে ভগবানের ও ধর্ম্মের জন্য পিপাসা চাই। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। পরবর্ত্তী কথাটি আপনাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব। আপনাদের একজন মহাপুরুষ অর্থাৎ গুরু চাই। গুরু আবার 'ব্রহ্মবিৎ' হওয়া আবশ্যক। আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার পূর্ব্বে, তাঁহার নিজের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা চাই, কারণ একজন অন্ধব্যক্তি অপর অন্ধকে চালাইতে পারে না; চালাইতে গেলে উভয়েই গর্ত্তে নিপতিত হয়।

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—'For the last 25 years, I have been a seeker of truth, but found only book-learning and pride of sect. At last it pleased God to join me with a Mahapurusha?' অর্থাৎ বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ আমি সত্যের অনুসন্ধানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সত্যের পরিবর্ত্তে পুস্তকের বিদ্যা ও সাম্প্রদায়িক অভিমান প্রাপ্ত হইয়াছি। অবশেষে ভগবানের কৃপায় একজন মহাপুরুষের সহিত আমার সংযোগ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ঢাকা পোগোজ স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ৩১শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত হয়। উহার বিষয় ছিল, 'The Religion we are born in' (আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম)। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেদিন তথায় উপস্থিত হইতে পারি নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি আর একটি মহতী শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে উহা এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায় আমিও 'Idolatry' বা পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলাম; এবং হিন্দুধর্ম্মের আগাগোড়াই 'Idolatry' ও 'Superstition' ইহা আমারও মত ছিল। কিন্তু

ভগবৎ কৃপায় বিবেকানন্দজীর ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরের ধর্ম্মমহামেলাতে প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠে এ বিষয়ে আমার চিরন্তন সত্য লাভ হয়। উক্ত বক্তৃতা পাঠে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে হিন্দু ধর্ম্মের দেবোপাসনা 'Idolatry' হইলে, 'Church,' 'Altar,' 'Sabbath day,' 'Cross' প্রভৃতি সমস্তই 'Idolatry'তে পরিগণিত হয়। উক্ত বক্তৃতাতে বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছেন,—'Why does a Christian go to church? Why is the Cross holy? Why is the face turned towards the sky, in prayer? Why are there so many images in the Catholic church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a mental image, than we can live without breathing.' এই বাক্যগুলি এইরূপে অনূদিত হইয়াছে, 'আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তবে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ "ধর্ম্মালয়" বলিয়া এক স্বতন্ত্র স্থলে কেন তাঁহার আরাধনা করিতে যান? কেন তাঁহারা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? প্রার্থনার সময় কেন তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন? ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ভুক্তদিগের ধর্ম্মমন্দিরে এত মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে কেন? প্রার্থনাকালে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ীদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মূর্ত্তির বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবন ধারণ যেরূপ অসম্ভব, চিন্তাকালে মূর্ত্তি বিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।

ঢাকাতে পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতাকালেও তিনি এ বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'Englishmen condemn idolatry —that's a long word and therefore must be bad. It is surely bad, the reason being—Englishmen call it so.'—সাহেবরা পৌত্তলিকতা ঘৃণা করে সুতরাং এ তো খারাপ হবেই। পৌত্তলিকতা নিশ্চয়ই খারাপ কেন না ইংরেজরা একে খারাপ বলে। কিন্তু এস্থলেও তিনি ইংরেজদের প্রতি নিন্দারভাবে একথা বলেন নাই। কারণ তিনি

তৎপরেই বলিয়াছিলেন,—'However godspeed to these Englishmen for they form a part of the economy of the Great Mother and they are fulfilling their mission. অর্থাৎ ভগবান্ এই ইংরেজদিগকেও সাফল্যমণ্ডিত করুন। কারণ তাঁহারাও সেই জগন্মাতার কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছেন। এখানেই প্রকৃত বেদান্তবাদীর বিশেষত্ব। তিনি সকল ঘটনাতেই সেই বিশ্বজননীর হস্ত দেখিতে পান, সুতরাং তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না।

বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম 'Idolatry' (পৌত্তলিক) তো নহেই, পরন্তু উহা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র সম্মত, উদার এবং বিশ্বজনীন।

আমি একদিন স্বামিজীকে বলিলাম, 'আমি আপনার উপদেশাদি অপেক্ষা আপনার আমেরিকা ও ইয়ুরোপ ভ্রমণ কালীন আশ্চর্য্য ঘটনাবলী শুনিতে অধিকতর লালায়িত।' তিনি আমেরিকা অবস্থান কালীন একটি ঘটনা বিবৃত করিলেন। উহা আমার হৃদয়ে চির জাগরূক থাকিবে। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও মধুর সারগর্ভ বক্তৃতাদি শ্রবণে একজন কোটিপতির পরমাসুন্দরী যুবতী তনয়া ও উত্তরাধিকারিণী এত মুগ্ধা হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় আবাস বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব,—দেহ, মন, প্রাণ, ঐশ্বর্য্য—তাঁহার চরণে সমর্পণ করার আকাঙ্খা ও প্রার্থনা জানাইলেন, এবং একথাও বলিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্যে (in his mission of life) তিনি তাঁহার সহযোগিনী হইবেন। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে একজন চিরকুমার সন্ন্যাসী এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহার, অনন্যসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য্য! স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—

'তোমার এই প্রস্তাবের জন্য আমি তোমার নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; কিন্তু তোমার যেমন শরীর মন প্রাণ প্রভৃতি অর্পণ করিবার স্বাধীনতা আছে আমার সেরূপ অধিকার মোটেই নাই। আমার শরীর, মন, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ রামকৃষ্ণের শ্রীচরণে চিরতরে সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অক্ষম।'

এই কথাগুলি তাঁহার মুখে শুনিতে শুনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল এবং সেগুলি চিরদিনের জন্য আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আমার মনে তখন যে ভাবরাশি উদ্বেলিত হইয়াছিল তাহা বাক্যে বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমার মন বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রমে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিবেকানন্দ স্বামী বলিলেন, 'আমেরিকাতে শত শত মাইল রেলগাড়ীতে যাইয়া একস্থানে বক্তৃতা দিতে হইত। আবার যথোচিত বিশ্রামাদি না করিয়াই স্থানান্তরে গমন করিতে হইত এবং বক্তৃতা দিতে হইত। ইহাতেই শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' আমি বলিলাম, 'আপনার জীবন আমাদের পক্ষে কত মূল্যবান! এবিষয়ে সংযত হইয়া চলিলেন না কেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'তখন নিজের দেহের কথা মনেই আসে নাই।' এ কথা অতীব সত্য। নিজের দেহের কথা মনে থাকিলে কোন ব্যক্তিই জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

মহাপুরুষদের দয়া ও স্মরণশক্তি অত্যাশ্চর্য্য। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম 'পরমহংসদেব আপনার মধুরকণ্ঠের যে সকল সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইতেন, সেই সঙ্গীতগুলি আমাকে গাহিয়া শুনাইতে হইবে।' একদিন রাত্রিতে দেখি আমার তৎকালীন গেণ্ডারিয়াস্থ বাসাতে যাইয়া হঠাৎ তাঁহার প্রেরিত লোক উপস্থিত। সে বলিল, 'এখন গান হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন।' আমি তো অবাক্ হইয়া গেলাম। শত শত অপরিচিত ব্যক্তির শত শত প্রশ্ন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি আমার ন্যায় একজন সামান্য ব্যক্তির প্রার্থনা মনে করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ মোহিনী বাবুর বাটীর দিকে ছুটিলাম। তথায় যাইয়া দেখি মহাত্মা শত শত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। দূর হইতে আমাকে দেখিবামাত্র 'এহেহি বিদ্বন্' 'এহেহি বিদ্বন্' এইরূপ আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি ইহাতে সহজেই আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি লজ্জায় অধোবদন

হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিয়া উপবেশন করিলাম। পরে আমার প্রার্থনানুরূপ তাঁহার সুকণ্ঠে পরমহংসদেবের প্রিয় কতিপয় সঙ্গীত শ্রবণে চরিতার্থতালাভ করিলাম।

আর একদিন বলিলেন, 'সার্ভিয়াতে (Servia যাইয়া হিন্দু সওদাগর দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহারা তথায় আতর, গোলাপের ব্যবসায় করিত। সেই সব মাড়োয়ারী বণিক স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপে গিয়াছিল। তাহারা তথায় হিন্দু সন্ন্যাসী পাইয়া যে কত শ্রদ্ধাভক্তি ও আদর করিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।' এই ঘটনা দ্বারা ভারতীয় লোকদিগের সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

বিবেকানন্দ স্বামী যে কয়দিন ঢাকাতে ছিলেন, ততদিন সাধ্যানুরূপ তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছি এবং সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য চিরজীবন প্রাণে অনুভব করিতেছি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন :—

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥'

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়।

---

# বুদ্ধ-গয়া

বুদ্ধ-গয়ার মন্দির হিন্দুগণের হাত হইতে বৌদ্ধদের হাতে যাওয়া উচিত কি-না, ইহা লইয়া আজকাল দেশে আলোচনা চলিতেছে। বুদ্ধ-গয়ার মন্দির বৌদ্ধগণকে দেওয়া উচিত—মহাত্মা গান্ধী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ এই মন্দির নির্ম্মিত সুতরাং বৌদ্ধগণের উহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অথবা বৌদ্ধগণ ভগবান তথাগতের 'বুদ্ধত্ব' লাভের পর মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অতি প্রাচীনকাল হইতে তথায় অর্চ্চনাদি করায় মন্দিরের উপর তাঁহাদের ন্যায্য দাবী জন্মিয়াছে—এই

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কি-না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এইরূপ গুরুতর বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্য লওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ—শ্রীবুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধ-গয়ার সহিত ভারতেতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ইতিহাসের আলোকে এই সমস্যার অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া যাইবে এইরূপ মনে করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ইতিহাস সহায়ে প্রথম আমাদের দেখিতে হইবে,—বোধিদ্রুম ও বুদ্ধ-মন্দিরের সহিত হিন্দু ও বৌদ্ধগণের সম্পর্ক কাহার কতখানি, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মেরই বা সম্বন্ধ কি এবং বুদ্ধ-গয়ার সম্পত্তি কতদিন কাহার অধিকারে আছে।

## বোধিদ্রুম

প্রথমে বোধিদ্রুমের বিষয় আলোচনা করা যাক্। অনেকের ধারণা যেহেতু ঐ বৃক্ষের নিম্নে গৌতমবুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহাকে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ধারণা কি সত্য? কারণ, বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমের নিম্নে সিদ্ধিলাভ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুগণ ঐ বৃক্ষকে পূজা করিতেন—এইরূপ অভিমতও এদেশে প্রচলিত আছে।

"Sujata had vowed to spend every year a hundred thousand on an offering to the sacred 'Nigrodha' tree in the village of Uruvela, if she was married into a family of equal rank, and had a son for her first-born child. She sent her slave-girl Punna ahead, who beheld the Bodhisattava seated under the tree."*

এখন কথা হইতেছে, বুদ্ধদেব যে-বৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন

* Archæological Report, Page 142. 1908—9.

তাহা পূর্ব্ব হইতেই পূজিত হইত এই তথ্যের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি-না? Dr T. Bloch বলেন,—

The stone seat under the tree indicates that Buddha himself is seated there. The high wall, with a double row of pinnacles, may certainly be taken as representing the enclosing walls, which already at that time surrounded the sacred area, and which as Hiuen Tsiang tells us, were, "built of bricks, high and strong; the enclosure was long from east to west, and narrow from north to south, and it was above 500 paces in circuit."

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, সুজাতা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ (বোধিদ্রুম) পূজা করিতে যাইবার সময় তাঁহার দাসী বোধিসত্ত্বকে উহার নিম্নে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন, বৃক্ষের প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর গৌতমবুদ্ধ বসিয়া সমাধিযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ বৃক্ষ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পূজিত হইত বলিয়াই উক্ত বৃক্ষ ঐরূপে সুরক্ষিত হইত; সুতরাং হিন্দু-পূজিত বৃক্ষই যে পরে 'বোধিদ্রুম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আজকাল বোধিদ্রুমরূপে যে বৃক্ষ আমাদের নিকট পরিচিত তাহা সেই প্রাচীন বৃক্ষ নহে, কারণ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কগুপ্ত সেই বৃক্ষকে এক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। Hiuen Tsiang বলেন—

"In recent times Sasanka, the enemy and oppressor of Buddhism, cut down the Bodhi Tree, destroyed its roots down to the water and burnt what remained. A few months afterwards Purna Varman, the last descendant of Asoka on the throne of Magadha, by pious efforts brought the tree back to life, and in one night it became above ten feet high."

রাজা পূর্ণবর্ম্মা, মহারাজাধিরাজ অশোকের বংশধর সুতরাং তিনি নিশ্চিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এইরূপ মনে হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তিনি হিন্দু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে Dr. T Bloch বলিতেছেন—

"His name Purna Varman, does not suggest that he was a Buddhist , on the contrary, its formation with Varman is in strict accordance with the rules laid down in the Grihya and Dharma Sutras in regard to the names for Kshatriyas, and, moreover, we met at that time with a number of kings ruling over southern Magadha and its adjacent countries, whose names are formed in exactly the same manner, and whom we know for certain not to have been Buddhists."

বর্ত্তমানে যে বৃক্ষ 'বোধিদ্রুম' নামে পরিচিত, প্রাচীন কালে হিন্দুগণ কিরূপে উহার পূজা করিতেন তাহার বিশেষ পদ্ধতি অবগত হওয়া যায় না, তবে অধুনাতন সময়ে যে ভাবে উহার পূজা হইয়া থাকে তাহা মণিরামকৃত 'গয়াযাত্রা প্রয়োগ' নামক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই। যথা—

"নমস্তেঽশ্বত্থরাজায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মনে।
বোধিদ্রুমায় কর্ত্তৃনাং পিতৃণাং তারণায় চ॥
অস্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবাঃ দুর্গতিং গতাঃ।
তদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু তে ক্ষয়ম্॥
ঋণত্রয়ং ময়াদত্তং গয়াং আগত্য বৃক্ষরাট্।
তৎপ্রসাদাৎ অহং মুক্তো সংসারার্ণব সাগরাৎ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্রীবুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে হিন্দুগণ বোধিদ্রুম নামে পরিচিত বৃক্ষকে পূজা করিতেন, হিন্দুরাজা শশাঙ্ক গুপ্ত ঐ বৃক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন, পূর্ণবর্ম্মা নামা অন্য একজন হিন্দু রাজার চেষ্টায় পুনরায় উহা মঞ্জুরিত হয় অথবা পুরাতন বৃক্ষের স্থানে তিনি একটি নূতন

বৃক্ষ রোপণ করেন এবং হিন্দুগণ এখনও ঐ বৃক্ষকে যথারীতি পূজা করিয়া থাকেন ।

## বুদ্ধ-মন্দির

বুদ্ধ-মন্দির কাহার দ্বারা কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের লিখিত পুরাতত্ত্ব হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে, বর্ত্তমান বুদ্ধ-মন্দির মহারাজ অশোকের নির্ম্মিত নহে। মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বিহার কালক্রমে ধ্বংস হওয়ায় সেই স্থানে 'অমরদেব' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান বুদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক হুয়েন্থসিয়াং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"On the ancient site of the temple the king Asoka hăd at first erected a small vihara. Subsequently it was a Brahman who constructed it in grand proportions."

হুয়েন্থসিয়াংএর উল্লিখিত বুদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাতা ব্রাহ্মণের নাম, Mr. Fergusson কোন সময়ে Mr. Groteকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে,—"A temple was erected, according to an inscription found on the spot about the year 500 by a certain Amar Deva"

এই ব্রাহ্মণ "অমর" হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যদিও হুয়েন্থসিয়াং বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণ হিমালয়ে গিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, আবার মহাদেবের আদেশেই এই ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন,' * আমাদের নিকট

* Having learnt that the God was to be found in the mountains of snow (Himalaya) he proceeded with his younger brother to address to that God his vows. * * * The God said to him, "Return quickly on

তথাপি ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ, মহাদেবের উপাস্য ব্রাহ্মণ তাঁহারই আদেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শেষে তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়া গেলেন—ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তারপর "অমর দেব" এই বাক্যটির উপর আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "দেব" উপাধি পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কোন বৌদ্ধকে হিন্দুর 'দেব' উপাধিতে ভূষিত করা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

এখন এই সন্দেহ উঠিতে পারে যে, অমর দেব হিন্দু হইলে বুদ্ধদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে যাইবেন কেন? ইহা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। যদি মহারাজ পূর্ণবর্ম্মা হিন্দু হইয়া বোধিদ্রুমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ উপদ্রবের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে পারেন * তাহা হইলে অন্য কোন উদার হৃদয় হিন্দু ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন—ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? তারপর ভগবান্ বুদ্ধ শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার বলিয়া হিন্দুগণ কর্তৃক পূজিত হন, সুতরাং তাঁহার মন্দির কোন হিন্দু নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু, ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইলেও বুদ্ধ-গয়া হইতে প্রাপ্ত এবং অধুনা কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত একটি শিলালিপি পাঠে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হই। পাঠকগণের অবগতির জন্য Dr. T. Bloch কৃত উহার ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম,—

---

your feet, stop before the Bodhi Tree, erect there a grand Vihara." This was a Brahman, who, by order of the God Mahesvara, transferred his faith to the law of Buddha, and testified his zeal for his new religion by erecting the large Temple.—Hiuen Tsiang.

* The Bodhi Tree was afterwards restored by Raja Purna Varma, who surrounded it with a stone wall about 24 feet high to prevent it being again cut down."—Cunningham.

"In the 26th year of the reign of Dharmapal, on the 5th day of the dark fortnight of Bhadrapada, on a Saturday, a 'linga' with four faces had been set up in the pleasant abode of the Lord of Dharma (*i.e.* Buddha) by Kesava, the son of Ujjvala, the stone cutter." কিন্তু, "A linga with four faces" চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ শিবলিঙ্গের 'চতুর্ম্মুখ' হওয়া তো দূরের কথা 'এক মুখ'ই হয় না ; তাই আমাদের মনে হয় Dr. T. Bloch কৃত শিলালিপির পাঠোদ্ধার নির্ভুল নহে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাই আমাদের অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়,—

"For endless virtue, and for the good of the inhabitants of Mahabodhi an image of the four mouthed Mahadeva was consecrated by Saka, the son of the noble sculptor Syanabhara * * * in the 26th year of the great king Dharmapal, on the 5th of the wane (of Bhadra) on the day of the son of the light (Saturday)."

Dr. T. Bloch এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদের মধ্যে অল্প পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, রাজা ধর্ম্মপালের ষড়্‌বিংশ রাজত্বকালে বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপালের ষড়্‌বিংশ রাজত্বকাল খুব সম্ভবতঃ ৮৫০ খৃষ্টাব্দে হইবে, সুতরাং নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই চতুর্ম্মুখ মহাদেবের অস্তিত্ব বুদ্ধ-মন্দিরে এখন পাওয়া যায় না, তবে অনুমান ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিবলিঙ্গ সদৃশ একটি শিলাখণ্ড বুদ্ধ-মন্দিরে পাওয়া গিয়াছিল। Mr. Beglar তদানীন্তন মোহান্তের অনুমতিক্রমে তাহা স্থানান্তরিত করেন।

* "There was at one time a Shiva linga on the floor of the temple but even that was removed by Mr. Beglar with the Mohanth's consent which lends support

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে যখন সিংহলবাসী ভিক্ষু ধর্ম্মপাল মহাবোধিতে ভগবান তথাগতের মূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন তখন তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার বিচারকালে বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শিলাখণ্ড সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। বেগলার সাহেব যাহাকে শিবলিঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা শিবমূর্ত্তি কি-না সম্পূর্ণ সন্দেহজনক, বিশেষতঃ যখন জানা যাইতেছে যে শঙ্কর সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী মঠাধ্যক্ষ সেই লিঙ্গকে স্থানান্তরিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন তখন সেই প্রস্তরমূর্ত্তি স্যার গুরুদাসের মতে কোন চৈত্য বা স্তূপের চূড়া হওয়াই সম্ভব।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্প্রতি বুদ্ধগয়ার যে Report বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, খুব সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে বুদ্ধগয়ার তত্ত্বাবধান-কার্য্য বৌদ্ধগণের হাত হইতে চলিয়া যায় (The Buddhist guirdianship of the shrine seems to have come to an end in the fourteenth century কিন্তু একদিনেই ইহা সংঘটিত হয় নাই। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্ব-কালে বুদ্ধ-গয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে যখন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দুগণ তথায় অল্পাধিক অধিকার পাইয়াছেন—বলিতে হইবে। অবশ্য পরে ঐ অধিকার তাঁহারা হয় তো আংশিক হারাইয়া থাকিবেন কিন্তু, একেবারে উহা নষ্ট হয় নাই। কারণ, নবম শতাব্দীর পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে আর মাথা তুলিতে পারে নাই, হিন্দু-রাষ্ট্রশক্তি উহাকে দিন দিন অবনমিতই করিতেছিল।

## বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধ

নবম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী—এই পাঁচ ছয় শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল,

---

to the suggestion that it was not really a Shiva linga but the upper portion of the Chaitya or Stupa kept there." (Judgment of Justice Gurudas Banarjee).

ইহার প্রমাণ পুরাণ সমূহে আমরা দেখিতে পাই। কারণ কয়েকটি প্রধান পুরাণে শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ আছে এবং এই সকল পুরাণ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদ গজনির সহিত বিখ্যাত জ্যোতিষী Alberuni যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন 'মৎস্য', 'আদিত্য' ও 'বায়ুপুরাণ' তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেকটি পুরাণেরও নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং উহাদের তাৎকালিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্যরূপে হিন্দুধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যাইতেছিল। পুরীর বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ এইরূপেই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। শুধু পুরীতে নহে, ভারতের বহু-স্থানে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি বিভিন্ন হিন্দু দেবতারূপে আখ্যাত হইয়া এখনও পূজিত হইতেছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া যে মহত্তর ও বৃহত্তর হইয়াছে—ইহা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

উদার হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহাদের ইচ্ছা হইয়াছে স্বাধীন ভাবেই তাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম, ইহাতে কাহাকেও কখনো বাধা দেয় নাই। সাংখ্যাচার্য্য কপিলমুনি

* "কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্।
বুদ্ধো নবমকো জজ্ঞে তপসা পুষ্করেক্ষণঃ॥"

মৎস্যপুরাণম্।

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥
ইত্যেতাঃ কথিতাস্তস্য মূর্ত্তয়ো ভূতধারিণি
দর্শনং প্রাপ্তুমিচ্ছানাং সোপানানি চ শোভতে॥"

বায়ুপুরাণম্।

যেরূপ শ্রীভগবানের অন্যতম অবতাররূপে পূজিত হন, বৌদ্ধ দর্শনের প্রবর্ত্তক তথাগত বুদ্ধকেও তদ্রূপ ভগবানের অন্যতম অবতাররূপেই হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন। তবে, উত্তর কালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অনাচার যখন সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে কলুষিত করিতেছিল, তখন দেশ ও সমাজকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাৎকালিক বিকৃত-বৌদ্ধধর্ম্মকে দমন করা হিন্দুদের অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের সহিত হিন্দুগণের সংঘর্ষের বিষয় ইতিহাসে আমরা যাহা কিছু অবগত হই, তাহা এই কারণেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

## সম্পত্তি

কিন্তু, বর্ত্তমানে বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণের সহিত হিন্দুদের যে মতদ্বৈধ হইতেছে তাহা বুদ্ধ মন্দির কিংবা তৎসংলগ্ন জমা জমা লইয়া, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মন্দির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি, এখন বুদ্ধ-গয়ার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হস্তগত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Buddha Gaya নামক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে জানা যায়, যখন বুদ্ধ-গয়া বহুশতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ বক্ষে লইয়া নাম মাত্রে পর্য্যবসিত, যখন গভীর অরণ্য পরিব্যাপ্ত ভগ্নাবশিষ্ট চৈত্য, স্তূপ ও বিহার সমূহ শ্রীবুদ্ধ এবং তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের পুণ্যস্মৃতি কেবল দর্শকের মনে জাগাইয়া দিত, তখন ঐ স্থানের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া 'গিরি' সম্প্রদায়ভুক্ত ঘমণ্ডিনাথ নামক জনৈক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া একটি আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি দেহরক্ষা করিলে চৈতন্য গিরি নামক তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য বুদ্ধ মন্দিরের সীমানার মধ্যে তাঁহার গুরুদেবের শরীর সমাহিত করিয়া তদুপরি একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাদেব গিরি, চৈতন্য গিরির শিষ্য। এই বিদ্বান সন্ন্যাসীর চরিত্রমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার জন্য একটি সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, সুলতান সাহ আলাম তখন দিল্লির রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি একটি 'ফার্ম্মানে' মহাদেব গিরিকে বুদ্ধ-মন্দিরের স্বত্ব এবং উহার

প্রধান মোহান্তের পদগৌরব দান করিয়াছিলেন। মহাদেব গিরির শিষ্য লাল গিরি তৎপরে মোহান্ত পদে বৃত হন এবং এই পরদুঃখকাতর সন্ন্যাসী বুদ্ধ-গয়ায় একটি সদাব্রত স্থাপন করেন। লাল গিরির প্রশিষ্য যখন বুদ্ধগয়ার মোহান্ত, তখন তিনি মহাদেব গিরির সময়ে নির্ম্মিত মঠের সহিত নূতন প্রকোষ্ঠাদি সংযুক্ত করিয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে বর্ত্তমান ইংরাজ সরকারের রাজত্ব কালে লাল গিরির বৃদ্ধ-প্রশিষ্য শিব গিরি মস্তিপুর তারাডি নামক গ্রামের মৌরসী মোক্‌রোরী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া মঠের বিশেষ উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঘমণ্ডিনাথ গিরির সময় হইতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমসাময়িক মোহান্ত হেমন্ত গিরির সময় পর্য্যন্ত বুদ্ধ-গয়ায় যে দুই একটি মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হয়—ঐ মঠের কোন মোহান্ত অথবা কোন মোহান্তের ভক্ত-শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের গুরু-মহারাজের এবং তদীয় আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও অতিথিঅভ্যাগতদিগের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সম্পত্তির উপর বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দাবী থাকিতে পারে না। অন্যপক্ষে ইহাও বলা যায়, ঘমণ্ডিনাথ বুদ্ধ-গয়ায় আসিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ মন্দিরে শ্রীবুদ্ধের যে ভাবে পূজা অর্চ্চনা করিতেন বর্ত্তমানে তাঁহাদের ঐরূপ পূজাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং চিরকাল থাকা উচিত।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে ইহা নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় যে, বুদ্ধ-মন্দিরের উপর বৌদ্ধদের মত হিন্দুদেরও যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে, সুতরাং মন্দিরের একাধিপত্য লইয়া যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি না হয় এবং যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত না করিয়া নিজ নিজ ভাবানুযায়ী শ্রীবুদ্ধের পূজা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত। অধিকন্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মিলিত ভাবে এইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহাতে বুদ্ধ-গয়া অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা ও বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়।

—চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

---

# মৃত্যু-প্রশস্তি

এসো এসো এসো প্রাণবঁধু মোর মানস মোহন রূপে,
জাগায়ে পরম সুখ শিহরণ, প্রতি রোম কূপে কূপে,
এসো কারুণিক পরম দয়াল         কে বলে তোমায় ভীষণ ভয়াল
অশরণ জনে তুমি চিরকাল অবিচারে দাও কোল
হে সমদরশি ! ও পদ পরশি ঘুচে যায় সব গোল।
তোমারি পরশে প্রণয় রভসে আবেশে অলস কায়
ললিত মধুর তোমার নূপুর ঐ বুঝি শোনা যায়।
লোপ হয়ে আসে জাগতিক বোধ,         মূক হয় ভাষা চির বাক্‌রোধ,
মুগধ নয়নে জনমের শোধ আলোক নিবিয়া যায়
না ভাষে রসনা না শোনে শ্রবণ, নয়ন ফিরে না চায়।
জানিনা'ক বঁধু কি তোমার নাম জানিনা কে বঁধু তুমি
জানিনা হে মোর মন অভিরাম কোথা তব বাসভূমি
কেহ বলে কাল, কেহ বা রুদ্র,         বুঝিতে না চায় এ অতি ক্ষুদ্র,
শুধু জানে চিরতরে রব, তব অভয় কোলেতে ঘুমি।
কহ কোন নিধি পাঠায়েছে বিধি দাসীরে করিতে দান
যাহার প্রভাব সকল অভাব করে দেবে অবসান,
চাহনি তোমার দানিছে অভয়,         ভ্রূকুটি কুটিল কই সে তো নয়,
কাল-সিন্ধু কোলে লভিতে বিলয় চির সুখ নিরবাণ,
এ জীবন-মরু-নিঝরে হের গো ছুটিছে প্রেমের বান !
তুমি যে আসিবে একদিন তাহা জানিতাম আমি বঁধু,
সকলে ত্যজিতে পারে বটে (তবু   তুমি ত্যজিবে না শুধু
দিবে প্রিয় তুমি দিবে ধ্রুব দেখা,         সোনার আখরে ছিল ইহা লেখা,
হোক্ সে আজি বা শত যুগ পরে পাইব পরশ মধু,
এই সে আশায় সহে তিয়াসায় পরাণ চাতক বঁধু !
এসো নবঘন প্রিয় দরশন নয়ন শ্রান্তিহর,
পরশ তোমার মরি কি অপার নিবিড় নিবিড়তর,

নীরব শীতল সমাধি গভীর,　　　　অসীম শয়ন স্বপন মদির,
　　যে মুখ দরশ লালসে আলসে শিথিল এ কলেবর,
　　ঊষর হৃদয়ে সুধা প্রবাহিনা ছুটে চলে খরতর।
　　কেননা বাসিব ভালো ? তোমা বঁধু ! কেননা বাসিব ভালো ?
　　কত না যুগের আঁধার গহনে প্রথম উষার আলো !
তব সাথে চুপে এসেছে বারতা,　　　হেথা হতে মোরে নিয়ে যাবে তথা,
　　কোন্ পথ দিয়ে জানিনা সে কথা থাক তা অন্তরাল
　　অচেনা সুহৃদ তোমারি আশায় বসে আছি কতকাল !
　　যাব কোন্ দিক জানিনা তা ঠিক জানিতেও নাহি চাই,
　　সকল মানিব সফল যদি গো বারেক তোমারে পাই,
জানি ধ্রুব নাই সন্দেহ ইথে　　　　সব বন্ধন ঘুচাবে ত্বরিতে
　　ভব-কারাগার হইতে আমার মুকতি পাইব ফিরে,
　　ফিরে পাব মোর হৃত স্বাধীনতা সারাটি জগৎ ঘিরে।
　　বাঞ্ছিত মোর এসো কাছে, আরো কাছে আরো কাছে,
　　তোমারে চাহিয়া হের অভাগীর জীবন আজিও আছে।
কিবা দুঃসহ দারুণ বিরহ,　　　　বেদনা হের গো সহি অহরহ,
　　তোমারি আশায় শিরায় শিরায় শোণিত আজিও নাচে,
　　মরণেরে যাচি রহে শুধু বাঁচি কে হেন জগৎ মাঝে ?
　　কোন ত্রিদিবের দূত তুমি ওগো শুভসন্দেশবহ !
　　আসিয়াছ আজি আমার সদনে কাহার বচনে কহ ?
পাঠায়েছে বুঝি নিখিলশরণে,　　　এতদিনে তাঁর পড়েছে কি মনে ?
　　চির আশ্রিত দীন অকিঞ্চনে, সাদর মিনতি সহ,
　　আমি তো চিনিনা সে অজানা পথ, হাতে ধরি মোরে লহ।
　　এ জীবন ঢালা, আধি ব্যাধি জ্বালা সকলি বিফল নয়,
　　তব আগমনে ভাতিছে নয়নে সার্থক সমুদয়
আহা কি করুণ ও তোমার মুখ,　　　দেখে দেখে মোর ভরে উঠে বুক,
　　আহা কি অপার এ আমার সুখ আজি যেন মনে হয়,
　　যা তোমার দান, তাই শুভ—ওগো শিব মঙ্গলময় !

শ্রীনীহারিকা দেবী।

# আকাশের মূল ধারণা

আকাশ বুঝতে হলে প্রথমে তাকে একটা নিরবয়ব সত্তা ( Absolute continuity ) বলে বুঝতে হবে। জড় বলতে আমরা বুঝি যার অংশ সকল সাবয়ব ( discontinuous ) পদার্থ। এদের সীমা আছে এবং দুটি জড়াংশের ( particles ) মধ্যে ফাঁক থাকে—যেমন আকাশের তারা এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না, পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকে। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে, তবে সে কারণ নির্ণয় করা বড় সোজা নয়। বর্ত্তমানে আমরা যা প্রত্যক্ষ করচি তাইতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। দুটি তারার মধ্যে যে ভেদ আছে, তুলনায় জড়ের একাংশ থেকে আর এক অংশে ঠিক সেই রকম ভেদ আছে। আকাশে যদি অনন্ত গতি সম্পন্ন একটা হাউই ছোঁড়া যায় তা হলে কোনও জিনিযে নাও লাগতে পারে। লর্ড কেলভিন বলেন, এলো-পাতাড়ি গুলি করলে যেমন পাখীর গায় না লাগারই খুব বেশী সম্ভাবনা, আকাশে কিছু ছোঁড়াও ঠিক তেমনি। জড়ের অংশ সকলের মধ্যে বিপুল ব্যবধান বর্ত্তমান এই টুকু প্রথমে ধারণা করতে হবে।

অবশ্য বলতে পার, আকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারা যায়, কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে কি বলছ? এক টুকরো পাথর কোনও একটা কঠিন বস্তু সম্বন্ধে ঐ ধারণা কি করে করব? তুমি কি বলতে চাও একটা জড়ের ক্ষুদ্র অংশ সকলের মধ্যে এমন ব্যবধান রয়েছে যে, একটা সরল রেখা দিয়ে যদি সেই বস্তুটাকে ভেদ করা যায় তা হলে সেটা কোন অংশকে আঘাত না দিয়ে সিদে বেরিয়ে যেতে পারে? হাঁ যেতে পারে। এই জন্যই জড়াংশ সকল সাবয়ব। এই জড়াংশ সকলের সীমা কখনও অতি অল্পরূপে কখনও অধিকরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত পক্ষে অংশ সকল অতি সূক্ষ্ম এবং তাদের সীমা রেখাও খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু পাশাপাশি এমন ভাবে তারা সাজান

আছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়েরা তা গ্রহণ করতে পারে না, এবং তারা যখন একত্র মিলিত হয়ে একটা প্রত্যক্ষ যোগ্য সীমার সৃষ্টি করে তখন আমরা সেই সীমাগুলোকে বড় ও ছোট বলে থাকি। অনুবীক্ষণ সেই অতি ক্ষুদ্র সীমাগুলো দেখবার খানিকটা সাহায্য করে মাত্র। শেষ সীমা রেখা নির্ণয় করা তারও সাধ্যের অতীত। অতিবড় শক্তিশালী অনুবীক্ষণও একটা পরমাণুর (Atom) পরিধি দেখতে পায় না, তা পরমাণু আবার যা দিয়ে তৈরী তাদের দেখা ত দূরের কথা। এখানে অনুমান দরকার। এখন আমরা অনেকেই জানি জড়-পদার্থ (অবয়বী) এক প্রকার ধনী (Positive) এবং ঋণী (Negative) বৈদ্যুতিক পদার্থে (Electric Charges) তৈরী, যাকে আমরা বিদ্যুতিন্ (Electron) ও কেন্দ্রিন্ (Protons) বলে থাকি (অবয়ব)। একটা পরমাণুতে বিদ্যুতিনগুলোর মধ্যে যে ব্যবধান, তুলনায় সূর্য্যের সঙ্গে গ্রহগুলোর ঠিক সেই ব্যবধান। একটা পরমাণুতে ঠিক আকাশের মত অধিকাংশই অবকাশ। একটা যদি খুব জোরাল অণুবীক্ষণ পাওয়া যায় তা হলে যে কোনও এক টুকরো জিনিষ, তা দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, একটা বিরাট নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার রাত্রির আকাশ।

যেহেতু অবয়বেরা (Particles) বিচ্ছিন্ন, সেই জন্য তাদের কারো সঙ্গে কারো সম্বন্ধ থাকতে পারে না, তারা পরস্পর স্বাধীন এবং তাদের পরস্পর সংযোগও অসম্ভব, তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল শূন্য অবকাশ। যদি কেবল জড় অবয়ব ছাড়া আর কিছু না থাকে তা হলে কোনও একতা, বন্ধন, সংযোগ প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর হয় না এবং ধ্বংসের বিশৃঙ্খলা (Chaos) থেকে সৃষ্টি-শৃঙ্খলা (Cosmos) রচনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা দেখছি জগতের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা রয়েছে, প্রত্যেক নক্ষত্রের সঙ্গে প্রত্যেক নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ (Law of Gravitation) শক্তির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত রয়েছে। (অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা এখনও হয় নি)। কাজেকাজেই ঐ শক্তিপ্রবাহের আধারও (medium) আমাদের কল্পনা করতে হয়। তাই আমরা বলতে চাই অবয়বের মধ্যে যে অবকাশ তা শূন্য নয় তা পূর্ণ—যার

মধ্যে ফাঁক (gap) নেই, যা নিরবচ্ছিন্ন (continuous) এবং যা সমস্ত জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে রচনা করেছে।

যে কোন কঠিন ( Solid ) পদার্থ সম্বন্ধে এ কথা খাটে। এক টুকরো পাথরের অবয়বগুলো ( particles ) একত্র সমবেত হয়ে রয়েছে, কেউ কাকেও ত্যাগ করে থাকতে পারে না। কোথায়ও এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক কঠিন পদার্থে একটা বিশেষ আকার আছে, আর যদি সেটা স্ফটিক ( crystal ) হয়, তা হলে তার একটা স্পষ্ট সুন্দর আকৃতিও দেখতে পাওয়া যায়। কাজেকাজেই বলতে হয় অবয়বের মধ্যেও নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। তাদের মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে কিছু আছেই। অবকাশ খালি থাকে না, তবে সেখানে জড় পদার্থ না থাকতে পারে। জড় পদার্থ-গুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের যে সংযোজক তা কোনও অবয়ব দিয়ে তৈরী নয়, সেটা হল অনবচ্ছিন্ন এবং তার আকর্ষণী শক্তির (cohesion) দ্বারা সকলকে সমবেত করে রাখে। এই সংযোজক পদার্থকে যা খুসী নাম দেওয়া যেতে পারে। তবে প্রাচীনেরা একে মাঝে মাঝে আকাশ আখ্যা দিয়ে গ্যাছেন। তাঁরা চারটি ভূত ছাড়াও আকাশের কল্পনা করেছিলেন। স্যার আইজাক নিউটন একে সংযোজক (Connecting medium) বা সম্বন্ধ-বহ, বলতেন। চক্ষের সঙ্গে কঠিন বা তরল পদার্থের অবয়বের (particles) সঙ্গে যা সম্বন্ধ-বহ, তাই আকাশের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র, রাশি (constellations) নীহারিকা (nebulae) এবং ছায়া-পথের (milky way) মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করছে। সমস্ত অবয়বী (matter) এবং অবয়বের (particles) সংযোজক এই আকাশ। এতেই সব ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এতেই তাদের রূপের পরিবর্ত্তন ঘটছে। এই সম্বন্ধ-বহ সম্বন্ধে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে।

অবয়বগুলি এই আকাশ থেকে পৃথক নয়, খুব সম্ভব এই আকাশ দিয়েই তৈরী। তারা ঠিক আকাশে ভাসমান সরষের মতন নয়, বরং লবণাক্ত জলে যেমন স্ফটিকগুলো (crystals) ভেসে উঠে, যেমন জলে

বরফ ভাসে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ-ফেন সেই রকম আকাশে অবয়বেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন এই আকাশ ও অবয়বের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ কিরূপ তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি—সন্ধানের খুব চেষ্টা চলেছে। একটা অবয়ব তার আধার আকাশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে নড়তে চড়তে পারে না, যেমন একখানা নৌকা তরঙ্গের সৃষ্টি না করে, জলের ওপর দিয়ে যেতে (oscillate) পারে না বা যেমন একটা ঘণ্টা বাতাসে কম্পনের সৃষ্টি না করে বাজতে পারে না।

এখন আমাদের দ্বিতীয় জিনিষ শিখতে হবে যে আকাশের আলোক-বহনের শক্তিটি কি? ইতিহাসে আকাশ সম্বন্ধে আলোক-বাহিত্বই প্রথম ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিদ্যা এতেই তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে; আর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell) আকাশ ও তরঙ্গ সম্বন্ধে চূড়ান্ত অনুমানে উপস্থিত হন। চক্ষু-বিজ্ঞান এর থেকেই গড়ে ওঠে। কিন্তু এখনও তার সম্বন্ধে আমরা সঠিক যুক্তি পাই নি। কেবল গোটাকতক সরল সত্য ঘটনার ওপর সেগুলো গড়ে তোলা হয়েছে।

সকল মনীষীই আলোকের গতির (Velocity of light) দ্রুতত্ব (speed) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত। জড়জগতে দ্রুতত্ব একটা মস্ত ব্যাপার। সব জিনিষই আমরা এটাকে অবলম্বন করে অনুমান করি। কাজেকাজেই এ জিনিষটাও আর একটা বিরাট প্রাকৃতিক জগতের সহিত জড়িত যার অর্থ এখনও আমাদের বোধগম্য হয় নি। তবে যেটুকু ঐ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করবো। পৃথিবীর অন্তর্গত বা আকাশের গতি আমরা মাপি সময় দিয়ে। একটা বিশেষ গতির একটা বিশেষ স্থানে পৌঁছুতে কতক্ষণ সময় লাগে এরই নাম হোল দ্রুতত্ব (speed)। একটা বিশেষ গতির দ্রুতত্ব নির্ণয় করে আমরা আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি, কারণ আলোক-বহ আকাশের সকল তরঙ্গের দ্রুতত্ব একই প্রকারের। কোন বস্তুর রূপতন্মাত্র যে বিশেষ গতিতে ভ্রমণ করে, আকাশের অপরাপর চাঞ্চল্যও সেই

একই গতিতে ভ্রমণ করে। আকাশের যে তরঙ্গ সে সমুদ্রের তরঙ্গের মত বড়ও হতে পারে যেমন আমরা রেডিও বার্ত্তাবহে লাগিয়ে থাকি অথবা বীচিমালার মত ক্ষুদ্রও হতে পারে যাহা কঠিন জড়ের উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে উত্তাপের সৃষ্টি করে, কিংবা তার চাইতেও সূক্ষ্ম কম্পন সৃষ্টি হতে পারে যেমন রূপতন্মাত্রার গতি—যা থেকে আমাদের রূপের জ্ঞান হয়, অথবা ক্যামেরার ( Camera ) প্লেট্ বা ফিল্‌মের ওপর পড়ে বিপরীতমুখী চিত্রের ছাপ দেয়; কিংবা ঐ কম্পন আরও সূক্ষ্ম হতে পারে, যেমন এক্স রে ( X ray ) তে। একে বৈদ্যুতিক শক্তি বলে। বিদ্যুৎ জিনিষটা জড় না শক্তি ঠিক্ বোঝা বড় কঠিন। এখন আকাশের এই যে চাঞ্চল্য তা বড়ই হোক আর ছোটই হোক্ তাদের দ্রুতত্ব একই প্রকার। একটা সূতার কল্পনা কর যেটা পৃথিবীকে কোটিবন্ধের মত জড়িয়ে আছে। সেটাকে যদি একটা সরল রেখায় বিস্তার করা যায় তা হলে যে দূরত্ব হয়, আলোক তরঙ্গের সেই দূরত্বকে অতিক্রম করতে এক সেকেণ্ডের সাতভাগের একভাগ সময় লাগে। কাজেকাজেই এক সেকেণ্ডের আলোকের গতি সাতটা বিষুব্ রেখাকে (Equator) অতিক্রম করতে পারে। আলোকের এক সেকেণ্ডের গতির ব্যাপক যে সূত্র সেটা পৌঁছুবে প্রায় চাঁদে গিয়ে। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আস্‌তে লাগে ১¼ সেকেণ্ড। সূর্য্য থেকে আলো আস্‌তে লাগে ৮ মিনিট। আর নক্ষত্র থেকে আলো পৌছুতে বহুবর্ষ লাগে, এমন কি শতশত শতাব্দীও অতিক্রম হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে একটা টেলিস্‌কোপ্ দিয়ে যখন একটা তারা দেখ্‌চি, সে তারাটা তখনকারের নয়, লক্ষ বৎসর আগেকারের তারা; কারণ সেই তারার আলোক আমাদের টেলিস্কোপে আস্‌তে লক্ষ বৎসর কেটে গেছে। এখন আমরা এই যে বিশ্ব বিশ্ব করি সেই বিশ্বটা কত বড় একবার চিন্তা করে দেখ। পৃথিবীর দুটো চারটে ব্যাপার দেখে যে আমরা সব সর্ব্বজ্ঞ হইছি মনে করি, সেটা কি রকম বাতুলতা!

এ সব কথা আজকাল সকলেই জানে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ওই

তরঙ্গগুলোব প্রকৃতি ঠিক ঠিক জানা। কি করে তাদের জন্ম হয়? উপমান (Analogy) ছাড়া তাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে জানবার কোন উপায় নেই। ঘণ্টায় ঘা মারলে যেমন তার কম্পন বাতাসে ছড়িয়ে দেয় এবং সেই তরঙ্গ যেমন আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে ঠিক তেমনিই বিদ্যুতিনের (electrons) চাঞ্চল্য আকাশ পথে—তরঙ্গের সৃষ্টি করে। কিন্তু বাতাস-তবঙ্গ এবং আকাশ-তবঙ্গ একই জিনিষ নয় সাদৃশ্য আছে মাত্র।

তরঙ্গ মানতে গেলেই তরঙ্গায়িতও মানতে হবে। দেশ কম্পিত হয়—কথাটা বড় আশ্চর্য্যেব ব্যাপার বটে, কাজেকাজেই বলতে হয় দেশব্যাপী এমন একটা পদার্থ আছে যাতে এই তরঙ্গেব উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং যা—দৃশ্যমান জগতেব অতি দূরতম স্থানেও অবস্থান করছে। এই হচ্ছে দেশ ও আকাশ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণা। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা আকাশেব নাম দিয়েছিলেন আলোক-বাহী কিন্তু এখন আমবা দেখতে পাচ্ছি যে আকাশ শুধু আলোক-বাহী নয়, প্রতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংযোগস্থাপনকাবী। ইহা মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণেব বাহক, এবং প্রতি পরমাণুব মধ্যে সংযোগ স্থাপন কবে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলাময়ী সৃষ্টি বচনা করেছে।

আকাশ জিনিষটা যতই সূক্ষ্ম হোক্ না কেন এটাকে কিন্তু আমরা সর্ব্বক্ষণই ব্যবহাব করছি। একটা বেতাব বার্ত্তাবহ থেকে (Radio aerial যে তবঙ্গ বেরোয়, তাকে পৃথিবীর অপব দিকে ঠিক ভাবতবর্ষের তলদেশে anti-podes কিউবা-দ্বীপপুঞ্জেতে পৌছুতে ১/১৪ সেকেণ্ড লাগে। এখন শব্দবাহী বাতাস তবঙ্গ ঐ সময়ে কতদূর যেতে পারে? বাতাস-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যখন শব্দ ছোটে তখন তার এক মাইল যেতে পাঁচ সেকেণ্ড লাগে। কাজে কাজেই ১/১৪ সেকেণ্ডে সে ১/৭০ মাইল যায়। (১/৭০ মাইল = ২৫ গজ। এ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আকাশ-তরঙ্গ বাতাস-তরঙ্গের চাইতে লক্ষ গুণ অধিক দ্রুত গমন করে এবং তার কম্পন সংখ্যাও অনন্তগুণে অধিক। তা ছাড়া আকাশ ও বাতাস তরঙ্গের দৈর্ঘ্যেরও কম বেশ অনেক। এক একটা বাতাস তরঙ্গ কয়েক ফিট

করে লম্বা হতে পারে কিন্তু, পঞ্চাশ হাজার আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাত্র এক ইঞ্চি। কাজেকাজেই একটা আকাশ-তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা যা আমাদের চোখে ধরতে পারে, প্রতি সেকেণ্ডে হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি কোটি সংখ্যা।—ধারণার অতীত! কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। এই জগতে কত ক্ষুদ্র জিনিষ আছে, কত বিরাট জিনিষ আছে, কত তীব্র গতি, কত অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন বস্তু আছে যা এখনও আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না বা মানস চক্ষে এখনও উদিতই হয় নি। জগতের প্রত্যেক ঘটনার ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় না করতে পারলেও তার স্মারক record ) রাখা কর্ত্তব্য। অগ্রাহ্য করলে, পরে সত্যকে আমরা হারাব। একটা জিনিষকে প্রতিষ্ঠা করা অনেক জ্ঞানের দরকার; কিন্তু সেটাকে বাতিল করে দিতে হলে আরও অনেক বেশী জ্ঞানের দরকার। স্ববিরোধী বা আকাশ কুসুমের মত জিনিষগুলোকে অস্বীকার করতে পারি বটে কিন্তু অজ্ঞাত-কারণ-সম্পন্ন কার্য্যকে বা কোন রহস্যময়ী ঘটনাকে অস্বীকার করা কখন যেতে পারে না। আমরা অনন্তের মধ্যে বাস করছি, আমাদের বিশ্বাস ( Faith ) যেন অনন্তের মহিমার সন্ধানে অটুট থাকে। আমাদের আশা Hope যেন সত্যকে আবিষ্কারের ইচ্ছায় পূর্ণ থাকে, আমাদের দান Charity সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার শূন্য করে যেন সাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়।

—বাসুদেবানন্দ।

# কাব্যের স্বরূপ

কাব্য মানে ধর্ম্মশাস্ত্র নয় তা হলে মনুসংহিতা কবিতা হোত, কাব্য মানে রাজনীতি নয় তা হলে বার্ক, গ্ল্যাডষ্টোন কবি বলে প্রখ্যাত হোতে পারতেন; কাব্য মানে কি সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান ( Asthetics )—না তাও নয়, রসাত্মক বাক্য মানেও কাব্য নয়, অথচ কাব্য এমন একটা কিছু যা এই সমস্তগুলিই হয় ত ধারণ করতে পারে। এখানে একটা কথা না বল্‌লে ভুল হবে যে, কাব্যের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। প্রথম—বিশ্বজগৎ, মনুষ্য সমাজকে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয়—বিশ্বজগৎ, বিশ্বরূপকে কেন্দ্র করে; তৃতীয়—বিশ্বজগৎ, নিজ মনকে কেন্দ্র করে। এই তিনটি ভাবের কবিরা যথাক্রমে সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ও শেলি—মনে করা যেতে পারে। এঁদের প্রথম শ্রেণীর যে কবি তাঁদের কাব্যে রস, ধর্ম্ম, রাজনীতি ভারি অপরূপ হয়ে মিশে গেছে, আর ঐখানেই তাঁদের সার্থকতা। ম্যাক্‌বেথ বা হ্যামলেট বা ঐ কবির যে কোনো বিশ্ববিশ্রুত নাটক সেক্ষপীয়রের আগে অনেকেই প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তা মহাকবির হাত থেকে যখন বেরুল তখন তার রূপ কবির রসে স্নান করে অপূর্ব্ব হয়ে উঠ্‌ল। সেক্ষপীয়র গ্রাহ্যই করতেন না যে এ নাটক আগে কেউ নিয়েছে কি-না।

এই যে অভিব্যক্ত করবার ক্ষমতা, এটা কি—তা আমি বলতে পারব না তবে এটি ধ্রুব নিশ্চিত যে ইহা সর্ব্বপ্রকার কৌশল ও বিচারের বাইরের বস্তু, যদি তা না হোত তবে কালিদাসের চেয়ে আরো বেশী রসাত্মকতা, আরো বেশী কাল্পনিকতা নিয়েও অন্য সংস্কৃত কবিরা কালিদাসের মত অন্ততঃ প্রখ্যাত হোতে পারতেন, কিন্তু তা হন্‌ নি।

কাব্যের একটা সহজ ধর্ম্ম আছে যে তার মাঝে কোনোরূপ জড়-চিন্তা সে বইতে পারে না, পণ্ডিতী বা উপদেশ আড়ম্বরে যারা কাব্যের দেহ কীটের মত কাট্‌তে সুরু করে তারা ত প্রকৃত কার্য্যে অক্ষম হয়ই, পরন্তু তাদের ক্ষয়-পোকার ন্যায় সকলেই দেখে ভয় পায়। এখানে

একটা কথা বলি, আমি জড় চিন্তা মনে করি সেই প্রেরণাটাকেই, যেটা নিছক যুক্তিজালের অথবা অনুসন্ধানশীলতার আড়ালে জন্ম লাভ করে। ঐগুলো দিয়ে উত্তম গল্প রচনা হোতে পারে, তথ্যপূর্ণ গবেষণা দেখানো যেতে পারে কিন্তু, কবিতা ও-জিনিষ দিয়ে প্রকাশ হলে বড় দীন, বড় ব্যর্থ ভাব নিয়ে আসে।

কবিতা প্রকাশে দুটি জিনিষের প্রয়োজন ; আরো ভাল করে ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে উহা দুটি স্বভাবজ শক্তির ভিতরে ফুটে ওঠে। প্রথম—একটা অনুভূতি। এখানে বলে রাখি যে, এ অনুভূতি সর্ব্বপ্রকার স্বোপার্জ্জিত বুদ্ধিবর্জ্জিত অবশ্য তাই বলে এটা বুদ্ধিভ্রংশ প্রলাপোক্তিও নয়। এ অনুভূতি যেন ঠিক একটি পদ্মফুলের ফুটে উঠ্‌বার প্রেরণার মতো যেখানে তলাকাব মনের বস্তুকর্দ্দম শুধু মূলই—প্রকাশ নহে। আর দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে ঐ অনুভূতি জাত একটা আবেগ বা ছন্দ যা ঐ ভিতরের রসটুকুকে একটা গতির মধ্য দিয়ে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে সক্ষম করে তোলে। সে আবেগটুকুর মজা আবার এই যে, সে তার ঐটুকু স্পন্দনের ভিতর দিয়ে কবির মনের তথ্যটুকু প্রকাশ করে দেয় অবশ্য তাই বলে নিঃশেষ করে দেয় না।

একটা উদাহরণ দিই। চণ্ডীদাসের সেই যে 'কত মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে না পারে' এর কোনো প্রকার সমালোচনাই *একে প্রকাশ করতে অক্ষম, কেন না এর প্রত্যেকটি অক্ষরের মাঝে যে* চিত্তের একটা আকুতি বিরাজ কচ্ছে সেটা যে কবির বেদনা-সমুদ্রের পরশ পেয়ে অশেষ হয়ে আছে। এইজন্যই কবির কাব্য সন্ধান দেয়, বীরদর্পে আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ্যের গর্জ্জনধ্বনি শোনায় না। কবি কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গেল' নামক কবিতার প্রারম্ভটুকু মনে করলে বোধ করি এমন কেউই নেই যার ভিতরে একটা বিরাট কম্পন না আসে। 'My heart aches'—কাঁদে মোর হিয়া— কথাকটি যেন হৃদয়ের গভীর প্রদেশে একটা অবশ তৃপ্তির মাদকতা এনে দেয়। তার শেষের কটি লাইন যেখানে কবি আবেগে বল্‌ছেন, "আমি কি আছি, আমার কি অস্তিত্ব আছে ?"

এ যে কি বস্তু তা কবিই মাত্র বুঝতে পারেন আর কেউ নয়। এই-খানেই কাব্যের পূর্ণ সার্থকতা।

একটা কথা মনে পড়লো। আমার এক বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, কীট্‌সের বুকে যখন কীটের মত দংশন চলেছে তখনই তার কাব্যের উদ্ভব হয়েছে তাই ত তার কাব্যে এত বেদনা, এত মাধুর্য্য!

যাক্। এতক্ষণ কাব্যের অভিব্যক্তি এবং প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল; এইবার তার বিশ্বসৃষ্টিতে কতখানি অধিকার-আধিপত্য তারই বিচার করা যাক্।

বাস্তবিক পক্ষে দেখ্‌তে গেলে—এই যে বিশাল মনঃসমুদ্রের তরঙ্গ-রূপে এই যে সৃজনলীলার বিক্ষেপণ আর সঙ্কোচন চলেছে ইহা একখানি সুন্দর মনোহারা কাব্য। মৃত্তিকার বুকের পরে ঐ যে ধীরে ধীরে ঘাসের গুচ্ছ গজিয়ে উঠ্‌ছে পলে পলে বৃদ্ধির দিকে, সে বৃদ্ধি তো শেষ হোল না; তার সে বেদনাটুকু তাকে মেদিনীর অন্ধ নাড়ীর আড়াল থেকে প্রকাশের রাজ্যে ঠেলে তুল্‌ছে, তার গতি তো কোনো দিনই রুদ্ধ হয়নি; তাই তো বস্তুপুঞ্জ বিনাশ হয়ে গেল ভাবলে ভুল হবে, উহা ভাবের নবীনতার মাঝে নিত্য সুমধুর অপরূপ হয়ে উঠ্‌চে, আর ঐখানেই তার কাব্যের প্রকাশ।

ছোট একটি মেঘের এতটুকু যে মসীময় সৌন্দর্য্যদৃশ্য তার অভিনন্দনে হয় ত তুমি পরাঙ্মুখ থাক্‌তে পারো কিন্তু তার যে একটা ভাবের দিক লীলার দিক আছে, তার যে একটা প্রীতি-মাধুরী আছে সেটা যে অক্ষয় অব্যয় হয়ে গতি-তরঙ্গের মাঝে অবিনশ্বর হয়ে থাক্‌বে—সেটা বোধ কর্‌বে কে? ঐখানেই উহা কাব্য। এই সৃজনের এই দিকের প্রবাহের মাঝে যাকে কৃত্রিম বলে স্বভাবজ জিনিষ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় তার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। বাস্তবিক পক্ষে কৃত্রিম কিছু নেই সমস্ত কিছুই প্রথমে একটা গূঢ় আকাঙ্ক্ষার আড়ালে পরিপক্ক হয়ে ওঠে আর তার পরেই একটা মোহমগ্ন উন্মাদনার ভিতরে উল্লসিত হয়ে পড়্‌তে থাকে। এই যে ঘরদোর ইটের স্তূপ ওষুধের শিশি যন্ত্রের ধূমধাঁধা এগুলো সবই ঐ ভাবের প্রকাশ। তবে কথা হচ্ছে,

এ প্রকাশে একটা জিনিষের অভাব আছে। ফুলও ফোটে—যন্ত্রও আবিষ্কার হয়ে জীবন লাভ করে, সৃষ্টি হিসাবে আমি দুটোর ভিতরে কোনো পার্থক্য দেখি না তবে একে আকর্ষণ করে কিন্তু অন্যে সঙ্কোচন আনয়ন করে।

একটু ভাল করে বলি, ঐযে যান্ত্রিকতার উদ্ভব ওটা হয়েছে মনের সঙ্কুচিত বুদ্ধিজালের মাঝ থেকে, ওখানে গবেষণা আন্তরিকতা সবই আছে কিন্তু অভাব এই যে বিশ্বসৃষ্টি ওর ভিত্তি নয় ( back ground ) আর সেইখানেই উহা একটি পুষ্প-প্রস্ফুটন হোতে পৃথক্। আর যেখানেই এ সঙ্কীর্ণতা টুটে গেছে সেখানেই উহা কাব্যের পূর্ণ সার্থকতা নিয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝতে হবে; যেমন প্রাচীন যুগের মনুষ্যের জীবন কাহিনী—তাদের জীবনপ্রণালী এমন ভাবে সৃজনদেহের রেণুতে রেণুতে যুক্ত হতে পেরেছিল যে, সেখানে কোনো রূপ কৃত্রিমতা ছিল না। ঠিক এমনি করেই স্নেহ মায়া প্রেম এই সমস্তগুলি বৃত্তিরই যে লীলা চল্‌ছে সবই অমর হয়ে আছে আর তারই ফলে সমস্ত বিশ্বের আদি-আলোড়ন যেখানে চল্‌ছে সেখানে একটা স্পর্শ এবং অহরহ যুগিয়ে রাখ্‌ছে, যার ফলে এই বিরাট কবিতা শেষ হতে পারছে না।

এই যে কাব্যের বিশ্বরূপ এটা সত্য হলেও তাকে গ্রহণ করতে কবিদের যে একটা বেদনা আসে আমি সেটাকে ত ফেলে দিতে চাইনে কেননা সেটাই কাব্য! এক বিন্দু শ্বেত শিশির, আর এক গগনস্পর্শী শ্বেত ইমারৎ উভয়কে দেখেই কবির হৃদয়ে একটা অনুভূতির স্পর্শ আসে, কিন্তু প্রথমটা দেয় এক ধরণের আর দ্বিতীয়টা দেয় অন্য ধরণের, যদিও দুটিই কবিতা।

কাব্য আমাদের সমস্ত জীবনটাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে ওকে অস্বীকার কর্‌বার আমাদের যো নেই। বিশ্বসৃষ্টির ভাবাবেশ বা মোহের যে একটা ছন্দ বা আবেগ উহাই কাব্য বা কবির জীবনী-রূপে প্রকাশ। এইখানে কবি আর কাব্য অভেদ।

এখন কথা উঠ্‌তে পারে, কবি থাকেন কাল্পনিকতা নিয়ে যেখানে বাস্তবতা নেই, কাজেই তা সাধারণ জীবনে পূজনীয় হলেও গ্রহণীয়

হোতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যায়, কবির কাল্পনিকতা যদি ঠিক ঐরূপ অগ্রাহ্য জিনিষই হোত, তবে লোকে ওকে গাঁজাখুরী বলতো। এইখানেই ধরা পড়ে যে কল্পনা আর গাঁজাখুরী দুটো পৃথক জিনিষ, একটি—বিশিষ্ট রকমের মনের নিষ্পেষণজাত বিশ্বচিন্তার সূক্ষ্ম-স্বরূপ, অন্যটি—নিছক প্রলাপোক্তি। এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা কিরূপ একটু বুঝিয়ে বলি।

সেক্সপীয়ারের আয়াগো চরিত্র বা লেডী ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের মত ঐরূপ সুতীব্র শাণিততা এই পৃথিবীতে আছে, না আছে জানবার আগেই চোখে পড়ে তার সবল সহজতা যা প্রাণটাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে মানুষ বাস্তবিকতাকে ঐখানে প্রত্যক্ষ করে। শেলি, যাঁকে পাশ্চাত্যরা Mad Shelley বল্‌তেও কুণ্ঠিত হন নি তাঁরও ঐ যে 'Laon' 'Prometheus' বা 'Queen Mab'এর ভিতরের উচ্ছ্বাসময় ক্রন্দন—সে বড় তীক্ষ্ণ হলেও ত তার দিকে শুধু অনিমেষ দৃষ্টে ছবির মতনই তাকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে, না আরো যেন কিছু বেশী—নিজের জীবনে অনুবাদ করে নিতে ইচ্ছে হয়। এইখানে একটা কথা বলি, কবির জীবন যেন বহু দূর ভবিষ্যতের একটা আকর্ষণ যন্ত্র যা বর্ত্তমানকে আগামী গতির দিকে একেবারে ঠেলে নিতে চায় কিন্তু, সে আকর্ষণ সম্পূর্ণ সফল না হলেও যে আংশিক সত্য নয়, তা বলা যায় না।

আমি বল্‌তে চাই, যুগে যুগে এই যে এক একটা বিশেষ ভাবের উদ্ভব হচ্ছে সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাতে, ওর অস্ফুট উচ্চারণ তার বহুপূর্ব্বে কোনো না কোনো কবিতে অভিব্যক্ত হয়ে গেছে, খুঁজে দেখ নিশ্চয় পাবে এইখানে কবি অখণ্ড জগচ্চিন্তার ভাবষ্যৎবক্তা, যাঁরা তাঁদের সমাধির মাঝ থেকে স্বপনের ঘোরে সেই সব প্রচার করে যান। আজ যে 'কিরণময়ী'কে তোমাদের অতি তীব্র ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই একদিন সহজ বলে মনে হবে—ইহা ধ্রুব। যে রোহিণীকে দেখে একদিন শুধু ঘৃণা আসতো, আজ কয়জনের হৃদয়ে তাকে দেখে একটা গভীর সমবেদনা না আসে? এই বলে—'ওরে কাঙ্গাল চিত্তের কাঙ্গাল মানব!'

আমি বেশ স্থির ভাবে ভেবে দেখেছি একটা কথা যে, কাব্য যেন অনন্তের উদ্ভ্রান্ত নিশ্বাসপুঞ্জ যেখানে এমন একটা কিছু আছে যা প্রাণকে প্রাণের সাড়া দিয়ে যায় কখনো বা ব্যর্থ দীন অবসাদে কখনো বা উজ্জ্বল অখণ্ড উল্লাসে। আমি বলে রাখ্‌ছি যে, আমার কবির সম্বন্ধে ধারণা একটু অদ্ভুত রকমের। এই জন্যই আমি কবিরও একটা স্থান নির্দ্দেশ করতে চাই। প্রথম—স্বভাব-কবি বা সত্য-কবি, এঁরা কোনোরূপ প্রাদেশিকতা সঙ্কীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এঁরা মুক্ত বিহঙ্গমের মত পৃথিবীতে বিচরণ করে যান। এঁদের ভাষা যেন অনন্তের অদৃশ্য বুদ্বুদ। এর পরেই বলা যেতে পারে—সাধক-কবি, শেলি আর ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থকে যথাক্রমে আমি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেল্‌তে চাই। দুজনেই 'ভরতপক্ষী' সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন। আমি শেষোক্ত কবিকে ভক্তি করি, কিন্তু তিনি যখন বলেন—

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home.

তখন স্বতঃই মনে হয় যেন একজন মহা নীতিবিৎ পণ্ডিত সমস্ত কিছুর মাঝেই আইন আছে এই মহা সত্যের গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করে জগৎ-সমাজে প্রচার করছেন। এই শ্রেণীর কবিরা যা বলেন তার বাইরে থেকে বলেন এই জন্যই ওরূপ হয়। কিন্তু পাগলা শেলি যখন কেঁদে গেয়ে ওঠে—A poet unhidden আমাদের প্রাণও সেই সঙ্গে একতালে বলে ওঠে, কবি তুমি সত্যই ঐ বিহগ রহস্যচারীর লুক্কায়িত স্বপ্নস্বর! এযে কী অনুভূতি তা আমি বল্‌তে অক্ষম। চণ্ডীদাসের ক্ষুদ্র 'বঁধু কি আর কহিব আমি' যে কত কথা বল্‌ছে তা বলে অর্ব্বাচীনতার অপরিসীম লজ্জায় পড়্‌বে কে?

এর পরেই আসতে পারে আর এক থাক—প্রতিভা-কবি। এঁরা যেন শক্তিমান বৈজ্ঞানিক। এঁরা হয় ত মুহূর্ত্তে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত বা সন্ধ্যা বৈদ্যুতিক শক্তির বলে ত্রিতল ইমারতের কুঠরীতে দেখিয়ে দিতে পারেন কিন্তু, আসল সূর্য্যোদয় আর তাতে যত পার্থক্য কবির বাণী থেকেও এঁদের বাণীতে তত পার্থক্য। মিল্‌টন, গ্রে, ভট্টি,

দাশরথী এই দলের মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে। গ্রে তার বিশ্ববিশ্রুত Elegyর আরম্ভে যখনই বল্‌ছেন—

The curfew tolls the knell of parting day তখনই যেন বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি বহু গবেষণা করে একটা শোকের চিত্র আমাদের সাম্‌নে ধরবার বুদ্ধি আঁট্‌ছেন। এঁদের কবিতা প্রায়শঃই সামাজিকতা, স্বধর্ম্মসঙ্কীর্ণতা, রাজনৈতিকতা প্রভৃতি অসিদ্ধ ভাবে দুষ্ট হয়ে থাকে। মিণ্টনের যে সব কবিতা পড়েছি তার সবই ঐ ভাবের এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। পাইডিমণ্টিজদের উনি যে অভিশাপ দিয়ে বল্‌ছেন 'That worshipped stocks' and stones' সে-কবিতা যেন ওঁর সঙ্কীর্ণ মনটাকে একেবারে উলঙ্গকরে আমাদের সাম্‌নে ধরিয়ে দেয়। তিনি সাধু, স্বদেশহিতৈষী বা সংস্কারক কিন্তু আসল কবি নন। টেনিসনের 'Wellington' সম্বন্ধে যে কবিতা, ওর ভিতরে এমন বিশ্রী রকমের জাতীয় সংস্কারগত প্রভাব যে তা যেন সমস্ত মনকে কুঞ্চিত করে দেয়। এঁরা বড় তথ্য, দার্শনিক চিন্তা (যেমন In memorium) দিতে পারেন কিন্তু প্রাণের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার ক্ষমতা এঁদের নেই। এই প্রতিভা-কবির একটা নিম্নশ্রেণী আছে—যন্ত্র-কবি, এরা প্রায়ই কাব্যকে এদের কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা মতবাদের বাহন মনে করে। এই যন্ত্র-কবির দলই সাধারণতঃ কাব্যকে ব্যবহারিকতার মাঝে এনে সমাজের মুখরোচকতার মধ্যে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে থাকে। আমি বাসনা করি, এঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক্ কেন না, এঁরাই সত্য-কবির প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। ওথেলো, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মত বই এক আধখানাই জন্মায় হাজারে হাজারে নয়।

এই কাব্যের রসের দিক সম্বন্ধে কিছু বলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করবো। কাব্য জিনিষটা বড় একটু অদ্ভুত রকমের। একে নিত্য বল্লে ঠিক বলা হবে না অথচ এ অনিত্যও নয়, এর যে রসটুকু তা একে শেষের এমন এক জায়গায় পৌঁছে দেয় যা নিত্য চিরন্তনের বাণী হয়ে থাকে; আর তার যে গতি বা ছন্দ তাকে বয়ে নিয়ে চলে—সেইটুকুই এর জীবনমরণে মেশান অশ্রু-হাসির রসসৃষ্টি এইখানেই উহা মানুষের

ক্ষণভঙ্গুরতাময় জীবনের সঙ্গে একেবারে সমান ভাবে মিলিত হতে পেরেছে।

প্রত্যেক কাব্যেরই এই দুটো জিনিষ ; একটি—ব্যক্ত সঙ্গীত, অপরটি —অব্যক্ত অভিব্যক্তি, একেবারে কাব্যঅঙ্গ ; একে এড়ানো চলে না। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুষ্যন্ত শকুন্তলা মিলিত হলেও তার যে নিরুদ্দিষ্ট বাণী বা তথ্য—পরিপক্ক বয়সেই সত্যপ্রণয়ের উপলব্ধি আসে, এ ইঙ্গিতটুকু বেশ পাওয়া যায় ; এবং ওথেলো আত্মনাশ করলেও তার ভিতরেও একটা সত্য—মানুষের প্রাণ, মানুষের চিন্তাশক্তি বড় সীমাবদ্ধ সে অহরহই ভুল করছে এবং 'like a base Indian' একটা উজ্জ্বল হীরাকেও হয় ত ফেলে দিচ্ছে। আর এর ব্যক্ত যে দিক্ তারও মধ্যে একটা অশেষের আভাস পাওয়া যায় যেমন বিরাট বায়ুমণ্ডলের মাঝে আমরা পাই, যদিও তাকে গ্রহণ করি ক্ষুদ্র দুটি নাসিকা বিবর দিয়ে।

সর্ব্বশেষ কথা—কাব্যই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শোকাতুরা জননীরও আত্মপ্রতিপালনেই যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—কেন? না ঐখানে সে হারালেও হারায়নি—এ তথ্যটা লাভ করছে এই মরণের ছন্দে ছন্দে তার জীবনের মাঝে। এইখানে কাব্য তার পূর্ণতম ক্ষেত্রে বিদ্যমান, এখানে ক্ষুদ্র কিছু নেই, ফেলে দেবার কিছু নেই, সমস্তই মহনীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণে একখানা মহাকাব্য তৈরী করছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী।

# কথাপ্রসঙ্গে

## SARACEEN CULTURE

আজ হিন্দু-মুসলমানের এই বিভ্রাটে স্বামিজীর কুম্ভকোণম্ বক্তৃতার কথা স্মরণ হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই মনে করেন তাঁদের মতন সভ্য জগতে কেউ নেই। কিন্তু গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার এ সকল যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হতে পারে না। যত দিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রী সম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলতে পারে না; আর এই মৈত্রীভাব বিকাশের প্রথম সোপান পরস্পরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ওপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাই নয়, প্রকৃত পক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করতে হলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হলেই চলবে না—পরস্পরের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক হোক, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করতে হবে।

স্বামিজী কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছিলেন, তোমরা অনুমান করতে পারবে না পাশ্চাত্য দেশে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম্মবিদ্বেষ বর্ত্তমান। অনেক সময় আমি ভেবেছি, হয় ত আমাকে বিদেশে হাড়কখানা রেখে যেতে হবে। ধর্ম্মের জন্য একজনকে মেরে ফেলা ভারত ভিন্ন অপর দেশে অতি তুচ্ছ কথা। অনেক বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁদের উদারতার বিষয় খুব ফড়্ ফড়্ করে বলে যান, কিন্তু স্বদেশে তাঁরা ঘোর কাপুরুষ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা সত্য বলে তাঁরা বোঝেন বা বিশ্বাস করেন তার শতাংশের এক অংশও সমাজ-চ্যুতি বা দুর্ণামের ভয়ে প্রকাশ করতে সাহস করেন না।

হাজার বছর ধরে আমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে সত্য কিন্তু, বিদেশীয়া আমাদের যতই ঘৃণা করুন, যতই পাশব ভাব

প্রকাশ করুন, যতই নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার করুন, যতই কুৎসিৎ ভাষার প্রয়োগ করুন, তবুও আমরা আমাদের ধর্ম্ম ছাড়ব না—যে ধর্ম্ম বলে আমরা মুসলমানের মসজিদ এবং ইংরাজের গির্জ্জা তৈরী করি—যে ধর্ম্ম পশুকে মানুষ করে, যে ধর্ম্ম প্রমাণ করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ-পরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে না, আধ্যাত্মিক শক্তি বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হয়—পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখনও জয় লাভ করতে পারে না—ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার-সংগ্রামে জয় লাভের একমাত্র উপায়।

যখন স্বজাতি স্বজাতিকে গালি দিয়ে আত্মঘাতী হতে বসেছিল, তখন অতি দুঃখে স্বামিজী বলেছিলেন, বক্তৃতামঞ্চ হতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হয়ে গ্যাছে, হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সমাজের বাস্তবিক কোনও উপকার হয়নি। আমি জগতের যে সকল জাতি দেখেছি তাদের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আমাদের জাতিই অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা নীতি-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক। আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী বিচার করলে দেখা যায় যে, তারা মানব জাতিকে সুখী করবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। তবে জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি বিস্তৃতি ও পরিণতি স্বীকার করতেই হবে। অভিশাপ, নিন্দা ও গালি-বর্ষণের দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধন হয় না। স্বদেশের বাত্যাহত কর্ম্মজীর্ণ আচার ও প্রথা সকলের নিন্দা করলে চলবে না। অতি কুসংস্কার পূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথা সকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দা সূচক কথা বোল না কারণ, সেগুলির দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

বাস্তবিক, ধর্ম্মে যদি গ্লানি উপস্থিত হয়ে থাকে তা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করাই উচিত। "যতই শক্তি প্রয়োগ কর না কেন, শাসন-প্রণালীর যতই পরিবর্ত্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর না কেন, কোনও জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারবে

না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করে তাকে সৎ পথে পরিচালনা করতে পারে।" সখের ধার্ম্মিকদের সমালোচনায় কিছুই হবে না। তাঁদের কাছে ধর্ম্ম জিনিষটা একটা ফ্যাসান মাত্র—যেমন জাপানী 'ভাস'। কোনও কার্য্যকারিতা নেই। অথবা সংসারে বাস করতে হলে ঠাকুরমার ঝুলিরও কিছু প্রয়োজন আছে কারণ, তাতে ছেলে ভুলানো চলে।

আর এক দল হিন্দু সমালোচক আছেন তাঁরা বলেন, যে ধর্ম্মে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় না, কাম-কাঞ্চনের সুবিধা নেই, বলবানকে দুর্ব্বলের ঘাড় ভেঙ্গে রক্তপান করবার উপদেশ দেয় না, সেটা আবার ধর্ম্ম? সেই জন্য এক জন হিন্দু স্বদেশী নেতা এক ধর্ম্ম সভায় বলেছিলেন, "আমার অদ্যাবধি কোনও ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়নি, সেই জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।"

আর এক দল হিন্দু আছেন তাঁরা মনে করেন, জগতে তাঁদের মত শ্রেষ্ঠ জীব আর নেই। তাঁদের সাগর পারে গেলে জাত যায়, কিন্তু কৌতুক দেখ তাঁদের সাহিত্য সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে বিদেশীর সাহিত্য বিজ্ঞানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। আর সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করে তারা এখন তাদের অতি সুবৃহৎ জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করছে। আর অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরে পূর্ব্ব-পুরুষদের নামানুকীর্ত্তন ও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করেই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ মনে করেন। আর না হয় কতকগুলো কুসংস্কার বা অসম্বদ্ধ আচার-পদ্ধতির বিচার নিয়েই ব্যস্ত। কয়েকজন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বা কবি ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁদের রাজপ্রাসাদে সাধারণের পৌঁছন বড় কঠিন। এ সকলের কারণ, দর্শন বিজ্ঞানের বাস্তব জীবন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কাজেকাজেই কণাদের পরমাণুবাদ, কপিলের মনস্তত্ত্ব, আর্য্যভট্টের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বাগভট্টের নরশরীর বিজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের রসায়ণ প্রভৃতির আলোচনা এবং ভিন্ন দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার পুষ্টি সাধনে পাশ্চাত্যদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।

জ্ঞানের অনুশীলনই মানুষকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করে; 'তুমি আমার ভাই' 'তুমি আমার বন্ধু' বল্লেই আত্মীয়তা হয় না। বোষ্টম্ বলছেন, 'বিষ্টু ভজ তো ভজ নইলে নরকে যাবে'। মোছলমান বলছেন, 'কোরাণ পড়তো পড় নইলে জাহান্নামে যাবে'। তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন, বৈকুণ্ঠ বা বেহেস্ত কেবল তাঁদের গুটিকতকের জন্যে monopoly. এখন যদি হিন্দু-মুসলমান স্যারাসিন সভ্যতার (Saraceen culture) মূল অন্বেষণ করেন, তা হলে বোধ হয় তাঁদের বিদ্বেষ-বিষের কিছু উপশম হতে পারে। ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক অনেক বই আরবী ও পারসী ভাষায় অনূদিত হয়ে সেই দেশে প্রচারিত হয়েছে।

উমুন্‌অল্‌অম্বাফিতল্‌কাতুল্‌আত্‌বা নামক একখানি বইতে লেখা আছে, হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগদাদের রাজ সভায় উপস্থিত হয়ে জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শাস্ত্র শিক্ষা দেন। এঁদের কারও নাম মঙ্কঃ, কারও নাম কঙ্কঃ, কারও নাম বা বাখর। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাখর—ভাস্কর বলে বোধ হয়। খলিফা হারুন্‌অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনও রূপে তাঁর প্রতীকার না হওয়ায় তিনি ভারত থেকে মঙ্কঃকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান এবং তাঁর চিকিৎসার গুণে তিনি রোগ মুক্ত হন। তা ছাড়া ঐ আরবী পুস্তকে দাহর, জবহর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল, জারি, জওদর, সানাক, সনজহল এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত আছে। এঁদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ নামগুলো যে আরবী ভাষায় বিকৃত করে লেখা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওতে আরব দেশে নীত সিরক্ত, মসর্দ্দ ও যেদান নামে তিন খানি ভারতীয় বৈদক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে। উহারা চরক সুশ্রুত ও নিদানের বিকৃত অবস্থা।

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে অল্‌মনসুর নামক আরবী রাজার অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষায় একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুবাদিত হয়,

সেই বইখানির নাম সিন্দ্‌হিন্দ্‌। কোলব্রুক (Colebrook) একে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলে স্থির করেছেন। বাকুর নামে একজন গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্‌হিন্দ্‌ পুস্তক অবলম্বন করে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি ভারতীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বার বার উদ্ধৃত করেছেন।

অল্‌মামুন নামক বাদসাহের সময় একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনূদিত হয়। ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ এই নয়টি অঙ্কমূর্ত্তি, ও একং, দশং, শতং, সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনায় যে রকম প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রয়েছে তা ভারতীয়েরাই অবিষ্কার করেন। আরবী ও পারসী পাটিগণিত প্রণেতারা তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আরবীরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করে স্বদেশে প্রচার করেন এবং পুস্তকাকারে বাণিজ্যের সঙ্গে স্পেনের অন্তর্গত করডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করেন।

খুলাসৎউল্‌হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসী গ্রন্থে তাঁদের ঐ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লেখা আছে।

সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস্‌ একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তা যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে তা ঐ ভারতীয় অঙ্ক প্রণালীর সহিত একরূপ একজন ফরাসী পণ্ডিত চার্লস Charles বিচার করে দেখিয়েছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খ্রীষ্টানরা আরবীদের পূর্ব্বেও ভারতীয় অঙ্ক প্রণালী অবগত ছিলেন।

৭৮৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবী রাজা হারুণঅল্‌রসীদের আদেশে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চাণক্য কৃত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক একখানা বই মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। তা ছাড়া চাণক্য কৃত পশু-চিকিৎসা ও চরক নামক বৈদ্যকশাস্ত্র আরবী ও পারসী উভয় ভাষায় অনূদিত হয়।

১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সুশ্রুতগুরু কর্ত্তৃক প্রণীত আর এক খানি পশু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃত হতে অনূদিত হয়।

আল্‌বারুনী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে দেহ রাখেন। তিনি জ্যোতিষ শিখিবার জন্য ভারতে আসেন; এবং সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তা ছাড়া হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবরণাত্মক আর এক খানা বই লিখে যান।

১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবুসালেহ রাজনীতি বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

এই সমস্ত গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব থেকে মিশর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সকলের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হোত। পীজা নগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন পণ্ডিত বার্ব্বারি দেশে গিয়ে আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশে প্রচার করেন।

মোগল সম্রাট আকবরের কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ ও অথর্ব্ববেদ পারসী ভাষায় অনুবাদ করান। তাঁর প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে উপনিষদের পারসী অনুবাদ করেন; এবং পরে এই অনুবাদ আঁকেতীই ডুপের্ঁ ( Anquetil Duperon ) কর্ত্তৃক লাটিন ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতায় নূতন আলোক প্রদান করে।

এ ছাড়া তাবীখুলহোক্‌মা নামক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, আরবীরা ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীত শাস্ত্র সকল সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রচার করেন। উহার নাম বিযাফব ( বিদ্যাফল ) বলে কথিত হয়েছে।

এই সকল দেখে আশা করি, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অনুমান করতে পারেন কি করে উভয় জাতির মধ্যে সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিদ্যার অনুশীলনের দ্বারাই পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে —অন্যরূপে নহে।

---

# শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মের হেতু তদুপযোগী সংস্কার ও বাসনা। অতএব কার্য্য দেখিয়া কারণানুমানের ন্যায় জন্ম দেখিয়াই সেই সংস্কারাদি অনুমান করিলে ভ্রমপ্রমাদ হইবে না। সত্যকামের সময়ও তাহাই করা হইয়াছে। কারণ, ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার না থাকিলে সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবেই বা কেন ?

তাহা হইলে বলিব, শূদ্রাদির জন্মান্তরেই বা তাহা হইলে ব্রাহ্মণজন্মের সম্ভাবনা কোথায় ? কারণ, এ মতে যে শূদ্র শাস্ত্রবিহিত শূদ্রকর্ম্ম শিল্প-কলাকার্য্য ও পরিচর্য্যাদি করিবে, সেই পরে ব্রাহ্মণ হইবে অপরে নহে। অন্যথা করিলে নরক হইবে। জন্মান্তরে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ—তবে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকর্ম্মই সাধ্যমত করে এবং তাহার আকাঙ্ক্ষা রাখে তবেই সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কার্য্য করিবে শূদ্র, শূদ্রোচিত আর সংস্কার হইবে ব্রাহ্মণোচিত ইহা কি সম্ভব ? ইহা কি নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার নহে ? প্রত্যুত ইহা কার্য্যকারণের নিয়মবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ জন্মের কারণ সংস্কার নহে, পরন্তু বাসনা ও পাপপুণ্য উচ্চনীচ জন্মের কারণ, সংস্কার সঙ্গে যায় এই মাত্র। অতএব উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্ব্বে যে সংস্কারাদির অনুসন্ধান করা হয়, তাহা উত্তম ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টির জন্য। কৃষক যেমন বীজ ধান্যের জন্য উত্তম ধান্য বাছিয়া রাখে ইহাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ শূদ্রকেও অর্থাৎ শূদ্রোচিত সংস্কারসম্পন্নকেও যদি ব্রাহ্মণ সঙ্গে রাখিয়া ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা নহে। অতএব শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকর্ম্মকারী হয় তাহা হইলে যে তাহার পাপ হইবে,

তাহা নহে। অবশ্য শূদ্র ব্রাহ্মণকর্ম্ম করিবার কালে শূদ্র যে কোনরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে না, কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা করিতেছে না, প্রত্যুত শাস্ত্র ও গুরুর আদেশ অনুসারেই সে ইহা করিতেছে এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক ইহার অন্যথা হইলে তাহার পাপ অনিবার্য্য এবং তাহার ফলে তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণও শূদ্রের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা কতকটা শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রাদেশ পালনের মাত্রা অনুসারে নির্ণীত হয়। শূদ্র যে স্থলে শূদ্রকর্ম্ম করিয়াও ব্রাহ্মণ জন্ম পায় সেস্থলেও এই দুইটিই কারণ হয়। অতএব এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিয়া শূদ্র ব্রাহ্মণকর্ম্ম করিলে তাহার নরক হয় না, প্রত্যুত তাহার ব্রাহ্মণ জন্মও নিশ্চিত হয়।

কেহ কেহ বলেন শূদ্র সন্তানকে উপনয়নাদি দিলেও সুফল ফলিতে পারে না। কারণ তাহার সমাজই তাহার প্রতিকূল হইবে। পিতামাতার আচারব্যবহার সকলই তাহার বিরোধী হইবে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ, সম্পত্তির অধিকারপ্রভৃতি সকল স্থলেই বিরোধ ঘটিবে। পুত্র গুরু গৃহ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া আসিল, আসিয়া দেখে পিতামাতা অখাদ্যভোজী অনাচারী। সে কি তখন পিতামাতাকে ত্যাগ করিবে? অতএব যে কুলে যে জাত তাহার তদনুরূপ আচরণই সঙ্গত।

তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে এখন আর পাপের ভয়প্রদর্শন—যথার্থ পাপ হইবে বলিয়া নহে প্রত্যুত সমাজের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা এবং অধিকার আর জাতিগত থাকিল না—ইহা স্বীকার করা হইল। আচ্ছা তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যে শূদ্রকুলে সদাচারাদি আছে, তাহার সন্তানকে উপনয়নাদি দিতে বাধা কি? আর এক জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে যেমন পতিত দল পৃথক্ থাকিয়া যায়, উন্নত দলও তদ্রূপ পৃথক্ থাকিয়া যাইবে। তাহাদের বিবাহাদি তাহাদের মধ্যেই হইবে। ব্রাহ্মণকুলের শূদ্রাচারীকে যেমন ব্রাহ্মণশূদ্র বলা হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণাচারী শূদ্রকেও না হয় শূদ্রব্রাহ্মণ বলা হইবে, তাহাতে সমাজের কোন বাধাই হইবে না। ব্রাহ্মণ এতাদৃশ উন্নত শূদ্রের সহিত বিবাহাদি করিবেন না, সুতরাং তাঁহাদের জাতিও

যাইবে না। বস্তুতঃ সমাজে এইরূপ ব্যবহারই চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই মেল ও থাক এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এরূপ না করিয়া শূদ্রাদিকে জাতি দেখিয়া সংস্কার ও বিদ্যাদান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদিগকে বিদ্যা ও সংস্কারের শুভফল হইতে বঞ্চিত করা হয়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে উন্নত করিবার জন্যই শাস্ত্রীয় সংস্কারের ব্যবস্থা। যদি শূদ্রাদির সে কামনা হয়, যদি তাহাদের আচার ব্যবহার বিশেষ প্রতিকূল না হয়, তবে তাহাদিগকে সংস্কারে বঞ্চিত করা যুক্তিসঙ্গতও নহে, শাস্ত্রসঙ্গতও নহে। অধিক কি শূদ্র যদি ইহা কামনা নাও করে, তথাপি তাহাকে উপদেশদ্বারা উন্নত করাই মহতের কর্ম্ম, শূদ্রকে উপদেশ দিয়া পতিত হইব বলিয়া ইহাতে বিরত হওয়া কখনই উদারতার পরিচায়ক হইতে পারে না। আজ কত নীচ শূদ্রকুলজাত সন্তান কত ব্রাহ্মণকুলের সমান হইয়াছে, কত ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্রাচারী হইয়াছে। ইহার কারণ যদি শিক্ষাই হয়, তবে তাহাদিগকে শাস্ত্রীয় সংস্কারে বঞ্চিত করা হয় কেন? এই জন্যই বস্তুতঃ কদাচারী তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায় এত প্রবল হইয়াছে। বৈদিক সম্প্রদায়ের এই কঠোরতা বা অতি সাবধানতা বৈদিক সম্প্রদায়ের ক্ষীণতার কারণ হইয়াছে। অন্ধভাবে সর্ব্বত্র শাস্ত্রানুসরণ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সংস্কারের অভাবে যদি পতন হয়, তবে পতিতকে সংস্কার দিলে তাহাদের উন্নতি হইবে না কেন? বিপথগামী পুত্রকে যদি সুপথে আনয়ন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে শূদ্রাদিকে কেন উন্নত করিবার উপায় হইতে বঞ্চিত করা হয়? অথবা যদি জন্মান্তর দ্বারা সে উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেই জন্মেই বা তাহার ব্যবস্থা থাকিবে না কেন?

যদি বলা হয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে শূদ্রাচারীকে ব্রাহ্মণশূদ্র এবং শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারীকে শূদ্রব্রাহ্মণ বলা হয়, তাহা হইলে ক্রমে জাতিনাশ অনিবার্য্য। ব্রাহ্মণশূদ্রগণ শূদ্র সহ এবং শূদ্রব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সহ বিবাহাদি করিতে থাকিবে। তাহার পর এরূপ ঘটিলে জাতি ও বর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মণজাতির শূদ্রের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পথ প্রশস্ত

হইবে, ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রাহ্মণবর্ণের কর্ম্ম কর্ত্তব্য—সে ধারণা বিলুপ্ত হইবে। "আমি ব্রাহ্মণ" এই জ্ঞানে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদের সে জ্ঞান আর থাকিবে না। অতএব এ পথ অমঙ্গলকর পথ।

এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, জাতি ও বর্ণ যে পৃথক্ তাহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। যে হেতু ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ ইত্যাদিভেদে দশপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধে জাতি ও বর্ণ অভিন্ন হইলেও সংকর জাতিতে ইহা সমানার্থক হয় না। যেহেতু সংকর জাতির আচার ব্যবহার নির্ণয়কালে বর্ণচতুষ্টয়ের উল্লেখ দেখা যায় এবং বর্ণ চারিটি, পঞ্চম নাই, ইহাও স্পষ্ট করিয়া মনুতে কথিত হইয়াছে। জাতি ও বর্ণ পৃথক্ হইলে বর্ণ— গুণ ও কর্ম্মগত এবং জাতি—জন্মগত এরূপ বিভাগ সঙ্গত হইবে। জাতি ও বর্ণের প্রভেদ থাকিলে সামাজিক আচার ব্যবহারগত কোনরূপ বিরোধও ঘটে না। জাতি ও বর্ণ অভিন্ন হইলে সূত মাগধ ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সবই বর্ণ পদবাচ্য হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া উহা সূতজাতি মাগধজাতি অম্বষ্ঠজাতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। আর যদি উহাদিগকে বর্ণসংকর নামে অভিহিত করিয়া বিরোধ পরিহারের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সকল বর্ণসংকরের এক প্রকার আচার-ব্যবহার নির্দ্দেশ করা হয় না কেন? জীবিকার জন্য বৃত্তিভেদ করিয়া বিবাহাদি আচারব্যবহার কোথাও পিতৃকুল কোথাও মাতৃকুলের মত বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হয় কেন? অতএব জাতি ও বর্ণ সমানার্থক নহে।

যদি বলা হয় তবে ব্রাহ্মণ জাতি ও ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম্ম আছে, যথা—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ। ইহাদের মধ্যে যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ বৃত্তি আর অপর তিনটি ধর্ম্ম। যাঁহারা জাতিমাত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে বিবাহাদি করিয়া বৃত্তির জন্য যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ মাত্র করেন। ইঁহারাই জাতিব্রাহ্মণ, আর যাঁহারা যজন অধ্যয়ন ও দান করেন তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ। জাতি

রক্ষার জন্য বৃত্তির প্রয়োজন, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যজনাদির প্রয়োজন, যাঁহারা উভয়ই করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অতএব শূদ্র যদি যজন অধ্যয়ন ও দান মাত্র ব্রাহ্মণকর্ম্ম করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষতি হইতে পারে না। জাতি ও বর্ণ যে পৃথক্ তাহার নিদর্শন আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রেও পাওয়া যায়, যথা—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। ১

অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। ২

এস্থলে জাতি ও বর্ণের পৃথক্ উল্লেখই রহিয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে জাতি ও বর্ণ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু "পঞ্চম বর্ণ নাই" এই মনুবাক্যের অনুরোধে তাহার অন্য অর্থ করাই উচিত। অথবা জাতি ও বর্ণ যদি অভিন্নও করা হয়, তাহা হইলেও আশংকিত জাতিনাশ নিবারণ করা অসম্ভব হয় না। শিক্ষা ও শাসন-গুণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং ব্রাহ্মণের মধ্যে শূদ্রাচারীকে ব্রাহ্মণশূদ্র এবং শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারীকে শূদ্রব্রাহ্মণ বলিলে ক্রমে ব্রাহ্মণশূদ্রের সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী— ইহাও সঙ্গত নহে। সংমিশ্রণের হেতু অজ্ঞানতা বা শিক্ষার অভাব। তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিলে এ সম্ভাবনা থাকিবে না।

বাস্তবিক শূদ্রের পক্ষে ত্রৈবর্ণিকের সেবা প্রধান কার্য্য—এই শাস্ত্রা-দেশের উদ্দেশ্য বিচার করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণত্ব-কামনা-রহিত অসমর্থ শূদ্রাদিকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ, নিয়ত উচ্চ সঙ্গে থাকিয়া উচ্চ আদর্শ দেখিয়া উচ্চ ভাবের কামনা, সেবকশূদ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবহার অজ্ঞাতসারে তাহার অভ্যস্ত হইতে থাকে। অগত্যা পর জন্মে তাহার ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলেই জন্ম হইয়া যায়। গীতামধ্যেও যে স্বধর্ম্মে থাকিবার উপদেশ তাহারও অভিপ্রায় ইহাই। গীতায় আছে—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ১৮।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

ইহাতে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ভগবানকে অর্চ্চনার উপদেশ রহিয়াছে এবং উভয়ে মিলিত হইয়া উন্নতির হেতু হইতেছে দেখা যায়। স্বধর্ম্ম এস্থলে শূদ্রের যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা। সুতরাং উচ্চ সঙ্গ বা উচ্চ আদর্শজন্য উচ্চকামনা, এবং ভগবৎসেবা জন্য পাপক্ষয় ও পুণ্য প্রভৃতি হয়। অগত্যা ইহার ফলে উচ্চ জন্মই হইয়া থাকে। এই মার্গটি তাহার পক্ষে সহজ হয়, কারণ, ইহাতে পিতা মাতা ভাই বন্ধুর সংসর্গজন্য বাধা বিঘ্ন ও ঘটে না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" হয়। অতএব শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই যখন কৌশলে অসমর্থকে সমর্থ করা, তখন জন্মান্তর পর্য্যন্ত একজন শ্রেয়স্কামী তত্ত্ব-বুভুৎসুকে পাপের ভয় দেখাইয়া ভৃত্যকর্ম্ম করান যে কেন বিহিত হইবে তাহা বুঝা যায় না। এই সব ভাবিলে মনে হয় যাঁহারা, শাস্ত্রাদেশ মাত্র বলিয়া অধিকারী অনধিকারী বিবেচনা না করিয়া শূদ্রমাত্রকেই শাস্ত্রা-ধ্যয়নে নিবৃত্ত করেন, প্রণবে চ্চারণে পাপভয় দেখান তাঁহারা কখনই শাস্ত্রাভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতেছেন না। যদি বলা হয় শূদ্রকুলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু জন্মিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে কি বলিতে পারা যায় না যে, যখন শূদ্রকুলে বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ জন্মিতে পারেন, তখন কি শূদ্রকুলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর জন্ম হইতে পারে না? এই যে রামানুজা-চার্য্যের গুরুপরম্পরার মধ্যে শঠকোপ মুনির পাদুকা পূজিত হয় তিনি যে চণ্ডালবংশসম্ভূত। যে কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট খাইয়া রামানুজাচার্য্য নিজ জাতি নষ্ট করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশাধিকারী হইবেন বলিয়া ভাবিয়া-ছিলেন তিনি কি শূদ্র ছিলেন না? আর এই কাঞ্চীপূর্ণ স্বধর্ম্ম ভাবিয়াই রামানুজকে মন্ত্র দেন নাই। আচ্ছা, এরূপ শূদ্রকে ব্রাহ্মণাধিকার দিলে কি সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইত? বোধ হয় কখনই নহে। অনধিকারীকে অধিকার দিলে সমাজ নষ্ট হয়। কিন্তু সেই অধিকার কি কেবলই জন্মায়? অতএব সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া কেবল জন্ম দ্বারাই শাস্ত্র কখন উপদেশ দেন নাই ইহাই বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, উপযুক্ত শূদ্রকে বেদাধ্যয়নে পাপ ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিলে তাহাদের ব্রাহ্মণ্য বাসনা বলবতী হইবে অতএব প্রবল

বাসনা বশতঃ পর জন্মে ব্রাহ্মণ্য অবশ্যম্ভাবী, অতএব ইহাতে উপকারই হইবে, তাহা হইলে বলিব যে গুরুশুশ্রূষা ব্রাহ্মণ মুখ এবং সকল শূদ্রের ব্রাহ্মণের ন্যায় সামর্থ্য ও স্বভাব হইয়াছে তাহাকে তাহা হইলে নিষেধ করা কেন হয়। অতএব এ যুক্তি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইবার যোগ্য নহে।

যাহারা ভাবেন, স্ত্রীশূদ্রের হস্তে বেদ পতিত হইলে বেদের অমর্য্যাদা হইবে, বেদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে কি বলা যায় না যে, দ্বিজসন্তানদ্বারা বেদের যত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কল্পনাতীত। চার্ব্বাক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খৃষ্টান—কোন্ সম্প্রদায় বেদের উচ্ছেদসাধনে উদাসীন ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ে দ্বিজসন্তানের অভাব আছে ? কালাপাহাড়, কালযবনের নাম কেহ কখনই ভুলিতে পারেন না।

বলিতে পারা যায় যে, শূদ্রকে বেদাদিশিক্ষা না দিলে সমাজ শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইবে। ভৃত্যবর্গ ব্যতীত কোন সমাজই চলে না। আজ সকল ভৃত্যই যদি প্রভু হন, তবে ভৃত্যকর্ম্ম করে কে ? সমাজ শৃঙ্খলা কি নষ্ট হইবে না ?

ইহার উত্তরে বলা যায়, তবে শূদ্রকে পুরাণাদির পাঠেও বঞ্চিত করা উচিত। তাহার পর ভৃত্যাভাবজনিত ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু শূদ্রকে এরূপ অধিকার দিলেও সকল শূদ্রই এই পথের পথিক হইবে না, তাহা নিশ্চিত। অতএব সমাজশৃঙ্খলাভঙ্গের কোন ভয়ই নাই। তাহার পর শিষ্যের গুরুশুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা থাকায়, পুত্রাদি পিতৃ-মাতৃসেবা করিবার ব্যবস্থা থাকায় ভৃত্যাভাব হইবে কেন ? আর যদি সমাজে বৃদ্ধ ভৃত্য আবশ্যক বলিয়া জাতিবিশেষের বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এরূপ বিধি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় যেমন যুদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহাও অনুষ্ঠান করে, তদ্রূপ শূদ্রও বেদজ্ঞ হইয়া না হয় সেবাকর্ম্মাদি করিবে, তজ্জন্য বেদাধ্যয়নে পাপভয়প্রদর্শন করা কেন ? প্রত্যুত দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে শূদ্রেরও যদি যুদ্ধ কার্য্য আবশ্যক হয়, তবে শূদ্রকে মূর্খ করিয়া রাখিলে কি যুদ্ধকার্য্য ভালরূপ হইবে ? বস্তুতঃ জ্ঞানী হইয়া যেমন কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করা যায়, অজ্ঞানী হইয়া

সেরূপ ভাবে কার্য্য করা যায় না। অতএব সামাজিক দৃষ্টিতেও শূদ্রকে অজ্ঞ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহার পর শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে যদি পাপও হয়—স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে পাপ কোন অনিষ্টহেতু হইতে পারে না। এই পাপটি সঞ্চিত কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তাহার ধ্বংস হইয়া যায়। যথা গীতায় ভগবদ্‌বাক্য—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৮
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৪।৩৬
মাং হি পার্থ। ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯।৩৯
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

অতএব বেদশ্রবণে যে পাপ তাহা বেদজ্ঞানদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য শূদ্রের নিবৃত্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

আর যদি এ কথায় আপত্তি করিয়া বলা হয় যে, এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞানেই সঞ্চিতাদি কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি, তাহা হইলে বলিব—না, পরোক্ষ জ্ঞানেও সঞ্চিত কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু গীতামধ্যে উক্ত জ্ঞানকেই পরোক্ষ বলা হইয়াছে। যথা—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৪।৩৯

যে শ্লোকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মধ্বংসের কথা আছে, তাহারই পরের শ্লোকে বলা হইতেছে যে, সেই জ্ঞান যোগসংসিদ্ধ হইয়া কালে আত্মাতেই লব্ধ হয়। অতএব ইহার পূর্ব্বাবস্থা পরোক্ষ জ্ঞানই হইতেছে।

অবশ্য, ভামতীকার বলেন, পরোক্ষ জ্ঞানীরও নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে পাপ হয়।

বলিয়াছেন (বেদান্ত দর্শন ৪৭০ পৃঃ) কিন্তু এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম মদিরাদি সেবন প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

এই কারণে বেদশ্রবণে যে পাপ তাহার জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। আর এই কারণে শাস্ত্রে শূদ্রের বেদশ্রবণে যে পাপের কথা আছে, তাহা শ্রবণমাত্রজন্য পাপ নহে, পরন্তু বেদের অপব্যবহার বা নিন্দাজনিত পাপ বা বেদবিষয়ে অপরের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা-উৎপাদন-জনিত পাপ। এ পাপ যে শূদ্র ক'রবে না, তাহার আর কোন পাপ হইবে না। সুতরাং সমাজিক সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া যদি শাস্ত্রের বিধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে শূদ্রমাত্রেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই বা বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই তাহা নহে। যাহারই বেদের উপর শ্রদ্ধা আছে, বেদাধ্যয়নে বাসনা আছে, এবং বেদার্থগ্রহণ ও ধারণে সামর্থ্য আছে, তাহাকেই উপনীত করা যাইতে পারে, তাহাকেই বেদাধ্যাপনা করা যাইতে পারে। অথবা যে শূদ্রের পিতামাতারও পুত্রকে দ্বিজাচারে প্রতিপালিত করিবার ইচ্ছা আছে, সেই শূদ্রসন্তানকে উপনীত করাও যাইতে পারে। বলা বাহুল্য সকল স্থলেই জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রকৃত অধিকারীর নির্ণয়ে সহায়তা করিতে পারিবে। অতএব অনধিকারচর্চ্চাজন্য কুফলের সম্ভাবনা অতি অল্পই হইবার কথা।

কিন্তু তাহা হইলেও এখন একটি আপত্তি হইবে যে, যদি দ্বিজাচারের জন্য বাসনা এবং সামর্থ্যই কারণ হইল, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করের মতই যে বিরুদ্ধ হয়। কারণ, বেদান্তদর্শনের অপশূদ্রপ্রকরণে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সামর্থ্য না থাকিলে অর্থিত্ব ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি কারণ হইতে পারে না, এবং সেই সামর্থ্য লৌকিক হইলেও হয় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই প্রয়োজন। কিন্তু শূদ্রের বেদা-ধ্যয়নের অভাববশতঃ সেই শাস্ত্রীয় সামর্থ্য জন্মে না। যে হেতু শূদ্রের উপনয়ন নাই, উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন অসম্ভব, যেহেতু শাস্ত্রীয় সামর্থ্য জন্মে না, ইত্যাদি।

কিন্তু এ আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, এতদ্দ্বারা বিবিদিষা, শ্রদ্ধা ও গ্রহণধারণসামর্থ্যসম্পন্নতা শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝায় না। যে হেতু

এতাদৃশ শূদ্র স্বয়ং বেদ পড়িলেও তাহার বেদার্থজ্ঞান হইতে বাধা। বেদার্থজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু, উচ্চারণটি হেতু নহে। পূর্ব্বকালে স্বয়ং বেদ পড়িবার উপায় ছিল না; গুরু বেদদান না করিলে বেদ লব্ধই হইত না, আজকালের মত অর্থ দিয়া ক্রয় করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদাধ্যয়নরূপ শাস্ত্রীয় সামর্থ্য অর্জিত হইবার উপায়ও ছিল না। অগত্যা শূদ্রের অধিকার নাই কথিত হইয়াছে।

তাহার পর আর এক কথা। আচার্য্য যে অর্থিত্ব ও সামর্থ্যকে অধিকারের জ্ঞাপক বলিয়া শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অভাববশতঃ অনুপনীতের সুতরাং শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই বলিয়াছেন, তাহার অর্থটি একটু বিশেষ ভাবে দেখা যাউক। এখানে দেখা যাইতেছে একজন বেদদান করিবেন অপরে গ্রহণ করিবেন। যিনি গ্রহণ করিবেন তাঁহার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অভাব থাকিলে তাঁহার বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। এখন শাস্ত্রীয় সামর্থ্যটি কি? ইহা একজনকে উপনীত করা। অর্থাৎ যিনি বেদদান করিবেন তাঁহার কার্য্যজন্য একটি শক্তি, যিনি গ্রহণ করিবেন তাহাতে সঞ্চারিত কর। তাহা হইলে এক্ষেত্রে অধিকারীর সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে তাহার জন্মগত হইল না। উহা অপর ব্যক্তিগতও হইল। আর এই অপর ব্যক্তি যে সর্ব্বত্র যথার্থ দ্বিজসন্তানে এই সামর্থ্য অভ্রান্তরূপে উৎপাদন করিবে, তাহা আশা করা যায় না। সুতরাং এই শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের মূল্য কি? ইহা সমাজের আচার বলিয়া যে মূল্য সেই মূল্য। দৈবায়ত্ত জন্মাদির ন্যায় ইহার কোন মূল্য থাকিতে পারে না। অতএব আচার্য্যের উক্ত যুক্তির অর্থ শূদ্রকুলে জন্মই বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার-বিরোধী নহে।

যদি বলা হয় স্বয়ং বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন হইবে না, কারণ, অধ্যয়নের জন্য উপনয়নসংস্কার আবশ্যক। শূদ্রের উপনয়নে বিধি নাই। উপনয়ন না লইয়া স্বয়ং বেদ পড়িলে তাহা অশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন হইবে। তাহাতে প্রবৃত্তি হইলে শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধার অভাবই প্রমাণিত হইবে। আর শ্রদ্ধার অভাবনিবন্ধন তাহার

জ্ঞানই হইবে না; যে হেতু শ্রদ্ধাটি শাস্ত্রের উপর প্রামাণ্যবুদ্ধির পরিচায়ক।

এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বিধি নাই তথাপি পড়িতেছি এই জ্ঞানই ত এস্থলে অশ্রদ্ধার সূচক। যাহার এ জ্ঞান হয় না, প্রত্যুত

"শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্॥"

এই বাক্য অনুসারে বেদাধ্যয়নে বিধি আছে এইরূপই জ্ঞান হয়, তাহার ত আর তাহা হইলে অশ্রদ্ধা থাকিল না। এতদ্ভিন্ন বিধির তাৎপর্য্য ভাবিলে বুঝা যায় যে শ্রদ্ধা ও গ্রহণ ধারণ সামর্থ্য যাহার আছে সেই অধিকারী, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করাই হইয়াছে, অতএব বস্তুতঃ বিধির অভাবই নাই। সুতরাং অশ্রদ্ধা হইতেই পারিবে না। তাহার পর শূদ্র ধনদান দ্বারা বিদ্যাগ্রহণ করিত ইহা আচার্য্য ছান্দোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা—

"শূদ্রবদ্ বা ধনেনৈব এনং বিদ্যাগ্রহণায় উপজগাম নচ শুশ্রূষয়া" ইত্যাদি ৪১৫ পৃঃ।

এস্থলে রৈক্ব ঋষি জানশ্রুতিকে কেন শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহার নানা হেতু বলিতে গিয়া আচার্য্য একটি হেতু বলিলেন যে, "অথবা এই জানশ্রুতি শূদ্রের ন্যায় কেবল ধন দ্বারাই বিদ্যাগ্রহণের জন্য ইহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুশ্রূষার দ্বারা নহে—এই কারণেও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াছেন, ), বস্তুতঃ তিনি জাতিতে শূদ্র নহেন" ইত্যাদি। অতএব শূদ্র যে বিদ্যালাভ করিতে পারিত না তাহা ত আর আচার্য্যবাক্য হইতে সিদ্ধ হয় না। এস্থলে বাস্তবিক জানশ্রুতি পরে যে বিদ্যালাভ করিলেন তাহা ধনদ্বারাই লাভ করিলেন। যাহা হউক শূদ্রের যে শাস্ত্রে বেদশ্রবণে বিধি নাই, তাহা কিন্তু সিদ্ধ হইল না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও তাহা তখন সমাজে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, ইহা একেবারে অবৈধ তাহাও ত বলা গেল না। সমাজে প্রচলনের নানা হেতু থাকে, দেশভেদে আচারভেদ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। অতএব

প্রার্থী ও সমর্থ শূদ্রকে নিষেধ করা আচার্য্যের উদ্দেশ্য নহে। আচার্য্য, সূত্রকারের সময়ের সামাজিক আচার দেখিয়া শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্ম বিদ্যালাভের অসম্ভাবনা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ইহাই আপাততঃ বলা যাইতে পারে।

এ কথায় কেহ কেহ আবার আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, না, আচার্য্যের এরূপ অভিপ্রায় নহে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—ইহা আচার্য্য সম্পূর্ণই বিশ্বাস করিতেন। কারণ, উক্ত অপশূদ্রপ্রকরণে পূর্ব্বপক্ষীয় মতখণ্ডনকালে "তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্যাখ্যাতে তিনি বলিতেছেন—এস্থলে যজ্ঞপদে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডমাত্র অর্থ করিয়া জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড পৃথক্ বলিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার আছে বলিবে, তাহা বলা যায় না, কারণ, এস্থলে যজ্ঞ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যাও বুঝিতে হইবে ইত্যাদি। বস্তুতঃ এই বাক্যটি সামান্যতঃ শূদ্রজাতিবোধক। পূর্ব্বোক্ত "শূদ্রো বহুপশুঃ অযজ্ঞীয়ঃ" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় নিম্নাধিকারসূচক বিশেষণ পদ ইহার সঙ্গে নাই যে, এস্থলে শূদ্র শব্দে নীচ অনধিকারী অসমর্থ শূদ্রকে গ্রহণ করিয়া সমর্থ শূদ্রের পক্ষে বিধি রক্ষা করিতে পারা যাইবে। তাহার পর উক্ত বাক্যটি শ্রুতিবাক্য এবং "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" বাক্যটি স্মৃতিবাক্য। অতএব শূদ্রের পক্ষে বিধি নাই—ইহাই সিদ্ধ হয় ও তাহাই আচার্য্য বলিয়াছেন ইত্যাদি।

কিন্তু এ আপত্তিও সমীচীন নহে। কারণ, এস্থলেও নীচশূদ্রবোধক প্রসঙ্গ থাকায় আচার্য্য নীচ অসমর্থ শূদ্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এস্থলে যে শূদ্রের কথা আছে তাহা উক্ত শ্রুতির পূর্ব্বাপর বাক্য এবং তাহার সায়নভাষ্য দেখিলে বাহক শূদ্রকেই লক্ষ্য করা হইতেছে বুঝা যায়। আচার্য্য এস্থলে ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে অন্যমতাবলম্বী বলা যায় না। শূদ্রজাতিসমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার বিচার হইতেছে বলিয়া বিশেষ ভাবে এ কথা বলিবার আবশ্যকতা হয় নাই। যে হেতু ব্রহ্মবিদ্যা যে সকল ব্রাহ্মণেরও অধিকার্য্য নহে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায়

অধিকারী” বলিলেও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গুরুভক্ত প্রভৃতি নহে তাঁহারা অধিকারী নহেন এ বাক্যের অপলাপ করা হয় না, তদ্রূপ শূদ্র বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী নহে বলিলে সমর্থ ও অর্থী শূদ্র যে অধিকারী এবাক্যের অপলাপ করা হয় না। অতএব এ আপত্তি নিরর্থক। উক্ত শ্রুতিও তাহার সায়নভাষ্য এই—

“পত্তঃ একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণাম্ অশ্বঃ পশূনাং, তস্মাৎ তৌ ভূতসংক্রামিণৌ অশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ, তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তো, নহি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎ পাদাবুপজীবতঃ পত্তোহ্যসৃজ্যেতাম্।” (তৈত্তিরীয়)।

ইহার ভাষ্য যথা—

পত্তঃ—পাদতঃ। ভূতানাং পূর্ব্বোৎপন্নানাং ব্রাহ্মণাদীনাং সংক্রামঃ সম্যগ্ আক্রমণং তদধীনত্বেন অবস্থানম্ ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং ভূতসংক্রামো যয়োঃ অশ্বশূদ্রয়োঃ তৌ উভৌ ভূতসংক্রামিণৌ। শূদ্রাণাং বর্ণত্রয়পরিচর্য্যামুখ্যত্বেন তদধীনত্বম্। অশ্বানাং চ বহনেন তদধীনত্বম্। অত্র পূর্ব্বস্থান্তেভ্যঃ ইব পদতঃ ন কাচিৎ দেহবতা সৃষ্টা, তস্মাৎ দেবতাম্ অনুসৃজ্যত্বাভাবাৎ শূদ্রো যজ্ঞে প্রবর্ত্তিতুং ন যোগ্যঃ। যস্মাৎ অশ্বশূদ্রৌ পদতঃ উৎপন্নৌ তস্মাৎ পাদাবেব তয়োঃ জীবনসাধনম্। শূদ্রোহি ব্রাহ্মণাদ্যাজ্ঞয়া পদ্ভ্যাং যত্র ক্বাপি গমনাগমনে কুর্ব্বন্ জীবতি। অশ্বশ্চ ব্রাহ্মণাদিবাহি পাদৈঃ যত্র ক্বাপি গচ্ছন্ খাদ্যং লভতে। তৈঃ সং ৭।১।১, পৃ ৪২৪২।

অতএব এতদ্বারা আচার্য্যমত যে শূদ্রমাত্রেরই বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী তাহা সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষী শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের প্রতি যে অর্থিত্ব ও সামর্থকে হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সামর্থ্যরূপ হেতুটি মুখ্য, তাহার শূদ্রে সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন বলিয়া ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শূদ্র বেদ কোনরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই পারে, ইত্যাদি।

প্রকৃত কথা এই যে, অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে শূদ্রগণে দ্বিজদ্বেষী ছিল। তাহাদের আচারব্যবহার অতি কদর্য্য ছিল, এজন্য তাহাদের স্থান অতি নিম্নেই ছিল। উহারাই পশুমেধ যজ্ঞে পশুবৎ নিহত হইত। উহা-

দের অনেক স্থলে মনুষ্যই জ্ঞান করা হইত না। এই কারণে তাহাদের বেদলাভের অভাব ঘটিত। আর সেই কারণে তাহাদের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সূত্রকার অস্বীকার করিয়াছেন এবং আচার্য্য তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কেহই জন্মনিবন্ধন তাহাদের অধিকার অস্বীকার করেন নাই, বেদাধ্যয়নরূপ আচরণের অভাবনিবন্ধন তাহাদের অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন; অতএব এতদ্দারা শূদ্রকুলে জন্মই একজনের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিবন্ধক বলা হইল না।

তাহার পর সদাচারী সমর্থ ও অর্থী শূদ্রের যদি বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আচার্য্যের অথবা ভগবান ব্যাসদেবের অভিপ্রায় না হইবে, তাহা হইলে ব্যাসদেব অপশূদ্রপ্রকরণের শেষ সূত্রে অর্থাৎ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" সূত্রে শ্রবণ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞানের অভাববশতঃ শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই—এ কথা বলিতেন না। তাহা হইলে তাঁহারা দ্বিজত্বাভাবকে হেতু দিতেন। অর্থাৎ যেহেতু শূদ্র দ্বিজকুলজাত নহে, সেই হেতু তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই এইরূপ বলিতেন বস্তুতঃ দ্বিজত্ব ও বেদাধ্যয়ন সমানার্থক নহে। দ্বিজ হইলেই যে বেদাধ্যয়ন হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। কারণ, তাহা হইলে শকাদি ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত না, অথবা বেদাধ্যয়ন যে দ্বিজেরই হয়—এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। যেহেতু সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ শূদ্র স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে পারে। কারণ, শাব্দবোধের জনকীভূত ব্যাপারবিশেষের নামই অধ্যয়ন। আর সেই ব্যাপার ইচ্ছাদিকারণজন্য এবং পদপদার্থ ও তাহাদের সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞানজন্য হয়। যদি বেদাদি শাস্ত্র লিখিত আকারে না থাকিত, কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই যদি প্রাণান্তেও শূদ্রকে বেদ না দেন অথবা শূদ্রসমীপে বেদাধ্যয়ন না করেন, তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে উহার লাভ অসম্ভব হইত, তাহা হইলে বেদাধ্যয়ন দ্বিজেরই হয় বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত ঘটে নাই ও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং বেদাধ্যয়নাদির অভাবকে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবের হেতু করায় অর্থী ও সমর্থ শূদ্রের পক্ষে প্রকারান্তরে বিধিই দেওয়া হইল।

( আগামী বারে সমাপ্য ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

# পল্লী সংগঠন

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

সাধারণ ভাবে গ্রামের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় সে বিষয়ে যাঁরা গ্রামে বাস করেন না তাঁরা ধারণাই করতে পারবেন না। আমি জানি, কোন একটি বিখ্যাত গ্রাম, যে গ্রামে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস, সেখানে গ্রাম-পার্শ্বস্থ একটি গভীর পগারের উপর সারি সারি কঞ্চি ও বাঁশ দিয়ে সমস্ত গ্রামবাসীর শৌচের স্থান করা হয়েছিল। পগারটি যেখানে যাঁর বাড়ীর কাছে সেখানে তিনি বাঁশ গাছের ঝোপের বা কিছু দড়মার আড়াল দিয়ে শৌচের স্থান করে নিয়েছিলেন, বহুবর্ষের মল সেখানে জমেছিল। একবার দুটি বধূ বাঁশ ভেঙ্গে একসঙ্গে এই বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ে গিয়েছিলেন, বহু কষ্টে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। আর একবার সেই গ্রামেরই একজন বয়ীয়সী রমণী বাঁশ ভেঙ্গে গর্ত্তে পড়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে একটি কঞ্চী তাঁর তলপেটে ঢুকে যায় এবং তাইতেই কয়েক দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাত্রে বনবরাহ ও সাপ প্রভৃতির ভয়ে শৌচের দরকার হলে অনেকেই ঘরের কানাচে বা কোঠা থাকিলে তার ছাদে বসে শৌচে যান, এবং মল সেখানেই সঞ্চিত থাকে, অথচ শুচিতা বিষয়েও গ্রাম্য-মহিলা বিশেষতঃ বিধবাদিগের সাবধানের অন্ত নেই।

মহিলাদের অপেক্ষা পুরুষদের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রায় দেখা যায় পুরাণো চকমিলানো জমীদার বাটী, তার অনেকাংশই কতক কতক ভেঙ্গে গিয়েছে, ছাদের উপর বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। গ্রামে জমীদার বংশে যাঁরা বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্পত্তিতে কিছু উন্নত, তাঁরা আর গ্রামে বাস করেন না। তাঁদের শরিক যাঁরা হীন অবস্থায় অথবা কতক স্বচ্ছল অবস্থায় গ্রামে বাস করছেন তাঁদের মধ্যে শরিকানী বিবাদ লেগেই আছে। অনেক জমীদার বংশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত

সন্তানেরই বংশের গরিমা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা বিলক্ষণ আছে, কিন্তু নষ্ট-গৌরব উদ্ধারের উৎসাহ বা উদ্যম একেবারেই নেই। দুচার ঘর প্রজার কাছে কিছু আদায় তসীল করেন, নিজের অংশের কোঠা ঘরের যতটা ব্যবহার যোগ্য আছে তার উপর দুচারখানি চালা তুলে কোন রকমে দাবা পাশা খেলে ও দলাদলি করে দিনপাত করেন এবং বাড়ীর মেয়েদের উপর প্রভুত্ব করে তৃপ্ত হন। নিজেও ম্যালেরিয়ায় ভোগেন, পরিবারেরাও ভোগেন, আর্থিক দুরবস্থার জন্যও বটে, অলসতার জন্যও বটে ঔষধ পথ্যাদির বিষয়ে ততটা মন দিতে পারেন না। প্লীহায় উদর পূর্ণ ছেলেমেয়েগুলি ও রুগ্ন স্ত্রী নিয়ে কোনরূপে দিনপাত করেন। ওঁদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা কিছু ভাল, তাঁরা অনেক সময় ছেলেমেয়ের বে, রাস, দোল বা দুর্গোৎসবে বেশ একটু খরচ করেন, সহর থেকে বাইজী আনানো দুর্গোৎসবের প্রায়ই একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত। এক পল্লীগ্রামের জমীদার বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা ভাসানের দিন যে আমোদ হয়েছিল, একজন বর্ণনাপটু রসিক লোক তার এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন, "ওঃ সে আমোদের কথা আর কি বোল্‌বো! দুর্গা প্রতিমা ছাড়া আর সব্‌বাই মদ্ খেয়ে মাতাল হয়েছিল।" তাঁর এই বর্ণনাটি খাঁটি সত্য।

পুরুষেরা দ্বিপ্রহর অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাস পিট্‌ছেন, দাবা পাশা ও পরচর্চ্চায় মস্‌গুল হয়ে আছেন, মেয়েরা বনে জঙ্গলে ঘুরে কাঠখড়ের সন্ধান কর্‌ছেন রাঁধতে হবে বলে। আমি অনেক পরিবারের কথা জানি, যেখানে মেয়েরা কুড়াল দিয়ে নিজেই অনেক সময় কাঠ কাটিয়া লন আর পুরুষেরা দাবা পাশা সারিয়া ঘরে আসিয়া রান্নার দেরীর জন্য উগ্র হয়ে উঠেন।

মেয়েদের নিন্দাচর্চ্চা ও পল্লী-পুরুষদের বিশেষ মুখরোচক। বিশেষতঃ মেয়েদের স্বাবলম্বন তাঁদের কাছে বিশেষরূপেই অপরাধ বলে গণ্য। কোন অসহায়া বিধবার বেড়ার দেয়ালের মাটি খসে গিয়ে বেড়াগুলি ক্রমে জীর্ণ হতে লাগলো। অর্থহীনা অসহায়া বিধবা জমীদার বংশেরই এক আনি অথবা আধ আনির শরিক, একটি নাবালক পুত্রের জননী। উপায়ান্তর না দেখে তিনি নিজেই কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে নদী থেকে

মাটি কেটে এনে বেড়ায় মাটি ধরাতে লাগলেন, তাঁর এই অসম্ভ্রমের কাজ ও পুরুষের ন্যায় আচরণে গ্রামের পুরুষগণ যেরূপ ভাষায় তাঁর নিন্দা করলেন সে ভাষা আর লেখা যায় না। একই পুকুরঘাটে, হয় তো তৎক্ষণাৎ কোন শিশু শৌচ করে গেল, ঢেউ দিয়ে জল সরিয়ে কেউ বা তখনই তাতে মুখ ধুলেন, পল্লীর শুচিতার তাতে কোন হানি হয় না। কলেরার সময় এরকম ভাবে চল্‌লে কি বিপত্তি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের সময় যখন জ্বরের বেশী বাড়াবাড়ি, তখন অনেক গ্রামেই সত্যসত্যই মুখে জল দিবার লোকটি পর্যন্ত থাকে না। এই যে "কেউ কারো মুখে জল দেবার মত সুস্থ নেই" কানে শোনা এই কথাটির বাস্তব চিত্র যে কী ভয়ানক তা যিনি চোখে না দেখেছেন তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু সুবিধা এই যে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লেই অনেকে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে এবং খাওয়াটিও বাদ যায় না। মা যখন লেপ থেকে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে হাট হতে ছেলে যে ইলিস মাছ কিনে এনেছে তাই রান্না কর্‌ছেন, ছেলে ততক্ষণে ঘরে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে লেপ মুড়ি দিয়েছেন, অগত্যা মা এক বাটী মাছ ও ভাত ছেলের জন্য ঢেকে রাখেন—ছেলে যেন লেপ থেকে উঠেই খেতে পায় এবং এই বলে দুঃখ করেন, "বাছা আমার হাটের মাছটি নিয়ে এসেই লেপের নীচে শুলো। বাসী মুখে কিছু দেয়নি। দুগ্রাস ভাত খেয়েও নিতে পারলে না।"

পাবনা জেলার একটি গ্রামের কথা আপনাদের বলছি—গ্রামটি খুবই সমৃদ্ধ ছিল, এখন তার অবস্থা অন্য সব গ্রামের মত। গ্রাম পাবনা থেকে ২।৩ ক্রোশ দূরে—ইছামতির ধারে। গ্রামে এখনও ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন পল্লী আছে, মাঝে মাঝে বুনো শূয়ার এসে গ্রামে উৎপাত করে বলে জনৈক যুবক একবার একটি শূয়ারকে গুলি করে। গুলি খেয়ে শূয়ারটি যে কোথায় গেল তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই দুর্গন্ধে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো। কোথা থেকে দুর্গন্ধ আস্‌ছে সন্ধান করে জানা

গেল, একটি প্রকাণ্ড কামরাঙ্গা গাছের তলার ঝোপের দিক থেকেই গন্ধ আসছে। পুরুষেরা এ বিষয়ে ততটা মনোযোগ করলেন না। নদীর ধারের দিকে গন্ধ কম, তাঁরা নাকে কাপড় দিয়ে কোন রকমে আহার শেষ করে নদীর ধারে একটি কাছারী ঘরে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। মেয়েদের অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো, দুর্গন্ধে অনেকের এত বমী হতে লাগলো যে, কেউ কেউ শয্যাগত হয়ে পড়লেন। একজন বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পাড়া ছেড়ে যেতে হোল। অবশেষে পল্লী গৃহিণীরা দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে স্নানের সময় দলবদ্ধ হয়ে বাহির হলেন। কামরাঙ্গা গাছের কাছে গিয়ে ঝোপের মধ্যে একটি জন্তু মরে আছে দেখ্‌লেন, সেটি ফুলে প্রায় ছোট একটি মোষের মত হয়েছে এবং সাদা সাদা পোকায় সেখানে অদ্ধেক জমী ভরে গিয়েছে। তখন বুঝা গেল, গুলি খেয়ে শূয়ারটি এই ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখানেই মারা গেছে। এখন এই পচা শূয়ারের সৎকার করে কে? পাবনা থেকে মেথর আনার খরচ ও পরিশ্রম স্বীকার কর্‌তে সকলেই নারাজ—"কেন আমি কোরবো? গ্রাম তো আমার একার নয়।" অনেকে বল্লে, যে শূয়ার মেরেছে সেই করতে বাধ্য। কিন্তু সে নির্ব্বাক রইল, যেহেতু বোবার শত্রু নেই। তখন মেয়েরা যুক্তি করে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে এক এক বোতল কেরাসিন তেল সংগ্রহ করে দুটিন কেরাসিন তেল ও সেই সঙ্গে কাঠকুটা সংগ্রহ করলেন। বরাহ বধকারীকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বোঝা কতক কাঠ দিতে হোল। সেই কাঠ ও কেরাসিন তেলে গাছের তলাতেই শূকরের তিন দিন ধরে সৎকার করা হোল। এই সময়ে গ্রামবাসীদের কি রকম দুর্দ্দশা হয়েছিল তা বর্ণনা করা বাহুল্য। সত্যের অনুরোধে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, শূকরটির সৎকারের সময় পল্লী পুরুষেরা লম্বা লম্বা বাঁশ হাতে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমস্ত গ্রাম্য ব্যাপারে একটি বিষয় অনুধাবনের যোগ্য, সেটি হচ্ছে—পুরুষদের তুলনায় পল্লীরমণীগণের কর্ম্মতৎপরতা। পল্লী-জীবনে পুরুষদের অপেক্ষা রমণীদের প্রাণে শক্তির বিকাশ অধিক দেখা যায়।

অনেক স্থলে সংসারের কর্ম্মভার পুরুষ অপেক্ষা রমণীরাই বেশী বহন করে থাকেন। অনেক পল্লাগ্রামের বিধবাকে তাঁর সামান্য জোত্‌জমার খাজনা আদায় ও ফসলের তাগিদ করে নিজেকেই নাবালক প্রতিপালন করতে হয়, এঁরা আইনকানুনও কিছু কিছু বোঝেন তা ছাড়া আমসত্ব, আমচুর, মাটীর ও পাথরের ছাঁচ ও কাঁথা তৈরী করেও ভদ্র বিধবারা অনেক সময় নিজের সংসারের খরচ চালান। তাঁদের এত অল্প আয়ে সংসার চালানো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, দেখলে অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ হয়। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথাটিও স্বীকার করতে হয়, অনেক সময় কলাটা মূলোটা পরের ক্ষেত থেকে না বলে লওয়াটা তাঁরা দোষের মনে করেন না। আরও দুঃখের বিষয়, জননীর ক্ষুদ্র সহযোগী রূপে খোকাখুকীরাও নির্ব্বিবাদে শিশুকাল থেকে এরূপ কুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এই অভ্যাসগুলি যে কেবল আর্থিক দুরবস্থার কঠোরতায় হয়ে থাকে তা নয়, এগুলিকে একরূপ পল্লীগ্রামের প্রচলিত অভ্যাসও বলা চলে। মায়েরা না বুঝে নির্দ্দোষ শিশুকে যে অন্যায় কার্য্যের সহকারী করেন, ভবিষ্যৎ জীবনে যদি তারা প্রকৃতপক্ষেই চোর হয়, তবে তাদের সেই দোষের জন্য তাদের মায়েদের যে দায়িত্ব নেই, এ কথাও বলা যায় না।

কেবল প্রচলিত অভ্যাস নয়, শরিকানী বিবাদও অনেক সময় এর কারণ। দুই বাড়ীর মধ্যের নারিকেল বা আমগাছ যদি সামান্য জমীর জন্য এক শরিকের অংশের মধ্যে গিয়ে পড়ে তার জন্য বিবাদ অনিবার্য্য। সেই গাছের ফলটি পোড়লেই গাছটি যাঁর অংশের বাহিরে তিনি যদি তাঁর ছেলে বা মেয়েকে বলেন, "ওই যে ফল পড়্‌লো, ওরা না দেখ্‌তে পায় দৌড়ে কুড়িয়ে আনগে যা" তবে সেটা দোষের,—পল্লীবাসিনী জননীর এ কথা মনেই আসে না। স্নেহ মমতা ও মনের কোমলতা পল্লীরমণীর একটি বিশেষত্ব, যত্ন করে অতিরিক্ত খাওয়ানো ও অসুখের সময় লুকিয়ে কুপথ্য দেওয়ায় আবার সেই স্নেহ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। কোন শিশু পীড়িত থাকলেও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তার মা—"অসুখ তো বারমাসই আছে" বলে যথাসাধ্য খাইয়ে থাকেন। বস্তুতঃ বারমাস

সগোষ্ঠী ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে অথবা সাবধানতায় যে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, এ বিশ্বাস তাদের লোপ পেয়ে গেছে।

পল্লীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পুরুষানুক্রমে চলিত আচারনিয়ম ও সংস্কার প্রভৃতির ঘাত প্রতিঘাতে পল্লীগ্রামের রমণীর জীবন যে ভাবে গড়ে উঠে, সহরের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত রমণী-জীবন যে তা থেকে ভিন্ন-রূপ হবে এতে ভুল নেই। সহরের আত্মীয়তার মধ্যে যে 'কেতাদুরস্ত' ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, পল্লীর আত্মীয়তা তেমন বাহিরে মার্জ্জিত নয় বটে, কিন্তু সে আত্মীয়তায় সহজ সরলভাব ও আন্তরিকতা অধিক। কিন্তু, পল্লীরমণীরা কুসংস্কারের প্রেরণায় অনেক সময় দারুণ নিষ্ঠুরাচরণও করে থাকেন। আমি একজন জমীদার-জননীর কথা জানি, যাঁর একমাত্র পুত্রবধূ সহরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর কন্যা। বধূ, শৈশবাবধি কলিকাতায় থাকাতে পল্লীগ্রামের স্নান প্রণালীতে অনভ্যস্ততার জন্য তাকে অনেকবার ডুব দিতে বাধ্য হ'তে হোত। মেয়েলী শাস্ত্র অনুসারে, ডুব দেওয়ার সময় যদি একটু কাপড়ও ভেসে ওঠে, তবে সে ডুব দেওয়ায় শুদ্ধ হতে পারা যায় না, এজন্য কাপড় খুব ভাল করে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ডুব দেওয়ার নিয়ম। বধূর কাপড় ভেসে উঠে কি-না দেখবার জন্যে একজন দাসী ঘাটে বসে থাক্‌তো। অনভ্যাসের জন্য বারবারই বধূর কাপড় ভেসে উঠ্‌তো এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে কাপড় সমেত্ সে জলের তলে তলিয়ে গিয়ে ডুব দিতে না পারতো ততক্ষণই তাকে ডুব দিতে হোত, ফলে সে বেচারী শীঘ্রই পীড়িত হয়ে মারা গেল।

পল্লীগ্রামের হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে এই স্নানের শুদ্ধতার প্রণালী এক এক জেলায় এক এক রূপ। এক জেলায় গ্রামের রমণীগণ নদীতে স্নান করবার সময় আগে পিতলের কলসী মাজেন তার পর যতগুলি কাপড় সঙ্গে আনেন সেগুলি কাচেন। পরে সেই কাচা কাপড়ের রাশি কাঁধে নিয়ে, ঘড়াটি নদীগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে প্রথমবার ডুব দেন, দ্বিতীয়-বার আবার ঘড়া ধুয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে কাপড় সমেত্ ডুব দেন, এবং তার পর তৃতীয়বারও এই ভাবে ডুব দিবার পর ঘড়া ধুয়ে জল ভরে নিয়ে যান। প্রত্যেকেই এই ভাবে স্নান করেন, একজনও অন্যথা করেন

না। অন্য এক জেলায় স্নান প্রণালী একই রূপ, কিন্তু ডুব দিবার সময় সেখানে ঘড়াটি উপুড় করে চেপে ধরে ঘড়া ও কাপড় প্রভৃতি সমেত্ ডুব দিতে হয়।

স্নানের সংস্কার ভিন্ন আরও নানা রকম সংস্কার আছে। তার মধ্যে আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে সংস্কারটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আঁতুড় এতই অশুচি যে আঁতুড় ঘরে আগুন লাগ্‌লেও সহজে কেহ নিভাইতে অগ্রসর হয় না। বিধবারা আঁতুড়ের সংশ্রবে এলে তাঁদের 'পূর্ব্বধর্ম্ম প্রণশ্যতি' ঘটে। আমি জানি, কোন এক পরিবারে একটি প্রসূতির আঁতুড় ঘরে ধনুষ্টঙ্কার হয়, তাঁর বিধবা বোন তাঁর কাছেই ছিলেন, কিন্তু বিধবা বলে শুশ্রূষা করতে আঁতুড় ঘরে যেতে পারলেন না, পুরুষেরাই যথাসাধ্য শুশ্রূষা করলেন। তাঁদের কোন আত্মীয়ের গৃহে এই সম্বন্ধ আলোচনা হচ্ছিল, ঘটনাটি শুনে ধর্ম্মজ্ঞানে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা একটি অল্প বয়স্কা বধূ বলেছিলেন, "কি আশ্চর্য্য। বোনকে তিনি অত ভালবাসেন, কিন্তু যখন তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি তখন আঁতুড় ঘর বলে তিনি কাছে গেলেন না?" এ কথায় তার এক দিদি শাশুড়ী তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "তারা তো তোদের মত খ্রীষ্টান নয়? সে আঁতুড় ঘরে যাবে কি করে বল দেখি। কত কষ্ট করে ভাইএর সংসারে থেকে গরিব মানুষ একটু তীর্থ ধর্ম্ম করেছে, আঁতুড়ে ঢুকে সেটুকু খোয়াবে নাকি? বোনের কপালে থাকে সে বাঁচবে, না থাকে হাজার যত্ন করলেও বাঁচ্‌বে না, মাঝে থেকে বিধবা মানুষ সে তার পুণ্যিটুকু খোয়াবে কেন?" আঁতুড় ঘর ভীতির সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে তবে সংক্ষেপে আর একটি ঘটনা বলে এখানে শেষ করছি এই গল্পটি বড়ই নিদারুণ। এক মহিলার ত্রিশ বৎসর বয়সে অনেক ঠাকুর দেবতার অর্চ্চনা করে একটি পুত্রলাভ হয়েছিল। কিন্তু আঁতুড় ঘরে থাকার সময় একদিন বৈকালে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হোল। ছেলেটি তখন পাঁচদিনের মাত্র। ঝড়ে আঁতুড় ঘরের চাল ফাঁক হয়ে গিয়ে ঘরের ভিতর শিলা পড়তে লাগলো, কিন্তু প্রসূতিকে কেহ ঘরে উঠতে দিলেন না। নিরুপায়া জননী শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রেখেও তাকে

বাঁচাতে পারলেন না। আঁতুড়ের এই কঠোরতা আজকাল কিছু কমেছে। তবে "কপালে থাকে বাঁচবে"—বলে রোগীর শুশ্রূষায় অযত্নের ভাব এখনও বেশ বলবৎ ভাবেই আছে।

উপরে যে সব চিত্র দেওয়া হোল, এইগুলিই পল্লীরমণীর সম্পূর্ণ চিত্র নয়। তাঁদের অন্যদিকও আছে। তবে একথা নিশ্চয় করেই বলা যায়, যদি পল্লী-সংগঠন করতে হয় তবে সর্ব্বাগে পল্লীবাসিনী জননী ও ভগিনীগণের যাতে চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তন হয় তারই চেষ্টা করতে হবে। তাঁদের সরল আন্তরিক স্নেহ সংস্কারের বাধায় যেন প্রতিহত না হয়। এবং পল্লী-জীবনের জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় যে সব আত্ম-পরায়ণতার ভাব জাগ্রত হয় তাই যেন তাঁদের কল্যাণপথের বাধা-স্বরূপ না হয়, সেজন্য তাঁদের এমন একটি জাতীয় ভাবের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাঁদের কর্ম্মজীবন সমস্ত পল্লীর মধ্যেই স্বার্থকতা লাভ করে, কেবল নিজের গৃহে নয়।

( আগামী বারে সমাপ্য ) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার।

# সমালোচনা

আর্থিক উন্নতি—মাসিক পত্র, বৈশাখ ১৩৩৩—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; বার্ষিক মূল্য ৪৷৷৹ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীবিনয় কুমার সরকার। কার্য্যালয়—১০৭ নং মেছুয়া বাজার, কলিকাতা।

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে এই নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকাটিকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'জীবনবীমা-বিজ্ঞান,' 'গরিবের সঞ্চয় ও ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' 'ফ্রান্সে দুধের দরদ' 'বাঙ্গালীর আর্থিক

স্বাধীনতা লাভের উপায়' 'মূলতত্ত্ব,' 'বাণিজ্য-লড়াইয়ে জাপান, ভারত ও ইংল্যণ্ড' 'চাষীদের দাবী' প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 'বাংলার সম্পদ' 'আর্থিক ভারত' 'ব্যক্তি ও সংঘ' 'পাটের কুলি' প্রভৃতি আরও কয়েকটি তথ্যপূর্ণ বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও স্বদেশহিতৈষী বলিয়া সুপরিচিত। 'আর্থিক উন্নতি' তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইচ্ছা করিলেই বর্ত্তমান সাহিত্য-স্রোতে গা ভাসাইয়া, বাঙ্গালী-পাঠকের কুরুচির সুবিধা লইয়া তিনি দুপয়সা অর্জ্জন করিতে পারিতেন। আধা-বৈধ ও অবৈধ নারী-প্রেম বা পুরুষ-প্রেম ছাড়া আজকাল বাংলার পাঠক পাঠিকাগণ মাসিক সাহিত্যে বিশেষ আর কিছুই দেখিতে চাহে না—ইহা জানিয়া শুনিয়াও বিনয় বা যে এই নীরস মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও দেশের প্রতি ভালবাসার বাস্তবতা সূচিত হয়।

সাহিত্য, দেশের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে কোন দেশের উত্থানের সহিত সেই দেশের সাহিত্য যে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আমাদের দেশের উন্নতি অবনতির সহিতও বাংলা-সাহিত্য বিশেষ ভাবে জড়িত। তাই মনে হয়, সাহিত্যে কেবল এক ঘেয়ে প্রেমের প্রাচুর্য্য না থাকিয়া যাহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা হয় সাহিত্যিক মাত্রেরই, বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা উচিত। উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ের প্রতি এক একটি মাসিক পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। উহাই হইবে সেই মাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য বিষয়গুলি হইবে গৌণ মাত্র। এইরূপ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্য যদি বিভিন্ন জাতীয়-সমস্যা-সমাধানের কার্য্যভার গ্রহণ করে—তবেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভবপর, নতুবা সাহিত্য যদি ব্যবসায়ে পরিণত হয় তবে সেই সাহিত্যের নিকট কোন উচ্চ জিনিষ আশা করা যায় না।

শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু দেশের একটি প্রধান সমস্যা-নিরাকরণের জন্য 'আর্থিক উন্নতি' প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। যাহাতে এই মাসিক পত্রিকাটি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলের দৃষ্টি ও সহযোগিতা অর্জন করে -ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

ছেলেদের টলষ্টয়—মূল্য ॥০ আনা। প্রণেতা—শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় বি-এ, বি-টি।

বালক বালিকাদের উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাতে মনীষী টলষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার লিখিত কয়েকটি ছোট গল্পের বঙ্গানুবাদ আছে। গল্পগুলি এ দেশের উপযোগী করিয়া রচিত হইলেও ভাষা ছেলেদের পড়িবার মত হয় নাই।

বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার এক একটি বিশেষ ধারা আছে, যথা—দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, জীবন বৃত্তান্ত, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি লিখিবার প্রণালী ও ভাষা এক রকম নহে। অক্ষয় বাবু যে ছোট গল্পগুলির অনুবাদ করিয়াছেন তাহা গল্পের ভাষা বলা যায় না, উহা আরও সরল, মধুর ও স্বাভাবিক হইলে ছেলে মেয়েদের সুখপাঠ্য হইত।

যাহা হউক পরদেশী কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনকথা ও উচ্চ আদর্শের সহিত আমাদের দেশের বালক বালিকাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার যে আন্তরিক চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ।

শিশু চণ্ডী—মূল্য ।০ আনা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত লিখিত।

চণ্ডী পাঠ করিতে গিয়া পাতা খুলিতে প্রথমেই চোখে পড়িল, 'হিন্দুস্থান চিনি—হিন্দুস্থানের জন্য,' তারপর 'হিন্দুস্থান চিনি—চিনির সেরা' 'হিন্দুস্থান চিনি—রূপে গুণে উৎকৃষ্ট,' 'হিন্দুস্থান চিনি—গন্ধে মন মাতান,' 'বেচিলে বেশী লাভ হয়' 'বহু নকল হইয়াছে সাবধানে লইবেন' —প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। শেষে দেখিলাম 'চণ্ডী' চিনির বিজ্ঞাপনে পরিণত হইয়াছেন। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু রক্ষিত মহাশয়ের আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

# বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ *

হিন্দু ধর্ম্মের একটি প্রধান শিক্ষা—"আত্মার নাশ নাই, ইহা অবিনাশী নিত্যবস্তু ; কিন্তু শরীর পরিগ্রহ এই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম 'শরীরী'। আবার এই নিত্য শরীরীর শরীরটা অনিত্য ও বিনাশ ধর্ম্মী।" সুতরাং হিন্দুগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। গীতায় সকলেই এই সত্যপাঠ করেন,—

"অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ২।১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য——" ॥ ২।১৮

পূর্ব্বে একদিন এই পুণ্যক্ষেত্রেই বলিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের ন্যায় বৌদ্ধগণও জন্মান্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক পুদ্‌গলই কর্ম্মফলানুসারে মনুষ্য, দেব, পশু, বৃক্ষাদি সর্ব্বপ্রকার ভূত বস্তুর আকার বা শরীর গ্রহণ করিয়া জন্মলাভ করিতে পারে। বোধিসত্ত্ব গৌতমও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে নানারূপ শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের হিতকামনায় এবং শরীর যে ব্যয়ধর্ম্মী বা বিনাশশীল এই অভ্রান্ত সত্য জগৎকে উপদেশ করিবার জন্য ভগবান্ গৌতম বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক জন্ম ও মরণ বৃত্তান্ত আজ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি।

* বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ-মিশনের সভায় পঠিত।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে ( মতান্তরে ৫৬২ খৃঃ পূঃ ) বর্ত্তমান নেপালের তরাইপ্রদেশে প্রাচীন কপিলবস্তু নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত লুম্বিনী গ্রামে গৌতম বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক জন্মের পূর্ব্ব জন্মটিতে বোধিসত্ত্ব তুষিত নামক লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেবগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি জগৎত্রাতা হইয়া মনুষ্যের উদ্ধার সাধনের জন্য মানুষ লোকে অবতীর্ণ হউন।" কিন্তু দেবতাগণের অনুরোধ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে অবতরণের স্থান ও সময়, জন্ম লইবার জাতি ও কুল, কোন্ ধন্যা রমণীর গর্ভে অবস্থান করিবেন তাহা ও সেই মাতার জীবনাবসানের সময় প্রভৃতি বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনিও বুঝিলেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণের ন্যায় তিনি জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন—কপিলবস্তুর শাক্যশ্রেষ্ঠ শুদ্ধোদন তাঁহার জনক ও তৎপত্নী মায়া বা মায়াদেবী তাঁহার জননী হইবেন। তিনি ইহাও ঠিক করিয়া লইলেন যে, প্রসবের সপ্তদিবস পরেই প্রসূতির জীবন-লীলার অবসান হইবে। সুতরাং তিনি তুষিত ভুবন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, মায়াদেবীও স্বপ্নে তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন। দেবী দেখিলেন যে, একটি শ্বেত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ বুদ্ধ আকাশ-পথ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ পূর্ব্বক তদীয় গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সাঁচি—প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি নিদর্শনের মধ্যে মায়াদেবীর স্বপ্ন-দর্শন-চিত্র প্রস্তরে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবস্তু অবদানের একটি শ্লোকে মহাব্রহ্মা ( গাথার ভাষায় ) বলিতেছেন,—

"স্বপ্নান্তরে যা প্রমদা দদর্শ শ্বেতং গজং কুক্ষিমনুপ্রবিষ্টম্।
প্রসূয়তে সা গজসত্ত্বসারং সো ভবতি বুদ্ধো বোধিতার্থধর্ম্মো।"

মায়াদেবী স্বামীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলে পর, শুদ্ধোদন স্বপ্নার্থবেদক মৌহূর্ত্তিক ( দৈবজ্ঞ ) ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পত্নীদৃষ্ট স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা শাক্যকুলতিলক রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, দেবীগর্ভজাত পুত্র হয় সার্ব্বভৌম

নরপতি অর্থাৎ 'চক্রবর্ত্তী' হইবেন, নয় 'বুদ্ধ' হইবেন। গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর ও তজ্জননীর রক্ষা কল্পে চারিটি দেবতা নিযুক্ত থাকিলেন।" পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে যে, তাঁহার জন্মস্থান কপিলবস্তু নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত লুম্বিনী গ্রাম। বলা বাহুল্য বিগত ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে এই স্থানে মৌর্য্য সম্রাট মহারাজ অশোকের ক্ষোদিত লিপি সমন্বিত একটি পাষাণস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান্ শাক্যমুনি বুদ্ধদেব এই লুম্বিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক স্বয়ং এই পবিত্র স্থানে পূজা দিবার জন্য নিজ রাজত্বের বিংশ বর্ষে উপস্থিত হইয়া এই লিপি লিখাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—"হিদবুধে জাতে শক্য মুনীতি," এবং ভগবানের জন্মস্থান বলিয়া তিনি এই গ্রামটিকে নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন,—"হিদ ভগবং জাতেতি লুম্বিনী গামে উবলিকে কটে।"

তদীয় প্রসব একটি অত্যাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। দেবীর গর্ভ বেদনা উপস্থিত, সম্মুখে একটি শালবৃক্ষ। তিনি বৃক্ষ সমীপে দণ্ডায়মানা। কি আশ্চর্য্য। তৎক্ষণে বৃক্ষের একটি শাখা আপনা হইতে অবনত হইয়া মায়াদেবীর হস্ত সামীপ্য লাভ করিল। তাহা অবলম্বন করিয়া দেবী সুখপ্রসবা হইলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তখন পরিচর্য্যা পরায়ণ। গর্ভজাত শিশু মাতার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বিনির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকপালগণ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। শিশুর শরীরে ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব বিজ্ঞাপক দ্বাত্রিংশৎ মহাব্যঞ্জন ও অনুব্যঞ্জন লক্ষণ সমূহ লক্ষিত হইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—শিশু জন্মলাভ করিয়াই সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঘুরিয়া দশ দিক দর্শন করিতে করিতে সপ্তপদ গমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আমিই জগতে শ্রেষ্ঠ।" বোধিসত্ত্বের জন্ম-সম সময়ে তদীয় ভবিষ্যৎ ভার্য্যা রাহুলমাতা যশোধরা, অশ্বপাল ছন্দ বা ছন্দক, প্রিয় তুরঙ্গ কণ্টক বা কণ্থক, ক্রীড়া সহচর কালুদায়ী এবং প্রিয়শিষ্য আনন্দও জন্মগ্রহণ করিলেন

বোধিসত্ত্বের জন্মলাভের পর ঋষি অসিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিলেন যে, শুদ্ধোদনের এই পুত্র 'বুদ্ধ' হইবেন। যুবা ব্রাহ্মণ

কৌণ্ডিন্যও তদ্রূপ কথাই বলিলেন। অপরাপর ব্রাহ্মণজাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তারা সন্দেহযুক্ত হইলেন—নবজাত শিশু 'চক্রবর্ত্তী' হইবেন, কি 'বুদ্ধ' হইবেন। পিতার অভিলাষ পুত্র যেন প্রথমটি অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী হন। তাই তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া দৈবজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি বস্তুর দর্শন ঘটিলে পুত্রের সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যায় মতি প্রবৃত্ত হইতে পারে।"

তারপর সেই প্রসিদ্ধ দৃশ্যচতুষ্টয় দর্শন ও পরে মনে বৈরাগ্যের উদয়, কোলীয় রাজদুহিতা যশোধরার পাণিগ্রহণ ও তৎপুত্র রাহুলের জন্ম, রজনীযোগে রূপবতী সুন্দরীগণের বীভৎস সংস্থান দর্শনে সন্ন্যাসে দৃঢ়তর সংকল্প এবং প্রিয় তুরঙ্গ কণ্টক ও অশ্বপাল ছন্দকের সাহায্যে গভীর নিশীথে রাজপুরীত্যাগ, তৎপরে নানাস্থানে পর্য্যটন ও কৃচ্ছ্র সাধ্য তপশ্চরণে অবিশ্বাসের উৎপত্তি, গয়াধামে বোধিদ্রুমমূলে সম্বোধি প্রাপ্তি, মার বিজয় ও সারনাথে ( মৃগদাবে ) পূর্ব্বসহচর পঞ্চকের নিকট ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন, মগধদেশ ও তাহার রাজধানী রাজগৃহে ও কোশলদেশ ও তাহার রাজধানী শ্রাবস্তীতে এবং বৈশালী, কপিলবস্তু প্রভৃতি নানা স্থানে—বোধিদ্রুমমূলে দিব্যচক্ষুবলে দৃষ্ট আর্য্যসত্য ও ধর্ম্মবিষয়ক সত্য তথ্যসমূহের প্রচার ইত্যাদি তদীয় জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আজ করা হইল না। জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসরে বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বৎসর স্বোপলব্ধ 'সদ্ধর্ম্মের' প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দেহাবসানের তিনমাস অবশিষ্ট আছে। বৈশালীর উপকণ্ঠে নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারের পর, পরবর্ত্তী বর্ষাকালে তথাগত বড়ই পীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু, প্রিয়তম শিষ্যগণের নিকট বিদায় না লইয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলেন না। নিজ ইচ্ছা শক্তিদ্বারা জরার প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রতিহত করিয়া ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আরও কিছুকাল জীবন অতিবাহিত করিলেন। এ যাত্রায় আরোগ্য লাভের পর, প্রিয়শিষ্য আনন্দ তথাগতের শ্রীমুখ হইতে কিছু অন্তিম-উপদেশ লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তথাগত উত্তরে অতি

স্পষ্টভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আনন্দ, সংঘস্থ ভিক্ষু ও শিষ্যগণ আমার নিকট আর কি চাহেন? আমি ধর্ম্মতত্ত্বের কোন কথা তোমাদের নিকট গোপন করি নাই। সাধারণ গুরুগণের কৃপণতা দোষ তথাগতকে স্পর্শ করে নাই। তোমাদের শাস্তা 'নিজস্ব' বলিয়া কোন গূঢ় তথ্যই লুক্কায়িত রাখেন নাই। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি স্বয়ং ধর্ম্মনায়ক হইয়া সংঘকে বশীভূত রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি সংঘের জন্য নূতন কিছু নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করিতে পারেন। হে আনন্দ, তথাগত কিন্তু নিজে এরূপ কোনও ধারণা কখনও পোষণ করেন না, সুতরাং তিনি নূতন কোন তথ্য বা নিয়ম প্রচারে আর প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। তিনি সম্প্রতি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইয়াছেন, বৃদ্ধ হইয়াছেন, জরাজীর্ণ হইয়াছেন; তদীয় শরীর জীর্ণ শকটের ন্যায় যত্ন ও নানা বাহ্যিক সহায়তার বলে কোন প্রকারে এখনও চলিতেছে। কিন্তু শীঘ্রই ইহার গতিরোধ উপস্থিত হইবে। বহির্জগতের সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া আমি সম্প্রতি সংজ্ঞা ও বেদনার অতীত হইয়া শূন্যতা ধ্যানে পরম শান্তি ভোগ করিতেছি। তাই বলি—আনন্দ, তোমরা নিজেরাই নিজদের প্রদীপ হও, শরণ হও—অপরের আশ্রয় লইও না। সদ্ধর্ম্মই তোমাদের অন্ধকারে দীপ ও সংসারের ঝঞ্ঝায় আশ্রয় হউক। যিনিই এখন বা আমার নির্ব্বাণের পরে এই ভাবে জীবন চালাইতে পারিবেন, তিনিই মহদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন।" এই উপদেশ প্রদান করিয়া তথাগত দৃঢ় সংকল্প করিলেন, তিন মাসের মধ্যেই তিনি লীলা শেষ করিবেন। মার (বা কাম) তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল—"ধর্ম্ম শিখিয়াছ, তৎপ্রচার শেষ করিয়াছ আর কেন বাঁচিয়া রহিয়াছ? শিষ্য, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা সৃষ্টি করিয়াছ, তাঁহারাই সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। এখন তোমার মহাপরিনির্ব্বাণের সময় হওয়া উচিত।" তথাগত উত্তর করিলেন, "আর বিলম্ব নাই, এখন হইতে তিন মাস অতীত হইলেই পরিনির্ব্বাণ ঘটিবে।" আনন্দ বৃথাই বুদ্ধদেবকে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত

জীবন ধারণ করিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। বৈশালীর সংঘস্থ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের সার কথাগুলির প্রতি অবহিত হইতে উপদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—"সর্ব্ব সংস্কারই ব্যয়ধর্ম্মী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সমস্ত বস্তুই বিনাশ-শীল—ইহা বুঝিয়া তোমরা মুক্তির জন্য প্রয়াসী হও, তথাগত শীঘ্রই তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের আর বিলম্ব নাই।"

বৈশালী হইতে শিষ্য আনন্দের সহিত নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীবুদ্ধ কপিলবস্তুর অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পাবা নামক গ্রামে তথাগত আনন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ চুন্দ নামক কর্ম্মকার পুত্রের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তদীয় আম্রবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ তদীয় গৃহে পরদিন ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাই চুন্দের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য ও প্রভূত শূকরমার্দ্দব ( শুষ্ক শূকর মাংস ) প্রস্তুত করাইয়া অতিথিগণকে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ চুন্দালয়ে আসন পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে পরিবেশন দ্রব্য দেখিয়াই চুন্দকে বলিলেন—"তিনি যেন তাঁহাকে ছাড়া অন্য কোনও ভিক্ষুককে সেই শূকরমাংস আহারার্থ পরিবেশন না করেন এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যেন ভিক্ষুসংঘকে দেওয়া হয়।" তথাগত আরও বলিলেন, "তাঁহার আহারান্তে যেন অবশিষ্ট শূকর মাংস মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, কারণ তিনি ব্যতীত দেবলোকে বা মনুষ্যলোকে এমন অন্য কেহ নাই যিনি এই মাংস আহার করিয়া জীর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন।" চুন্দ ভগবানের আদেশ মতই কার্য্য করিলেন। ভগবান্ ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা চুন্দকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই শূকর মাংস ভক্ষণই তাঁহার দেহাবসানের কারণ হইল। তদ্‌ভোজনেই তথাগত ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। রক্তাতিসার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি

উদরে তীব্র বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সহনশীলতার প্রতিমূর্ত্তি তথাগত তাহা বিনা উদ্বেগে ও সংজ্ঞালোপ ব্যাতিরেকে সহ্য করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি আনন্দকে বলিলেন, "কুশী-নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে বিমুখ হইবেন না।"

প্রথমতঃ আম্রবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথাগত চুন্দক নামক একটি ভিক্ষুকে ডাকিয়া চারিভাঁজ করিয়া একখানি কাপড় পাতিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি সেই শয্যার উপর অসুস্থ অবস্থায় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। পরে ককুস্থ নদীতে শেষবারের মত স্নান করিয়া নদীর জল পান করিয়া তৎপরে তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চুন্দপ্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণই বুদ্ধদেবের পীড়ার কারণ হইয়া তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ ঘটাইয়াছে, পাছে লোকে চুন্দের এইরূপ কোনও অপবাদ রটনা করে, এই ভাবিয়া পরম কারুণিক বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিয়া রাখিলেন যে বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বক্ষণে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামবাসীর কন্যা সুজাতা নাম্নী রমণীর প্রদত্ত আহার্য্য বস্তু যেমন তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য যেমন সুজাতা বহুপুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, জীবনের শেষ সময়ে চুন্দপ্রদত্ত সেই শূকর মাংসও তাঁহার নিকট তদ্রূপ উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং এই পুণ্যকার্য্য জন্য চুন্দ দীর্ঘজীবন, সুখসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গলাভের অধিকারী হইবেন। তৎপরে কুশীনগরের উপবনে উপস্থিত হইয়া তথাগত সেই স্থানে দুইটি শালতরুর তলদেশে একটি শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। উত্তর দিকে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া থাকিয়া একপাদের উপর অন্য পাদ রাখিয়া তিনি সেই শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল। এমন সময় অকালে শালবৃক্ষে পুষ্পোদ্গম দেখা গেল—আকাশ হইতে শাক্যসিংহের উপর পুষ্পবর্ষণ এবং দেবদুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। দেবপ্রদর্শিত এই সম্মানকে তথাগত উপযুক্ত সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শিষ্যগণ মধ্যে যিনি তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মের আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহার মতে তিনিই তাঁহার প্রতি

উপযুক্ত পরিচর্য্যা ও সম্মান প্রদর্শনের অধিকারী হইবেন। শালবনে শয়ান বুদ্ধের এই শেষ দৃশ্য দর্শনের জন্য দেবগণ আকাশে সংঘবদ্ধ হইলেন। নানাপ্রকার ঘটনা ও উপদেশ দানাদির পর, গৌতমকে অন্তিমশয্যাশায়ী দেখিয়া তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য কোমলচিত্ত আনন্দ সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইয়া একটি দ্বারদেশে লীন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ—তাঁহার অতি প্রিয় শাস্তা তথাগত শীঘ্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ তিনি নিজে এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই ও অর্হৎ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। গৌতম আনন্দকে সম্মুখে ডাকাইয়া আনাইয়া সস্নেহে কয়েকটি প্রাণস্পর্শী কথা বলিলেন। অত্যন্ত অবিচলিত ও অপরিমিত প্রীতির সহিত কায়মনোবাক্যে আনন্দ তাঁহার অনুসরণ ও সেবা করিয়াছেন এই কথার উল্লেখ করিয়া তথাগত ভিক্ষুগণ সমীপে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, এমন সময়ে আনন্দ বুদ্ধদেবকে এই অকিঞ্চিৎকর কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়া তাঁহাকে রাজগৃহে বা বারাণসীর মত শ্রেষ্ঠ নগরে যাইয়া জীবনলীলা শেষ করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ কথাতে তথাগত বিরক্তির সহিত কুশীনগরের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার আগ্রতপ্রায় জীবনাবসানের সংবাদ জানাইতে বলিলেন। স্থানীয় মহত্তর ব্যক্তিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া শোকাচ্ছন্ন হইলেন। এই সময়ে সুভদ্র-নামক একটি ধার্ম্মিক লোক তথাগতকে দেখিতে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনিই তথাগতের শেষ শিষ্য।

মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত। সেদিন তথাগত নিজ শয্যাসমীপে আনন্দ প্রমুখ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া শেষ উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রথম কথা এই যে, ভিক্ষুগণ যেন তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর কখনও ভাবেন না যে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবচন সম্বন্ধে শাস্তা অতীত হইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, তদুপদিষ্ট ও তৎপ্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম ও বিনয়ই মরণান্তে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিবে। তৎপরে স্থবিরতর ভিক্ষুগণের প্রতি নবীন ভিক্ষুগণের কিরূপ

আচরণ হইবে, কোন্ দোষী ভিক্ষুর প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের বিধান করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দিয়া তিনি পুনর্ব্বার সংঘস্থিত ভিক্ষু-গণকে সমীপে আহ্বান করিয়া বারবার তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সিয়া খোপন ভিক্খবে এক ভিক্খুস্স পি কংখা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সংঘে বা মগ্গে বা পটিপদায় বা, পুচ্ছম ভিক্খবে, মা পচ্ছা বিপ্পটিসারিণো অহুবথঃ সম্মুখীভূতো নো স থা অহোসি, ন ময়ং সক্খিমু ভগবন্তং সম্মুখা পটিপুচ্ছিতুন্তি।"

অর্থাৎ, "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ হইতে পারে যে, তোমাদের মধ্যে একটি ভিক্ষুরও মনে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ, মার্গ বা প্রতিপদা সম্বন্ধে সংশয় বা ভ্রান্তি থাকিতে পারে,—সুতরাং পাছে তোমাদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হয় যে, শাস্তা আমাদের সম্মুখে ছিলেন, অথচ আমরা তাঁহার নিকট হইতে সংশয়চ্ছেদ করিয়া লই নাই; তাই এই সময় প্রশ্ন করিয়া সংশয় দূর করিয়া লও।"

সকলেই তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন তথাগত ভাবিলেন—গুরুর গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহারা সংশয় থাকা সত্ত্বেও হয় ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। তাই তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "কোন বন্ধু বা সহায়ক যেমন অন্য বন্ধু বা সহায়ককে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ তাঁহাকে সহায়ক জ্ঞানে প্রশ্ন করিয়া সংশয়ের অপনোদন করিয়া লইতে পারেন।" এই কথাতেও ভিক্ষুগণ নির্ব্বাক রহিলেন। এই ব্যাপারে আনন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্! বড়ই অদ্ভুত বোধ হইতেছে, তাই আমার বিশ্বাস—ভিক্ষুসংঘে কোন ভিক্ষুরই বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ বিষয়ে কোনরূপ বিচিকিৎসা বা সংশয় নাই।" বুদ্ধ বলিলেন, "এই বিষয়ে তোমার বিশ্বাস হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস নয়—ঠিক জ্ঞান হয় যে, এই পাঁচ শত সংখ্যক সংঘের অধস্তন ভিক্ষুও অন্ততঃ স্রোতাপন্ন মার্গে উপনীত হইয়াছেন ও তাঁহার আর বিনিপাতের আশঙ্কা নাই এবং তিনি অবশ্যই সম্বোধিপ্রাপ্তির অধিকারী হইতে সমর্থ।" তৎপরে তথাগতের শেষ বাণী শ্রুত হইল—

"বয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি" অর্থাৎ, "কি অন্তর্জগতে,

কি বহির্জগতে—যাহা কিছু ভূত বস্তু ( সংস্কার ) বর্ত্তমান আছে—তাহাই ব্যয় বা বিনাশশীল—সুতরাং অপ্রমত্তভাবে নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ কর।" ইহাই তথাগতের মুখবিনিঃসৃত শেষ উক্তি। বাসুদেব কৃষ্ণেরও সেই একই কথা—"অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ"—একই উপদেশ। এই শেষ উপদেশবাণী উচ্চারণ করিবার পরই তথাগত প্রথম—দ্বিতীয়—তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান সম্পাদন করিয়া, আকাশের অনন্ত আয়তন সম্বন্ধী ধ্যানে মগ্ন হইয়া তথা হইতে মনকে উর্দ্ধে তুলিয়া বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন বিষয়ক ধ্যান এবং তৎপরে আকিঞ্চন্য বিষয়ক—( অর্থাৎ যে অবস্থায় কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই তদ্বিষয়ক ) ধ্যান আচরণ করিলেন। তদনন্তর সেই ধ্যানের অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া "নৈব-সংজ্ঞান-অসংজ্ঞা"—রূপ আয়তনের ধ্যান আচরণ পূর্ব্বক "সংজ্ঞা ও বেদনার নিরোধের" অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এমন সময় আনন্দ অন্যতম ভিক্ষু অনুরুদ্ধকে বলিলেন—"ভগবানের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছে।" কিন্তু অনুরুদ্ধ আনন্দকে উত্তরে কহিলেন, "ভগবান্ অতি গভীর ও অত্যুচ্চ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এখনও তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ হয় নাই।" তৎপরে তিনি পশ্চাৎক্রমে ( বিপরীত দিক হইতে ) তত্তৎ ধ্যান আচরণ করিয়া পুনরায় চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় ও প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন। ইহার পর পুনরায় প্রথমাদি-ক্রমে ধ্যান আরম্ভ করিয়া চতুর্থ ধ্যান শেষ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণ সমাগত হইল। তৎসঙ্গেসঙ্গেই ভীষণ ও লোমহর্ষক ভূমিকম্প হইল—দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল। দেবগণ মধ্যে ব্রহ্মা বলিয়া উঠিলেন, "তথাগতের ন্যায় এমন প্রাজ্ঞ, সম্বুদ্ধ, শাস্তা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপুরুষও যখন পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন—'সব্বে ব নিক্খিপিস্সন্তি ভূতা লোকে সমুস্সয়ং'—এই পৃথিবীতে যে সর্ব্বভূতই একদিন নিজ নিজ 'সমুচ্ছ্রয়' অর্থাৎ ( আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক ব্যক্তিত্ব ) অবশ্যই ত্যাগ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই।" ইন্দ্র বলিলেন—

"অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদ-বয়-ধম্মিনো।
উপপজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখোতি॥"

অর্থাৎ, "জন্ম ও নাশ যাহাদের ধর্ম্ম এমন সব সংস্কারই অনিত্য—যে বস্তুরই উৎপত্তি আছে তাহারই আবার নাশ বা নিরোধ আছে। তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিই শান্তিদায়ক।" ধীর স্বভাব ভিক্ষু অনুরুদ্ধ ভগবানের তদ্রূপ পরিনির্ব্বাণ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতাদৃশ স্থিতচিত্ত (গীতার ভাষায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বা 'স্থিতধী') মুনি যে মহাপ্রয়াণকালে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট পর্য্যন্ত ভোগ করিলেন না, তাহার কারণ তিনি নির্ব্বাণ-শান্তি উদ্দেশ্য রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি নিরুদ্বেগচিত্তে মৃত্যুবেদনা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই—'পজ্জোতস্সেব নিব্বণং বিমোখো চেতসো অহুতি'—"চিত্তের বিমোক্ষ অতি প্রদীপ্ত প্রদীপের নির্ব্বাণের মত সম্পন্ন হইল।" আনন্দের নিকট তথাগতের মহাপরি-নির্ব্বাণ একটি ভয়ানক লোমহর্ষক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইল।

এই দুঃসংবাদ কুশীনগরের মল্লগণের নিকট পৌঁছিল। তাঁহারা শালবনে উপস্থিত হইয়া, ছয়দিন পর্য্যন্ত শোভা যাত্রা ও সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা শবের পূজা করিলেন। তৈলদ্রোণীতে শব রাখিয়া অগ্নিসংযোগের চেষ্টা হইল,—কিন্তু তথাগতের প্রিয়তম শিষ্য কাশ্যপের আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা জ্বলিয়া উঠিল না তৎপরে চিতাভস্ম লইয়া গোল-যোগ বাধিল। মল্লগণ তাহার সমস্তই রাখিতে চাহিলেন। এদিকে সপ্তদিক্ হইতে দাবীদারগণ উপস্থিত—মগধের অজাতশত্রু, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলীগণ, রামগ্রামের কোলীয়গণ, বেঠদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণ ও পাবার মল্লগণ—সকলেই তথাগতের "শরীর নিধান" না পাইলে কুশীনগরের মল্লগণের সহিত তদর্থ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। দ্রোণ নামক কোনও ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ নিবারিত হইল। তিনি ভক্তগণকে চিতাভস্ম ও শরীর-শেষ বণ্টন করিয়া দিয়া স্বয়ং সেই পেটিকাটি গ্রহণ করিলেন।

এই সমস্ত শরীর-নিদর্শনের উপর তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ উত্থাপিত করিয়া রাখিলেন। অদ্যাবধি ভারতের স্থানে স্থানে পূজার সামগ্রী এই স্তূপসমূহের ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ।

# কন্‌ভার্সান্

১

"না সার্, কখনো না।"

"নিশ্চয়"—

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কখনো না সার্—কখনো না।"

"চুপ কর্, তোরা তো সব জ্যান্তা দেখ্‌ছি। আমার এই যাট বছর বয়স হলো এরই মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত কত নেতা গজালো কত গ্যালো। ও সব অহিংসা ফহিংসা এ দেশে চলবে না, তোদের গান্ধীকে বল্‌গে নৈমিষারণ্যের বনে গিয়ে মুনিঋষিদের কাছে তাঁর অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করুন।"

কে একজন বলিয়া উঠিল, "মহাত্মা বলুন—সার্" সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "মহাত্মা গান্ধী বলুন সার্, মহাত্মা গান্ধী বলুন।"

সিটি হিন্দু স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বিপ্রদাস বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি বল্‌বো?"

"মহাত্মা গান্ধী বলুন.—মহাত্মা গান্ধী।"

"তোদের গুরু তোরা বল্‌গে—"

দলের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "মহাত্মা গান্ধী বিষ্ণুর অবতার, আপনাকে মহাত্মা বলতেই হবে।"

"বলবো—না।"

সকলে—"বল্‌তেই হবে আপনাকে।"

ছেলেদের উদ্ধত আচরণ বরদস্ত করিতে না পারিয়া বিপ্রদাস বাবু প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন। ছেলের দল হৈ হৈ করিতে করিতে ক্লাসের বাহির হইয়া গেল।

সিটি হিন্দু স্কুলের ছেলেরা 'বয়কট্' করিয়াছে। তাহাদের সহিত

সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কলিকাতার যাবতীয় ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বয়কটের আগুন কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়েরও চালে আসিয়া লাগিয়াছে। দেশের নারী-শক্তির এই প্রথম জাগরণ। হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ কয়েকদিন যাবৎ দীর্ঘ তিন চার 'কলাম' ভরিয়া সিভিল-ডিসওবিডিয়েন্সের বারুদ-ঠাসিতেছে। ভিণ্ডিকেটর প্রমুখ কয়েকটি বিজাতীয় দৈনিক পত্র ক্রমাগত সরকারের কানে শুনাইতেছে, "আমরা তো বহুদিন হইতে বলিতেছি হাইয়ার এডুকেসন্ এত সস্তা হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকারী বিচার না করিয়া সস্তায় আপামর সাধারণকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিলে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িবে। 'আন্ এমপ্লয়মেণ্ট' বশতঃ ভদ্রলোক ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, দেশ অনাচারে ভরিয়া যাইবে. প্রজাবর্গের জীবন ও ধন দৌলত বিপন্ন হইবে। অবিলম্বে সরকার ইহার প্রতিবিধান করুন "

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

সত্যাগ্রহকারিণী একদল ছাত্রী বাস্ ভাড়া করিয়া শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে। অল্পবয়স্কা বালিকারা ছুটোছুটি চেঁচামেচি করিতেছে, উহার মধ্যে বয়স্কারা কেহ গঙ্গার আব পারে জাহাজে মাল বোঝাই দেখিতেছে, কেহ লতাবিতানে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, কেহ কোন বান্ধবীর হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে।

একজন সরযূ, কথাপ্রসঙ্গে তাহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, শেলির খবর কি বল্‌তে পারিস্? আজকাল সে যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে, তাব দেখা পাওয়াই ভার।"

সঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "নূতন খবর দিতে পারি।"

"কি—লভ্?"

"না।"

"উপেক্ষা?"

"তাও না।"

"তবে কি—বিরহ ?"

"বে না হতেই বিরহ ।"

"বল্ না খুলে, কি হয়েছ ?"

"যা ভেবেছিস্ ঐ রকমই একটা কিছু। শেলির দাদা বে'র ঠিক করেছেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে, কিন্তু শেলি বেঁকে বসেছে, বলেছে—বে করবে না।"

"বলিস্ কী বে ? বে করবে না শেলি ? দাদা করলেন ক্রীশ্চান বে, দিদি করলেন গুজরাতী শেলিব বে করা উচিত কিন্তু ভাই, একটা পার্শীটার্শী।"

পিছন দিক হইতে একটি সতের আঠার বছরেব মেয়ে সরযুর চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাজী আছি, তুই যদি করিস্ সিলোনী বে।"

দুইটি তরুণী আনন্দে লাফাইয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তুই—তুই কখন এলি শেলি ?"

"দাদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি—খুব দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে যা হোক।"

তরুণী দুইটি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—অদূরে ঘাসের উপর বসিয়া একটি যুবক চুরুট ফুঁকিতেছেন।

সরযূ শেলির হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ভাই আমাদের বাড়ী একদিন যাবি ? অনেক কথা আছে।"

"কথা তো ভারি, আমার ওসব ভাল লাগে না।"

"না না বে'র কথা নয়—অন্য কথা।"

"কি কথা ?"

"আজই যদি বলবো—তবে আর তোকে যেতে বল্‌ছি কেন ?"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

"দেখা যাবে নয়—কথা দিয়ে যা।"

"আচ্ছা যাবো,—কিন্তু তোদের খদ্দর বিক্রীর কি হলো—শুনি ?"

"আমি ভাই পঞ্চান্নো টাকার বিক্রী করেছি।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

দ্বিতীয় তরুণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি ষাট টাকার।"

"আরও বহুৎ আচ্ছা—আজ তবে ভাই আসি, দাদা অপেক্ষা করছেন"—এই বলিয়া শেলি হাসিমুখে গাড়িতে গিয়া বসিল।

শেলি চলিয়া গেলে সরযূ বলিল, "ব্যাপার কি বল দেখি? কি রকম রোগা হয়ে গেছে দেখেছিস্।"

"দেখ্‌লুম তো।"

"কেন বল দেখি?"

"কি জানি।"

"ওর ভেতরে কি একটা অশান্তি আছে নিশ্চয়।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"পেট থেকে ওর কথাগুলো বের করে নিতে হবে। ও যদি বে করতে না চায় কেন বাপু জোর করে বে দেওয়া?"

"ওর দাদার বন্ধু মোহিত ব্যারিষ্টার ধরে বসেছেন—শেলিকে বে করবেন।"

"কেন, শেলি ছাড়া কি আর মেয়ে নেই?"

"আছে, কিন্তু তিনি শেলিকেই পছন্দ করেন।"

"তিনি শেলিকে পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু শেলি তো তাঁকে পছন্দ করে না।"

"হতে পারে, কিন্তু পছন্দ তো create করা যায়।"

"পছন্দ create করা যায় না, আর যদিই বা যায়—নূতন করে তা কর্‌বারই বা দরকার কি? তার পছন্দ তো অন্য জিনিষেও থাকতে পারে।"

"যথা—"

"যথা—সংগীত, চিত্রশিল্প, বিদ্যাচর্চ্চা, আদর্শজীবন।"

"কিন্তু, মোহিত বাবু শেলির ওপর হতে ভালবাসা তো আর ফিরিয়ে নিতে পারেন না।"

"ভালবাসার কথা আর বলিস্‌নে, ভালবাসার নাম শুনলে গা জ্বলে

যায়। বল্ খেয়াল—whims, ভালবাসা বলিস্ কেন? পান থেকে চুণ খসলে যে ভালবাসা উবে যায় তার নাম আবার ভালবাসা? মোহিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করগে, শেলিকে ভালবাসবার আগে আরও কত শেলিকে তিনি ভালবেসেছেন, এবং এখনও কজনকে তিনি ভালবাসেন। মানুষের treacheryর অন্ত নেই।"

"তুই ভাই, দিন দিন বড pessimist হয়ে পড়ছিস্।"

সরযূ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সাধে হচ্ছি কি? দেখে—দেখে।"

সঙ্গিনী পরিহাস করিয়া উত্তর দিল, "দেখে দেখে—না ঠকে ঠকে।'

ঠিক এমনি সময় কয়েকটি অল্পবয়স্ক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া কি একটা অদ্ভুত রকমের গাছ দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেল।

২

শেলির ভাল নাম শেফালি। সকলে আদর করিয়া তাহাকে শেলি বলিয়া ডাকে। তাহার বড়দা কিরণ বাবু জার্ম্মেণি হইতে 'ট্যানিং' শিখিয়া আসিয়া ব্যাবসা করিতেছেন, অনেক বিলাত ফেরত তাঁহার বন্ধু। বাবা, মা না থাকায় তিনিই শেলির অভিভাবক। মোহিত বাবু শেলিকে বিবাহ করিতে চান কিন্তু, মোহিতকে সে আমোলই দেয় না। একদিন সন্ধ্যার সময় হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার পথে মোহিত বাবু শেলিদের বাড়ী আসিলেন। শেলির দাদা ও বৌদি তাঁদের কোন বন্ধুর বের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হটাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। শরীর একটু অসুস্থ থাকায় শেলি তাঁহাদের সহিত যাইতে পাবে নাই। মোহিত বাবু পর্দ্দা ঠেলিয়া যখন হল-ঘরে ঢুকিলেন তখন শেলি কৌচে শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল। মোহিত বাবুকে দেখিয়া শেলি অভ্যর্থনা করিল। কৌচের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া মোহিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানা কি বই, মিস্ মুখার্জ্জি?"

শেলি সহজ গলায় বলিল, "শরৎ চাটুযোর 'দেবদাস'—একবার উল্টে পাল্টে দেখ্ছি।"

"অমন করে ভাসা ভাসা দেখার কাজ নয়—বইখানা ভাল করে পড়ুন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বইখানার দাম অমূল্য।

"তাই নাকি ?"

"নিশ্চয়, দেখ্‌বেন একজনের অযাচিত প্রেম উপেক্ষা করে লোকটার কি রকম সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

"কার প্রেম ?"

"কেন—পার্ব্বতীর। দেবদাস যেদিন থেকে পার্ব্বতীকে অগ্রাহ্য করেছে সেইদিন থেকে তার সর্ব্বনাশের আরম্ভ। ঐ একদিনের একটা ভুলের জন্য তার সমস্ত জীবনটা ruined হয়ে গেল।"

"কেন—দেবদাস কি পার্ব্বতীকে ভালবাসে নাই ?"

"বেসেছিল—but, it was too late. তখন পার্ব্বতীর বে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মানুষ নিজের মনকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে ? সেই ভালবাসা শেষে এমন অপাত্রে গিয়ে পড়লো যার জন্যে দেবদাসকে সারা জীবন অসহ্য কষ্ট পেয়ে মরতে হোল।"

শেলি আর কিছু বলিল না। ঠিক জায়গায় গিয়া আঘাত লাগিয়াছে বুঝিয়া মোহিত বাবু হৃদয়ে অসীম স্বস্তি অনুভব করিলেন। তাঁহাদের কথা শেষ হইতে না হইতে শেলির বৌদি ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো মিষ্টার দে, আপনি কতক্ষণ ? আমায় ক্ষমা করবেন, আপনাদের আনন্দে ব্যাঘাত দিলুম।"

মোহিত দে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বিলক্ষণ, আপনি এসে আমাদের আনন্দ পূর্ণ করলেন। মিঃ মুখার্জ্জিকে দেখছি নে যে ?"

"আসছেন তিনি"—এই বলিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি শেলির কাছে আসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ এখন ?"

"খুব ভাল নয়।"

"তবে আর বেশী রাত্তির জেগে কাজ নেই—অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে পড় গে।"

শেলি চলিয়া গেলে মিসেস্ মুখার্জ্জি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আশা হলো মোহিত বাবু।"

"কিসের ?"

"শেলির।"

"আর আপনাদের জন্যে কিছু হবার যো আছে, বৌদি ?"

"বারে মজা আপনি পারছেন না নাগাল, দিচ্ছেন আমাদের দোষ। নিজের defect স্বীকার করুন। আপনারা—পুরুষরা ভয়ানক অধৈর্য্য। একেবারেই ফল পেতে চান, কিন্তু ফল পাবার আগে গাছের যে যত্নটুকু দরকার তা করতে মোটেই আপনারা রাজী নন।"

মোহিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টার কিছু ত্রুটি দেখছেন বৌদি, দুবেলা যাওয়া আসা করে মোটারের টায়ার তো ক্ষয়ে যাবার দাখিল।"

"মোটারের টায়ারই ক্ষইয়েছেন আর কিছুই করতে পারেন নি।"

"আর কি করতে হবে বলুন ?"

"Association creates love. ভাল করে মেলা মেশা করুন তবে তো হবে, কেবল দুবেলা সেলাম ঠুকে গেলেই কি আর মন পাওয়া যায় ?"—তারপর মিসেস্ মুখার্জ্জি হাসিয়া বলিলেন, "মোহিত বাবু, বিলাত ফেরতকে love এর এই preliminary শিক্ষা যে দিতে হবে তা আমার মোটেই জানা ছিল না।"

মোহিতবাবু ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিলেন, "বৌদি আপনার কাছে training আমার এখনও বহু দিন নিতে হবে।"

তারপর শেলির দাদা আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন। খানিকক্ষণ গল্পসল্পের পর কিরণ বাবু নিজের গাড়ীতে করিয়া মোহিতকে বাড়ী রাখিয়া আসিলেন।

তিন চারদিন পরে ছিল ইষ্টারের ছুটি। মিসেস্ মুখার্জ্জি আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মোহিত বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বেলা এগারটার সময় মোহিত বাবু গিয়া দেখিলেন সবই প্রস্তুত, কিরণ প্রভৃতি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। আসিতেই কিরণ বাবু বলিলেন, "কি হে ভায়া, ভুলে গিয়েছিলে নাকি ?"

"না ভাই ভুলিনি একটা বিশেষ কাজে আট্‌কে পড়েছিলুম।"

"তবু ভাল, আমি মনে করেছিলুম একেবারে ভুলে মেরেছ। শেলি, নে শীগ্‌গির খেতে দে আর দেরী সইছে না।"

শেলি পরিবেশন করিতেছিল। একখানা চপ্ পাতে দিতেই

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "মোহিত বাবু চপ্‌টা আপনার জন্যে শেলি বিশেষ করে তৈরী করেছে। আপনি ওকে ধন্যবাদ দিন।"

লজ্জায় শেলির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মোহিত বাবু বলিলেন, "খাবার আগেই ধন্যবাদ, আচ্ছা তাই দিচ্ছি।"

হাল্কা কথাবার্ত্তায় ভোজনপর্ব্ব শেষ হইলে কিরণ বাবু বলিলেন, "শেলি, তুই মোহিতের কাছে গিয়ে একটু বস বেচারী একলা থাক্‌বে।"

শেলিকে সেদিন ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। একখানা কচি কলাপাতা রংয়ের সাড়ী পরায় তাহাকে খুবই মানাইতেছিল। চূর্ণ কুন্তল মুখের আসে পাশে পড়িয়া তাহার স্বাভাবিক যৌবনশ্রীকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছিল।

দাদা চলিয়া গেলে শেলি অনেকক্ষণ বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহার মনে একটা সংশয় জাগিয়াছিল, কোন্ পথে সে যাইবে? এক পথে মোহিত বাবু, টাকা পয়সা, পুত্র কন্যা; অন্য পথ অনিশ্চিত—সে পথে হয় তো স্বর্গ, নয় তো নরক। একটা পথ সোজা যতদূর দৃষ্টি যায় পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, অন্য পথের খানিকটা বেশ খোলা তারপরই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সোজা রাস্তায় চলিবে, অথবা অজানা অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করিবে শেলি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

শেলির বৌদি এতক্ষণ মোহিতের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আমি একটু ঘুমইগে, শেলি তুমি মোহিত বাবুর কাছে গিয়ে একটু বসবে?"

শেলি রেলিং ছাড়িয়া স্পন্দিত হৃদয়ে, বিজড়িত পদে হল-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মোহিত বাবু একখানা ইজি চেয়ারে শুইয়া আছেন। শেলি ভিতরে ঢুকিতেই তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আসুন মিস্ মুখার্জ্জি, আজ আপনার ভারি কষ্ট হয়েছে—না?"

"কৈ—কষ্ট কিসের?"

"বিলক্ষণ, কত যত্নের সহিত পরিবেশন করে খাওয়ালেন আমাদের।"

"ও—তাতে আর কষ্ট কি?"

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মোহিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সেই বইখানা কি শেষ করেছেন ?"

"কোন্ বই খানা ?"

"দেবদাস।"

"হুঁ, সেখানা আমি সেদিনেই পড়ে ফেলেছি।"

"দেবদাসের চরিত্র কি রকম paint করেছে ?"

"Most pathetic!"

তারপর মোহিত বাবু সমস্ত দুপুর শেলির কাছে নানা কথায় প্রেম নিবেদন করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, রুমালে চোখ মুছিয়া বেলা তিন চারটার সময় চলিয়া গেলেন।

মোহিত বাবু চলিয়া যাইবার পর শেলি চা খাইয়া সাজগোজ করিয়া সরযুদের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

* * * * * *

* * * * * *

সরযু শেলির সহপাঠিনী হইলেও তাহার চাইতে সে বয়সে দুই এক বছরের বড়। উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ হয় সরযুর তদনুপাতে কিছু অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল বলিতে হইবে। বিবাহ হইলেও সে স্কুল ছাড়ে নাই এবং তাহার পূর্ব্ব স্বভাবেরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, ক্লাসের ছাত্রীগণের মনেই হইত না যে, সে বিবাহিতা। তাহার স্বামী পরিমল সেন লাহোরে কোন কলেজের প্রফেসর। শ্বশুর বাড়ীর সহিত সরযুর কোন সম্বন্ধই নাই, স্বামীর সহিত যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাহাও নানা কারণে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। শেলি যখন সরযুদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল তখন সরযু তাহার ছোট বোনকে গান শিখাইতেছিল। শেলিকে দেখিয়া সে আনন্দে উঠিয়া গিয়া বলিল, "খুব যা হোক, এতদিন পরে বুঝি কথা রাখতে এলি ?

শেলি উত্তর দিল, "আমি না হয় আস্‌তে পারি নাই, কিন্তু তুই-ই কোন্ গিয়েছিস্ আমাদের বাড়ী ?"

"বাবা—যা তোমার বৌদিটি আছেন ভাই, আমায় বেজায় ঠাট্টা করেন তিনি, আমি অত সইতে পারি না।"

"যারা ঠাট্টা করে বেশী তারা ঠাট্টা মোটেই সইতে পারে না—এতো জানা কথা।"

"অতই যদি জানবো তবে আর এ দুর্ভোগ কেন?"

"কি দুর্ভোগ"—বলিয়াই শেলি লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, সরযুর বিবাহিত জীবন শান্তি পূর্ণ নহে।

চাপা কথাটা যে এমনি করিয়া বেফাঁস তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে সরযুও তাহা আশা করে নাই, সুতরাং সে উহা চাপা দিবার জন্য বলিল, "রেথা এসেছিল এই মাত্র।"

"কখন?"

"এই মিনিট কুড়ি আগে সে বাড়ী গেল"—তারপর একটু চুপ করিয়া সরযু বলিল, "তাদের বাড়ীতে বড় বিপদ, ভাই।"

শেলি উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

সরযু একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া বলিল,—"বলিস্‌নি কারুকে, তাঁর দাদা একটা বড় কুৎসিৎ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, দেখিস্‌ ভাই কারুকে বলিস্‌ নি যেন"—

"না তা বলবো না—কিন্তু ব্যাপার কি? রমেশবাবু তো—তিনি বার্লিনে ছিলেন না?"

"হুঁ, সেখানেই তিনি কোর্টে অভিযুক্ত।"

"কেন—রাজদ্রোহী বলে?"

"তা হলে তো আনন্দে নাচতুম, কিন্তু এতে আর মুখ দেখাবার যো নেই।"

শেলি উৎকণ্ঠিত ও অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "আরে মলো—বল্‌ না শীগ্‌গির, কেবল ভণিতাই করছেন।"

"বলতে ভাই মুখ বুঁজে আসছে"—তারপর একটু থামিয়া সরযু বলিল, "রমেশ বাবু বার্লিন যাবার আগে এখান থেকে তো বে করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে অবিবাহিত সেজে আর একজনকে

বে করেছেন; একটি ছেলেও হয়েছে—শুনছি। কিন্তু তারপর জোচ্চুরিটা কোন রকমে ধরা পড়ে যায়, রমেশ বাবুর নূতন স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোর্টে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন।"

সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে শেলি এতটা ভীত হইত না যতটা ভীত হইয়া পড়িল সে এই সংবাদ শুনিয়া।

অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া সে বসিয়া রহিল। সরযূও তাহার পাশে একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। একটা দমকা বাতাস আসিয়া তাহার বিছানার চাদরটা উল্টাইয়া দিয়া গেল। শেলি লক্ষ্য করিল, চাদরের নীচের তোষকটা অত্যন্ত ময়লা। রমেশ বাবুর কাহিনী ঘরের মধ্যে যে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নষ্ট করিবার জন্য শেলি বলিল, "তোর বিছনাটা ভাই বড্ড অপরিষ্কার, এদিকে তো খুব stylish আর বিছনাটা সাফ্ রাখতে পারিস্ না?"

"কেন, ওটা তো চাদর ঢাকা, রয়েছে।"

"ওপরে সাদা চাদর ঢাকা কিন্তু ভিতরটা তো ময়লা?"

"ব্যস্, ঐটুকুই আমরা চাই। ওপরটা সাফ্ থাকলেই হোল ভিতরে যাই থাক্ না কেন, কি বল্ শেলি? ঐ শিক্ষাই তো ছোট বেলা থেকে আমরা পেয়ে এসেছি।"

শেলি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু বাতাস সময়ে সময়ে চাদর উড়িয়ে দেয়—"

শেলির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সরযূ উত্তর দিল, "যেমন রমেশ বাবুর দিলে, তা দিক, যখন দেবে—তখন দেবে, কিন্তু যতক্ষণ ঢাকা থাকে ততক্ষণই লাভ কি বল্ ভাই? সত্যি কি না?"

শেলি কোন উত্তর করিল না। অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্, বাজে কথা।"

"বাজে কথা তো এতক্ষণ শুনলি, এখন একটা গান শোন্।

"আপত্তি নেই।"

সরযূ হারমোনিয়ামে সুর দিয়া গাহিল—

"চন্দ্র কিরণ মাথে
রবি ভ্রমে ভাই ভুল না, ভুল না
নিশীথে চল না বিপথে।
ঐ যে দেখিছ মৃত শশাঙ্ক
ঐ যে দেখিছ তারা,
ওরাই তোমারে ফেলিয়া আঁধারে
করিবে হে দিশেহারা,
কোন পথে যাবে কেহ না বলিবে
কেহ না লইবে সাথে।
যা ছিল তোমার, যা আছে তোমার
তাই লয়ে সুখী হও হে,
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ
কেন পার ধরে দাও হে,
রবি তো জাগিবে যেমন জাগে হে
প্রতি অরুণিম প্রাতে,
দিবসের চলা দিবসে সের হে
কি হেতু চলিছ রাতে।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া সন্ধ্যার পর শেলি বাড়ী চলিয়া গেল। আসিয়াছিল যে মন লইয়া কিন্তু, সে মন লইয়া সে ফিরিল না। রমেশের কাহিনী তাহার মনের সবল বিশ্বাসটুকু ছিঁড়িয়া দিয়াছিল—প্রতারণা যে ভালবাসার মুখোস পরিয়া এরূপ নির্ভয়ে বিচরণ করে পূর্ব্বে শেলির তাহা জানা ছিল না। বাড়ী গিয়ে সে শুইয়া পড়িল। কতকগুলো বিরুদ্ধ ভাবের চিন্তা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল—

মোহিত বাবুর ব্যবহারও তবে কি কৃত্রিম, উহার ভিতরে কি প্রাণ নাই? না, তিনি তো তাহার সামনেই সেদিন কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেলি নিজের মনে নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। কি জানি বাপু—মানুষের মনের ভিতর কে ঢুকবে বল? আর যদি মোহিত বাবুর মতে সে মতই দেয় তবে তো তাহার আবাল্যের আদর্শ-কল্পনার কোন

সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু—, কিন্তু প্রতারণা যেমন সত্য মানুষের মনের দুর্ব্বলতাগুলোও তো তেমনি সত্য। সেগুলোকে চিরদিন সে ঠেকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? যদি না পারে—শেলি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। এমন অশান্তি সে পূর্ব্বে আর কখনও পায় নাই। সে এতদিন ভাবিয়াছিল জীবনটা অতি সোজা জিনিষ—যেমন ইচ্ছা তাহাকে লইয়া সেইরূপেই খেলিবে, কিন্তু জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যে নমুনা সে পাইল তাহাই অসহ্য তাহার কাছে। চিরদিন সে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারিবে কি? কেন পারিবে না? গানের ঐ দুটো চরণ তাহার মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল—

যা ছিল তোমার যা আছে তোমার
তাই লয়ে সুখী হও হে,
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ
কেন পরে ভর দাও হে।

জীবনে সুখী হইবার জন্য মোহিত বাবুকে—কি-না এক ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন করিতে হইবে? কী দীনতা!—এইরূপ নানা চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে অবসন্ন হইয়া শেলি ঘুমাইয়া পড়িল। যখন জাগিল তখন দেখিল—জানালার ফাঁক দিয়া সূর্য্যের আলোক ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেওয়ালের উপর ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

*    *    *    *
*    *    *    *

সে দিন শেলি চলিয়া আসিবার পর হারমোনিয়ামটা সামনে ঠেলিয়া রাখিয়া সরযূ সেইখানেই আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার চাইতে দুই তিন বছরের বড় কাকিমা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছিল রে—সরযূ?"

"শেলি।"

"শেলি—আমায় ডাকলিনে কেন? তার বে'র যে প্রায় সব ঠিকঠাক—শুনেছিস্?

সরযূ যেন কিছুই না জানিয়া কৌতূহলী হইয়া বলিল, "সত্যি,

কার সঙ্গে ?"

"মোহিত বাবুর সঙ্গে—কেন, শেলি তোকে বলেনি ?"

সরযূ ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "কিন্তু শেলি তো বলেছিল—বে করবে না।"

"হুঁ, করবে না আবার ?"

সরযূ কাকিমার কথায় কোন জবাব দিল না। তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া কাকিমা বলিলেন, "কেন, তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি—শেলি ?"

"না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলতুম—বে করিস নে।"

সরযূর কথা শুনিয়া কাকিমা হাসিয়া বলিলেন, "আহা! কি হিতৈষী আমার ? নিজে তো বেশ কাজ গুছিয়ে বসে আছেন। তবে বন্ধুর বেলায়—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়া সরযূ বলিল, "বন্ধু বলেই তো বলছি কাকিমা, শত্রু হলে কি বলতুম ?"

"কেন, বল্‌তো—শুনি ?"

"বে করে কি হবে ?"

"কেন—সুখী হবে।"

"যেমন আমি হয়েছি, তুমি হয়েছ, বেথার বৌদি হয়েছে—সেই রকম সুখী তো ?" তারপর একটু চুপ করিয়া আবার বলিল, "একটা মেয়ে যদিও বা দাঁড়াচ্ছিল, সকলে মিলে তাকে না নামিয়ে ছাড়বে না।"

কাকিমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বে না করে আর থাকতে হয় না।"

সরযূ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমাদের ঐ এক কথা। কেন পারবে না বল তো, এত লোক পারছে—আর শেলি পারবে না ?"

"পুরুষ মানুষের কথা আলাদা, সরযূ।'

সরযূ একটু রাগিয়া ও দুঃখ করিয়া বলিল, "তুমিও এই কথা বলবে—কাকিমা ? পুরুষ মানুষের রক্ত মাংস আর মেয়ে মানুষের রক্ত মাংস কি আলাদা, তারা পারলে মেয়েরাই বা পারবে না কেন—শুনি ?"

"রাগের মাথায় যা তা বলিস্ নে সরযূ, কথনো ভেবে দেখেছিস্ ? এখন না হয় বয়স অল্প শেলির, কিন্তু এমন তো আর চিরদিন থাকবে না—তখন কি হবে বল্ দেখি ?"

"কি আবার হবে ?"

"কি আবার হবে ! যদি মন কখনো চঞ্চল হয়, তখন—?"

"হলেই বা—মনকে ধরে রাখবে।"

"যদি না পারে—?"

সরযূ একটু ভাবিয়া বলিল, "তাতেই বা হয়েছে কি ? যুদ্ধ করতে গেলে হার জিত দুই-ই তো আছে। একবার পরাজয়ের ভয়ে কি চির জীবনের পরাজয় স্বীকার করতে হবে ? এ কি রকম তোমাদের বিধান, কাকিমা।"

সরযূর কথায় একটু আশ্চর্য্য হইয়া কাকিমা মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন, "বাঃ—এই রকম শুরু হলেই হয়েছে আর কি ?"

সরযূ সহজ গলায় উত্তর করিল, "কেন, আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি ? 'যদি মন চঞ্চল হয় তবে কি হবে ?'—এরকম ভাবলে আর যিশু-বুদ্ধের জন্ম হোত না। 'যদি লড়ায়ে হেরে যাই তবে কি হবে ?'—এরকম মনে করলে নেপোলিয়ান বা শিবাজীর মত লোককে আর জগতের লোক দেখতে পেত না। দুর্ব্বলতার সঙ্গে compromise আপোস করে চলা-ই সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা বলে আমার মনে হয়, কাকিমা।"

কাকিমা বলিলেন, "কিন্তু, সমাজ তো তা স্বীকার করবে না।"

"তা ঠিক, সমাজের সাধারণ নিয়ম কোন কোন ব্যক্তিগত জীবনকে ধ্বংস করে দেয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে সমাজ একটা মস্ত বড় বাধা—তা স্বীকার করি, কিন্তু শেলির মত দুচারজন মেয়ে যদি নূতন জীবন দেখাতে পারে তবে সমাজকে তার শাসন-সংস্কার একদিন-না-একদিন করতেই হবে। জগতে যত উচ্চ ভাব স্থান পেয়েছে, কয়েকজন অবজ্ঞাত উপদ্রুত, বেপরোয়া লোক রক্ত দিয়ে তার রাস্তা সাফ্ করে গেছে, কাকিমা।"

কাকিমা একটু চুপ করিয়া বলিলেন, "এরকম জীবনে নূতনত্ব থাক্‌তে পারে কিন্তু বিবাহ যে, নারী-জীবনের সার্থকতা এটা তো তোকে মান্‌তে হবে।"

সরযূ উৎসাহের সহিত বলিল, "ঠিক বলেছ কাকিমা, সারা জীবন অন্যের ভোগের উপকরণ হয়ে থাকাতেই তো নারী-জীবনের পরম সার্থকতা! আমারই মত একজন লোককে খুসী রাখবার জন্যে অতি হীন ভাবে নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াতেই তো আমাদের জীবনের সার্থকতা! পাছে সে চটে যায় এই ভয়ে নিজের আদর্শকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত দেখেও আজীবন অতি যন্ত্রণার সহিত তার মতে মত দিয়ে গেলেই তো নারী-জীবন সার্থক হয়ে উঠে।" নিজেকে রোধ করিতে না পারিয়া সরযূ বলিয়া চলিল, "আমরা art শিখি, সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করি কেবল competition এ দাঁড়াবার জন্যে, আমরা show caseএ dolls এর মত ঘরে ঘরে সাজান থাকি—পুরুষ মানুষ এসে আমাদের বেছে নিয়ে যায় আমাদের জীবন সার্থক করবার জন্যে, যাঁর রূপ নেই, competitionএ যে দাঁড়াতে পারে না তার নারী-জীবন বৃথা হয়ে যায় কেন-না পুরুষের ভোগ-যজ্ঞে আহুতি দেবার সুযোগ এ জীবনে তার হয়ে উঠলো না। অপরের মন রাখবার জন্যে নিজের দেহ, মন, আদর্শ অত্যন্ত লজ্জাকর ভাবে নিপীড়িত করা কি কম ত্যাগ, কম সৌভাগ্য? আসল কথা কি জানেন কাকিমা, টলষ্টয়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—marriages in our days are arranged like traps"

সরযূর কথায় কতখানি দুঃখ, কতখানি শ্লেষ, কত খানি ঘৃণা মিশান আছে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কাকিমা চুপ করিয়া রহিলেন।

৩

তাহার পরের দিনও শেলি সরযূর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। আগের দিন সরযূর সহিত তাহার সম্বন্ধে কাকিমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল উপহাসচ্ছলে তিনি সমস্তই তাহাকে বলিয়াছিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সরযূর প্রত্যেক কথায় যে পরম সত্য

নিহিত, তাহা শেলির মনে তুমুল আন্দোলন আনিয়াছিল। নিজের উপর যে অবিশ্বাস জাগিয়াছিল, শেলি অনুভব করিল—তাহা যেন মুহূর্ত্তে উপিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তাহার পর হইতে শেলি মোহিত বাবুর কাছে বড় একটা ঘেঁষিত না। ইহা মোহিত বাবু এবং শেলির দাদা ও বৌদি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমোল না পাইলেও মোহিত বাবু শেলিদের বাড়ী যাওয়া-আসা একেবারে ছাড়েন নাই। তাঁহার আসা মন্দীভূত হইলেও আরও দুএকটি নূতন লোক শেলিদের বাড়ীতে দেখা দিয়াছেন। একজন—শেলির বৌদির নিকট-আত্মীয় ভাই, এবং অন্যজন—ডাঃ মিত্র। শেলির মানসিক ভাবান্তরের সহিত ইঁহাদের হঠাৎ আবির্ভাবের কোন সম্বন্ধ আছে কি-না শেলি তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। তাঁহারা মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ী প্রায়ই আসিতেন এবং শেলির সহিত গল্পসল্প করিয়া চলিয়া যাইতেন। শেলি প্রথম প্রথম তাঁহাদের সহিত ভদ্রতার খাতিরে মিশিত, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ভদ্রতা বন্ধুত্বে পরিণত হইল। মোহিত বাবুর উপর এতদিন সে যে সহজ-ভদ্রতা বিরুদ্ধ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে তাহার জন্যও শেলি বিশেষ দুঃখিত।

একদিন শেলির দাদা তাহাকে বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গেলেন, মোহিত বাবুও সেদিন তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। মিসেস্ মুখার্জ্জি কয়েকদিন পূর্ব্বে বালিগঞ্জে তাঁহার ভায়ের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং তখনও ফিরিয়া আসেন নাই বলিয়া সেদিন তাঁহাদের সহিত বায়স্কোপে উপস্থিত ছিলেন না। অল্প কিছু দেখিয়াই কোন বিশেষ কাজের জন্য শেলির দাদাকে চলিয়া আসিতে হইল এবং তিনি মোহিতকে বলিয়া আসিলেন যেন সে ফিরিবার পথে শেলিকে বাড়ী রাখিয়া যায়। দাদা চলিয়া যাইবার পর বায়স্কোপের পর্দ্দায় যে ছবিগুলি ভাসিয়া উঠিতেছিল সেরূপ দৃশ্য শেলি পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। মানুষের ভোগ-লীলা যতদূর খোলাখুলি ভাবে দেখাইতে পারা যায় তাহাই দেখান হইতে-ছিল, আবার ঐ সমস্ত সে দেখিতেছিল তাহার জনৈক পুরুষ-বন্ধুর

পাশে বসিয়া। শেলির খুবই লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু লজ্জার সহিত সে যে নয়ন-মনের একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাইতেছিল, তাহাই তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

বায়স্কোপ দেখিয়া মোহিত বাবুর গাড়ীতে সে বাড়ী আসিল, আসিতেই দ্বারবান নোবী সিং সেলাম করিয়া মোহিত বাবুর হাতে একখানা চিঠি দিল, চিঠিখানা মুখার্জ্জি সাহেবের। তিনি লিখিয়াছেন—কোন জরুরী কাজের জন্য তাহাকে বালিগঞ্জ যাইতে হইল এবং খুব সম্ভবতঃ রাত্রে তিনি আসিতে পারিবেন না, মোহিত বাবুকে আজ রাত্রির মত তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। চিঠিখানা পড়িয়া মোহিত বাবু উহা শেলির হাতে দিয়া বলিলেন, "মিস মুখার্জ্জি, এই নিন্ আপনার দাদার চিঠি।"

শেলি চিঠিখানা পড়িল, পড়িতেই তাহার বুকের ভিতর কে যেন কয়েকটা ঘা মারিয়া দিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু পরে সে মোহিত বাবুর সহিত একত্রে আহার করিল। আহার শেষ হইলে হল-ঘরে মোহিত বাবুর জন্য শয্যা রচনা করিয়া শেলি নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া এক প্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব মানসিক উত্তেজনায় বিছনার উপর সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। একটা বিজন পুরীতে—রাত্রির আবরণে—একজন সম্পর্কহীন পুরুষের সহিত বাস করা তাহার জীবনে এই প্রথম।

বায়স্কোপের ছবিগুলো শেলির মনের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল, দুর্ব্বলতার সহস্র প্ররোচনা তাহার ভিতর আসা-যাওয়া করিতেছিল, প্রলোভনের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণপণে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া সে কাঁপিতেছিল। আলোক-চিত্র তাহার মনের ভিতর কামনার যে আগুন ধরাইয়াছিল তাহাতে দগ্ধ হইয়া, অভিভাবকহীন অবস্থায়, প্রেমাকাঙ্ক্ষীর পাশের ঘরে শুইয়া শেলি যে মানসিক দুর্ভোগ ভোগ করিতেছিল—তাহা বর্ণনাতীত।

সে যখন জাগিল তখন প্রভাতের আলোকের সহিত তাহার গত নিশার সমস্ত উত্তেজনা চলিয়া গিয়াছে। শয্যা ত্যাগ করিয়া,

বারান্দায় আসিয়া নীচের বাগানের দিকে চাহিয়া শেলি আনমনে দাঁড়াইয়া রহিল। গত রাত্রির কথা মনে আসিয়া তাহাকে লজ্জা, কুণ্ঠা ও ধিক্কারে ভরিয়া তুলিতেছিল। মোহিত বাবুর ঘরের দিকে সে কিছুতেই চাহিতে পারিতেছিল না। এমন সময় নোবী সিং আসিয়া সেলাম দিয়া জানাইল, ব্যারিষ্টার সাহেব খুব ভোরে চলিয়া গিয়াছেন। দ্বারবানের কথায় শেলি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

চা খাইয়াই শেলি সরযূর কাছে গেল। বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিভৃতে পাইয়া তাহার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অগ্নিস্রোতের মত উছলিয়া উঠিল, একে একে সমস্ত কথা কিছু মাত্র গোপন না করিয়া আবেগের সহিত সে সরযূকে বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার নয়ন গলিয়া জলও পড়িল। সরযূ সমস্ত শুনিল, শুনিয়া স্থাণুর মত নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শেলির দাদার এই লজ্জাকর হীন ষড়যন্ত্রে তাহার মন শতবার ঘৃণায় ভরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বিস্মিত সে কিছু মাত্র হয় নাই, কারণ, একগুঁয়ে অবাধ্য ছেলেমেয়েদের বশে আনিবার জন্য তাহাদের মত উচ্চশিক্ষিত সমাজের ইহাই তো একমাত্র অস্ত্র।

শেলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর বাড়ী ফিরিল না। সেদিনের ঐ ঘটনার পর হইতে সে অত্যন্ত সাবধানে থাকিত। ডাঃ মিত্র, বৌদির সম্পর্কীয় ভাই, বিশেষ করিয়া মোহিত বাবুর সহিত সে খুবই সতর্কতার সহিত মিশিত, কারণ, নিজের উপর বিশ্বাস সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে অতি দুর্ব্বল, যে কোন সময়ে তাহার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

* * * * *

* * * * *

তিন চার সপ্তাহ পরে শেলি একদিন নিজের মনে ভাবিতেছিল—বাস্তবিক সেদিন দাদা 'প্ল্যান' করিয়াই কি ঐরূপ করিয়াছিলেন? না হইতেও পারে। হয় তো হঠাৎ বিশেষ কোন কাজ পড়িয়াছিল এবং বাধ্য হইয়া নিজের বিশ্বস্ত বন্ধুকে বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। আর মোহিত বাবু? তাঁহার মধ্যে সে তো ঐ দিন

কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার দেখিতে পায় নাই, বরং তাহারই মনে সেদিন দুর্ব্বলতা জাগিয়াছিল এবং উহার জন্য সে নিজেই দোষী।

যখন শেলি নিজের মনে অপরকে ক্ষমা করিয়া, নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেছিল তখন পাশের ঘরে বৌদির ভায়ের মুখে দুই একবার তাহার নাম শুনিয়া সে কান খাড়া করিল। দাদা ও বৌদির ভায়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল

দাদা বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

বৌদির ভাই উত্তর দিলেন, "আমার মনে হয়, মিস্ মুখার্জ্জিকে এ সম্বন্ধে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করাই উচিত, যদি তাঁর ইচ্ছা না থাকে তবে জোর করে তাঁকে এ দিকে নেওয়ার চেষ্টা করা ঠিক নয়।"

"কেন?"

"ভালবাসা না হলে বিবাহ বন্ধন স্থায়ী হয় না।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালবাসা বলতে তুমি কি বোঝ?"

"আমি বুঝি—কোন-এক-জনের উপর প্রবল অনুরাগ।"

"সে অনুরাগ কদিনের জন্য—একমাস, দুমাস, ছমাস, ছবছর, অথবা আরও বেশী?"

বৌদির ভাই উত্তর দিলেন, "আরও বেশী—হয় তো সমস্ত জীবনের জন্যই, কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জি, বাস্তব জীবনে এ রকম হয় না, ও কেবল নাটক নভেলেই পড়া যায়।"

দাদা জেদের সহিত বলিলেন, "কিন্তু, সমাজে বিবাহ বলে একটা জিনিষ আছে।"

"মাপ করবেন মুখার্জ্জি সাহেব, বিবাহ আছে কিন্তু বিবাহের বন্ধন নেই, থাকতে পারে না। আসঙ্গলিপ্সায় মানুষ বে করে, তখন আর অন্য কিছু তার ভাববার সময় থাকে না, তারপর যখন কৌতূহল চরিতার্থ হয়ে যায় তখন পরস্পর দেখে—একের idea অন্যের idea থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ, তখন অতি তুচ্ছ কারণে তাদের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় তা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে। যে মনের মধ্যে পরস্পরের মিলবার কিছুই নেই সেই মন নিয়ে

স্বামী-স্ত্রীর আজীবন একত্র বাস করা কি সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই তার ফলে দেখা যায়—প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, divorce, polygamy ও polyandry. * * * আমাদের ত্রুটি কোথায় জানেন মিঃ মুখার্জ্জি? আমরা মেয়েমানুষের দিক থেকে চিন্তা করতে জানি না। Mill এর কথাটা একবার স্মরণ করুন—Women themselves must be free to tell what they have to tell.সেদিন Helen Jerome বোলে একটি স্ত্রীলোক লিখেছেন—I have often wondered what jerm it is that lodges in a man and causes him to imagine that he can explain and interpret women. এ কথাটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

বৌদির ভায়ের কথা শুনিয়া দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌লে ভাই, তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এর থেকে বাঁচবার কিছু উপায় বলতে পার?"

"উপায় আছে মিঃ মুখার্জ্জি, কিন্তু অতি নির্ম্মম ভাবে আমরা তা নষ্ট করেছি। যাদের মধ্যে ধর্ম্মের একটা আদর্শ আছে তাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল না থাকলেও শুধু ধর্ম্মের ভয়েই অনেকে বেঁচে যায়, কিন্তু আমাদের মত ধর্ম্মের যারা ধার দিয়েই যায় না তাদের একমাত্র উপায় দাদা,—মৃত্যু। আপনি দেখুন, ওদেশে ছেলে মেয়েদের ভিতর কী ভয়ঙ্কর ভাবে আত্মহত্যা বেড়ে চলেছে, খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন তার অন্যতম প্রধান কারণ—treachery in love ছাড়া আর কিছুই নয়—" এই কথা শেষ হইতে না হইতে শেলি শুনিতে পাইল বৌদি তাঁহাদের ঘরে আসিলেন এবং আলোচনাও হঠাৎ থামিয়া গেল।

তাঁহার শ্যালকের ভিতর এই রকমের কিছু ভাব আছে মিঃ মুখার্জ্জি পূর্ব্বে তাহা টের পান নাই, এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—শেলির সহিত মিশিবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ পাইয়াও কেন সে তাহাকে ক্রমাগত এড়াইয়া চলে।

ঐ দিন শেলি আর ঘরের বাহির হইল না, শুইয়া বসিয়া ক্রমাগত সে নিজের কথাই ভাবিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে বেজায় মাথা-

ধরায় কিছু না খাইয়া সে শুইয়া পড়িল। পরের দিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত শেলি উঠিল না দেখিয়া বৌদি তাহার খোঁজ নিতে আসিলেন তখন জ্বরের ঘোরে শেলি প্রলাপ বকিতেছে।

ডাঃ মিত্র তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন। দাদা, বৌদি শেলিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিন চার দিন পরেও যখন জ্বর ছাড়িল না তখন তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের চিন্তা দেখিয়া ডাঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, অত ভাবছেন কেন? mental depression থেকে অসুখটা হয়েছে বৈ তো নয়? একটু stimulent করলেই ওসব সেরে যাবে।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না ডাক্তার, যা তা খাইয়ে কাজ নেই।"

পূর্ব্ববৎ হাসিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, "ভয় খাচ্ছেন কেন মিসেস্ মুখার্জ্জি? একটু moral persuasion দরকার, তা হলেই 'মুছে যাবে অতীতের ব্যথা হিম যথা মলয় পরশে'।"

মিঃ মুখার্জ্জি বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তা দেখা যাবে এখন তুমি কাব্য রাখ ডাক্তার।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা শেলির মনের ভাবটা কি বলুন দেখি?"

মিসেস্ মুখার্জ্জি উত্তর দিলেন, "কি জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।"

"হুঁ, Nietzsche ঠিকই বলেছে—from a woman you can learn nothing of women. একটু চেষ্টা করলেই তো আপনি জানতে পারেন।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "আমি ঢের চেষ্টা করেছি, ডাক্তার।"

"দেখছি Kant এর কথাও ঠিক হয়ে গেল—woman does not betray her secret. আচ্ছা, মিসেস্ মুখার্জ্জি আমাকে একবার তার মনটা বুঝবার চেষ্টা করতে দেবেন?"

"হুঁ হুঁ রেখে দিন, আমরা মেয়ে মানুষ হয়েই বুঝতে পারছি নে, আর আপনি পারবেন।"

৩

"বাঃ, Mencken এর theoryও যে মিলে যায় দেখছি—One finds a general conspiracy on the part of woman against the publication of the esoteric wisdom of her sex."

"মেয়ে মানুষের কাছে মেয়ে মানুষের সম্বন্ধে যা তা বলবেন না, ডাক্তার"—এই বলিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি ডাঃ মিত্রের আলোচনাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

* * * * *

* * * * *

শেলির সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় মাসখানেক লাগিল।

বৌদি তাহার খুব সেবা করিয়াছিলেন, সরযু আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিয়া যাইত। সুস্থ হইলে শেলিকে কিছুদিনের জন্য কার্সিয়াং চেঞ্জে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহার দাদা, বৌদি আর দুই একজন ঝি-চাকর। শেলির বৌদি তাঁহার ভাইকেও সঙ্গে লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া সে যাইতে রাজী হয় নাই। শেলির দাদারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল না যে, সে তাহাদের সহিত যায়, কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, শেলির বিবাহে অনিচ্ছার মূলে হয় তো তাহারই প্ররোচনা রহিয়াছে। মধ্যে মোহিত বাবু শেলিদের অতিথিরূপে কয়েকদিন আসিয়া থাকিয়া গিয়াছিলেন।

৪

দুই তিন মাস পরে মিঃ মুখার্জ্জি শেলিকে লইয়া যখন কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন তখন পূর্ব্বের শেলি আর নাই, শরীর ও মনের উপর দিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। দাদা ও বৌদি তাহার সম্বন্ধে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। টি-পার্টি, সান্ধ্য-সম্মিলন, প্রীতি-ভোজন, থিয়েটার ও বায়স্কোপের বাছা বাছা play যেমন রোমিওজুলিয়েট, ইরাণের রাণী, পুণ্ডরীক, পাষাণী প্রভৃতি দেখিতে শেলি প্রায়ই মোহিত বাবুর সঙ্গে যাইত এবং সরযুকে সে এখন নানা অছিলায় এড়াইয়া চলিত। সরযূর উপর তাহার ভালবাসার

যে কিছু লাঘব হইয়াছিল ঠিক তাহা নহে, তবে সরযুর ভাবের সহিত তাহার মনের বর্ত্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য হইত না, তাই সে নিজেকে একটু দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত।

শেলি বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যহ আশা করিতেছে, কবে মোহিত বাবু বিবাহের প্রস্তাব করিবেন।

একদিন মোহিত বাবুর চাকর আসিয়া শেলিকে একখানা চিঠি দিল। মোহিত বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিশেষ কোন কাজের জন্য আজ সে তাঁহাদের ওখানে যাইতে পারিবে না। শেলি আজ একাই মাঠে বেড়াইতে গেল এবং এখানে ওখানে ঘুরিয়া ইডেন গার্ডেনে আসিয়া উপস্থিত হইল। খানিক দূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল—লতাবিতানে ঢাকা একটা বেঞ্চের উপর মোহিত বাবু বসিয়া, পাশে আর একজন তরুণী। মোহিত বাবুকে দেখিয়া শেলি আনন্দে তাঁহার কাছে যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত জনৈকা মহিলাকে দেখিয়া সে থম্‌কিয়া দাড়াইল। শেলি জানিত, মোহিত বাবুর কোন সহোদরা বা এই বয়সের কোন নিকট আত্মীয়াও নাই। কৌতূহলবশে শেলি দূর হইতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য হইয়া সে দেখিল—মোহিত বাবু মহিলাটির সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, শোণিত-সম্পর্কীয়া কোন আত্মীয়ার সহিত যেরূপ ব্যবহার সম্ভব নহে। এমন কি সে তাঁহার সহিত এতদিন এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াও ঐ মহিলাটি মোহিত বাবুর সহিত যেরূপ মাখামাখি করিতেছেন ঐরূপ একদিনের জন্যও সে করিতে পারে নাই।

শেলির পায়ের নীচে হইতে মাটি যেন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, প্রতারণা যেন প্রেমের মুখোস খুলিয়া আজ তাহার নগ্নমূর্ত্তি শেলির চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

এই দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া, পাগলের মত মনের অবস্থা লইয়া শেলি বাড়ী ফিরিল; কিন্তু, বাড়ীতে এক মুহূর্ত্ত সে থাকিতে পারিল না।

শেলি যখন সরযুর ওখানে গেল তখন সে বাড়ী ছিল না। সরযুর

ঘরে আসিয়া শেলি তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। সরযূ যখন বাড়ী ফিরিল তখন কিছু রাত্রি হইয়াছে। শেলি আসিয়াছে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া, না ডাকিয়া গায়ে হাত দিল, দিয়াই সে টের পাইল শেলির জ্বর হইয়াছে। শেলি দুই একবার সরযূর মুখের দিকে চাহিল, তাহার হাতখানা অতি স্নেহে নিজের বুকের ভিতর রাখিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না। সরযূ অবিলম্বে শেলির বৌদির নিকট সংবাদ পাঠাইল। সন্ধ্যার পর হইতে শেলিকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়াই তাঁহারা সরযূদের বাড়ী ছুটিয়া আসিলেন। গাড়ীতে তুলিবার জন্য শেলির দাদা ও বৌদি তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, কিন্তু শেলি কিছুতেই বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইল না। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অসুখের সময় বিরক্ত করা উচিত নহে মনে করিয়া তাহাকে আর বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না, সেই রাত্রি শেলি সরযূদের বাড়ীতেই থাকিল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় শেলির দাদা ও বৌদি তাহাকে লইতে আসিলেন, কিন্তু বাড়ী যাইতে সে কিছুতেই রাজী নহে। বাধ্য হইয়া শেলিকে সরযূদের বাড়ীতেই রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে হইল। শেলির অসুখ দিন দিন যখন বাড়িয়াই চলিয়াছে তখন হইতে বৌদি সমস্ত দিন সরযূদের বাড়ী থাকিতেন। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়া সারা রাত্রি অনিদ্রায় সরযূ শেলির সেবা করিত। সরযূর বন্ধু-প্রীতি দেখিয়া শেলির বৌদি অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রথম যেদিন মোহিত বাবু শেলিকে দেখিতে আসিলেন সেদিন তাঁহাকে দেখিয়াই শেলির শরীরের সমস্ত রক্ত বুকের ভিতর ছুটিয়া আসিয়া প্রবল আঘাতে তাহার জীর্ণ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া সহজ ভাবে সে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিল।

দিনের পর দিন যায়। একাধিক নামজাদা ডাক্তার শেলির চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু রোগ উপশমের কোন লক্ষণই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ

পায় নাই। সংবাদ পাইয়া শেলির দিদি বম্বে হইতে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই তাঁহার বোনের মুখ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, পরম স্নেহে শেলির রুক্ষ এলোমেলো চুলের ভিতর অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "একটু সেরে ওঠ্ লক্ষ্মীটি আমার, তারপরই তোকে আমার কাছে নিয়ে যাব।" শেলি, দিদির কথার কোন উত্তর দিল না কেবল তাহার শুষ্ক অধরের উপর একটু-খানি ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। শেলির দাদা ও বৌদি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এখন তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারা নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একদিন দুপুর বেলায় নির্জ্জন ঘর পাইয়া বৌদি শেলির মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভাই, আমি কি বুঝতে পারছি না, কি দুঃখে তুমি নিজের বাড়ী ছেড়ে বন্ধুর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ? কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ হয়েও পূর্ব্বে তোমায় বুঝতে পারি নাই—।" বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া, বৌদির কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া নিতান্ত বালিকার মতই শেলি কাঁদিতে লাগিল; তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা শতধারে বৌদির চোখে উছলিয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার পর শেলির দাদা, দিদি ও বৌদি বারান্দায় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ সরযুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন,—শেলির অসাড় বুকের উপর সরযু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে।

শ্রীসুশ্বেতা দেবী।

# সূর্য্য-কিরীট

ঐ যে নীল সাগরে আলোক তরী ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, ওঁকে আমরা সূর্য্য বলি। ওঁকে দেখতে হলে আর উপচক্ষুর প্রয়োজন হয় না। পরিষ্কার সুগোল চেহারা, পরিধির কোন জায়গায় একটুও আঁকা বাঁকা নেই, বরং চাঁদের পরিধির অসমানতা আমরা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য-দেবতার চেহারা একটুও সমান বা সরল নয়। যখন সর্ব্ব-গ্রাস গ্রহণ হয় তখন এটা আমরা বুঝতে পারি। তখন দুরবীণ সাহায্যে এঁর ঐ সুগোল অঙ্গে অতিদীর্ঘ উপাঙ্গ সকল দেখা যায়। তার মধ্যে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা ছটা-মুকুট (Corona)। গ্রহণের ম্লান সূর্য্যের চারিপাশে মুক্তার মত একটা আলো, চোখের তারাকে যেমন শ্বেতাংশ ঘিরে থাকে, ঠিক তেমনি ঘিরে থাকে। তা ছাড়া আরও দেখতে পাওয়া যায়, কপি পাতার মত আলোর পতাকার চাঞ্চল্য। আবার কখনও কখনও ছটা-মুকুটের পিছনে পান্নার মত টুকটুকে লাল অসংখ্য জ্যোতি কণা দেখতে পাওয়া যায়।

ষাট সত্তর বৎসর আগে গ্রহণের সময় যখন প্রথম ঐ সকল দেখা যায় তখন ঐগুলোকে লাল-শিখা (Red flames) বলা হোত। এখনকার জ্যোতির্ব্বিদেরা ওকে শৃঙ্গ (Prominences) বলে থাকেন। এখন, এই যে শিখাগুলো দেখা যায় এগুলো কার? চাঁদ যখন ঠিক সূর্য্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সূর্য্যকে আঁধার করে ঢেকে ফেলে তখন এই শিখাগুলো দেখা যায় এবং চাঁদ, গ্রহণের সময় সূর্য্যের সঙ্গে এমন করে মিশে থাকে যে ঐ শিখাগুলো চাঁদের না সূর্য্যের বোঝা বড় কঠিন। কিন্তু যখন দুরবীক্ষণ যন্ত্রে আমরা ঐ শিখাগুলো দেখি তখন চাঁদকে দেখতে গেলে যে মান-রেখা (Scale) থেকে দেখতে হয় তা থেকে আরও ৪০০ গুণ উর্দ্ধরেখা থেকে ওদের দেখতে হয়। এদিকে আমরা পূর্ব্ব থেকেই জানি চাঁদ অপেক্ষা সূর্য্য পৃথিবী থেকে ৪০০ গুণ অধিক দূরে। কাজে-

কাজেই বলতে হয় ঐ শিখা চাঁদের নয় সূর্য্যের। ১৮৪২ এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের চন্দ্র-গ্রহণে ঠিক হয় যে, ঐ শিখাগুলো সূর্য্যেরই অংশ, চাঁদের নয় এবং কঠিন কিছুও নয়। কারণ একটা শিখাকে কাস্তের মত বাঁকা ও আর একটাকে মেঘের মত ভাসতে দেখা যায়। কাজে কাজেই বলতে হয়, ওগুলো কোন রকম বায়বীয় পদার্থ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্র সাহায্যে বুঝা যায় যে, ঐ উঁচু উঁচু জায়গাগুলো অতি উষ্ণ বাষ্প। আর ঐ সকল গ্যাসের মধ্যে উদ্‌যান বাষ্পকেই প্রথম ধরা হয়। উহা সূর্য্যকে ৫০০০ মাইল চওড়া মুকুটের মত ঘিরে আছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা একে জ্যোতিঃ-চক্র Sierra বা Chromosphere বলে থাকেন। আর ঐ ভয়াবহ অগ্নি-সমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে নানা রকমের শিখার স্ফুরণ হচ্ছে। কখনও নিশানের মত, কখনও বনের মত, কখনও পেঁজা তুলোর ন্যায় মেঘের মত দেখা যায়। কখনও কখনও ফোয়ারার মত আগুন উথলে উঠছে। ঐ আলোক-স্তম্ভগুলোকে স্পেক্‌টাম যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে তাতে লোহা, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টিটেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু আছে এবং সেগুলো অতি প্রচণ্ড বেগে সেই অগ্নি-সাগরে উদ্বেলিত হচ্ছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর এম্ ফেনি M. Fenyi এইরূপ একটা অগ্নিস্তম্ভের সীমা ও গতি নির্দ্দেশ করেন। ইহার দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে ৩০০০০০ মাইলেরও অধিক হয়েছিল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের ৪০ গুণ অধিক বা পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূর তা থেকেও বেশী। দেখা যায় উহা ৪ মিনিটে ১০০০০০ মাইল বর্দ্ধিত হয়। হিসাব করলে দেখা যায় এর ঊর্দ্ধগতি প্রতি সেকেণ্ডে ২৭৮ মাইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন এম্ ট্রৌউভেলট M Trouvelot ঐরূপ আরও সূর্য্য-কিরীট দেখতে পান। তাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ৩৫০০০০ মাইল করে। এ থেকে পাঠক অনুমান করুন সূর্য্যের অন্তর্নিহিত শক্তি কি বিপুল।

—বাসুদেবানন্দ।

# পল্লী সংগঠন

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

জাতীয় জীবনের উন্নতিতে মহিলাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এ কথা পুরুষ হয়েও আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। কেন না, যে পৌরুষের আমরা গর্ব্ব করি, মায়ের ক্রোড়ে মায়ের বিমল স্নেহধারা সিঞ্চনে তার প্রথম বিকাশ; আর যে মহান্ মহীরুহ আজ আকাশে মাথা তুলেছে মৃত্তিকাময়ী ধরিত্রী এখনও নীরবে তার স্নেহবারি দিয়ে তাকে সজীব করে রাখছে—এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না, অথচ সেই কথাটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। আমরা মেয়েদের শিক্ষার জন্য দুএকটি বালিকা বিদ্যালয় করে কর্ত্তব্য সমাধা করি এবং তাদের অজ্ঞান ও কৃপাপাত্রী বলে মনে করি, কিন্তু যে জ্ঞানের গৌরবে আজ তাদের উপেক্ষা করে যাই, সে জ্ঞানের আলো একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালানোর মত শৈশবে তাঁরাই নিজের জীবন-দীপ হতে আমাদের জীবনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এ কথা সত্য, যে জল জীবের জীবনস্বরূপ সেই জলই আবার স্রোত প্রবাহের পথ রুদ্ধ হলে দূষিত হয়ে উঠে। এই যে গণ্ডি দেওয়া বদ্ধভাব এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতেও দূর হয় না। কেন-না সেরূপ ভাবের শিক্ষায় শিক্ষিতা রমণীগণও তাঁদের শিক্ষাভিমান ও চালচলনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাঁদের শিক্ষা বেশীর ভাগ বাহিরের ব্যবহারিক জীবনেই প্রযুক্ত হয়, অন্তরের দিক দিয়া তার ততটা গভীরতা হয় না। যে সকল নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পল্লীর ভগিনীগণের সহিত সংযোগ রেখে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বাড়াতে চেষ্টা করছেন, তার মধ্যে স্বর্গীয়া 'সরোজনলিনী দত্ত মহিলা-সমিতি' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সমিতি যে ভাবে কাজ আরম্ভ

করেছেন তা কেবল মহিলাদের পুস্তক-গত শিক্ষা নয়, অর্থকরী শিল্পের উন্নতি দ্বারা তাঁরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং দারিদ্র্যের কঠোর নিস্পেষণে তাঁদের যে সব উচ্চবৃত্তি নিস্পেষিত হয়ে গিয়েছে জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতায় সেগুলি আবার যাতে পুনঃ সঞ্জীবিত হতে পারে সেদিকেও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছেন। মাননীয়া অবলা বসু মহোদয়া নারী-শিক্ষা-সমিতির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন। আর তাঁর 'বাণী-ভবন' দরিদ্রা পল্লী-বিধবাগণের লেখাপড়া ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেটিও আশার বিষয়। কাশীতে 'অন্নপূর্ণা-আশ্রম' নামে একটি আশ্রমে অসহায়া পল্লী-রমণীগণ শিক্ষার জন্য আশ্রয় পেয়ে থাকেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এই আশ্রম-ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলী' শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। পূজনীয়া গৌরী-মাতার 'সারদেশ্বরী আশ্রম' এবং ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়, আজ বাংলা দেশের কুমারী ও ব্রহ্মচারিণীগণের জীবন গঠনের কেন্দ্রস্বরূপে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া রমণীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ আছে সেগুলিও বিশেষ প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

আমি অনেক আগেই বলেছি, পল্লী সংগঠনের কোন একটি কার্য্য একের চেষ্টায় হয় না। বহু দিক থেকে বহুভাবে একই বিষয়ে চেষ্টা করতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশন, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষক হয়ে বিদ্যালয়টি যাতে ভাল ভাবে চলে ও বেশী কাজ করতে পারে তারই চেষ্টা করছেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ ত্যাগের আদর্শ নিজ হৃদয়ে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের যুগধর্ম্মের সাধনা—যে সাধনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে দায়স্বরূপ অর্পণ করেছিলেন, যে সাধনা সর্ব্বভূতে বিরাজিতা জননী ও নররূপী নারায়ণের সেবায় আত্মমুক্তি, এবং যে সাধনা স্বামিজী দেশ-মাতৃকার সেবারূপে

ভারতবর্ষীয় যুবকবৃন্দকে দান করে গিয়েছেন, নিবেদিতাও সেই সাধন-তপস্যায় নিজ জীবন নিবেদন করেছিলেন এবং এই শিক্ষালয়টি তারই ফলস্বরূপ। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল যে, এই শিক্ষালয়ে সত্য, ত্যাগ ও মহান্ আদর্শের বায়ুতে ছাত্রীদের জীবন ক্রমে বিকশিত হবে এবং জীবন-যুদ্ধে তারা প্রত্যেকেই এক একটি মহা বীর রমণী হয়ে উঠবেন। আর সত্য ও বীরত্বের আদর্শ যদি এই ভাবে রমণীগণের হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বাংলা দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন তা হলে পল্লী সংগঠিত হবে এবং সমগ্র জাতিরও উদ্ধার হতে বিলম্ব হবে না। নিবেদিতা তাঁর এই আশা পূরণের ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর ন্যস্ত করে গিয়েছেন।

পল্লী সংগঠনের কথা বলতে গেলে পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অর্থ নৈতিক উন্নতি—প্রধানতঃ এই দুটি বিষয় বলতে হয়। অর্থনীতি-শাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা করবার আমার কোন দাবী নেই। স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার কথা বলতে হয়। 'সেণ্ট্রাল এ্যান্টি ম্যালেরিয়া' ও 'কো আপারেটিভ সোসাইটি'র সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং উপস্থিত এবং আমার অপেক্ষা তিনি এ বিষয় বলবার যোগ্যতর ব্যক্তি, এজন্য আমি এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনা করতে চাই না। তবে শিশু-মৃত্যুর বিষয়ে আমি নিজে কিছু গবেষণা করেছিলাম বলে এখানে সংক্ষেপে দুচার কথা বলতে চাই। কথাটি এই যে, শিশু-মৃত্যুর সঙ্গে গরুর খারাপ দুধের বিশেষ যোগ আছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই খারাপ দুধের সঙ্গে গরুর খাদ্য, ঘাসেরও বিশেষ যোগ আছে। গরু যদি দূর্ব্বা-ঘাস খায় তা হলে গরুর দুধ খুব ভাল ও স্বাস্থ্যকর হয়, কিন্তু এক রকম জলা-ঘাস আছে, যা খেলে গরুর দুধ এমন খারাপ হয়ে যায় যে তাতে শিশুদের ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভার হয় ও শিশুরা তাতেই মারা যায়। খুলনা জেলায় এক গ্রামে ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভারে শিশু-মৃত্যু খুবই বেশী. এবং সেখানে প্রায় অধিকাংশ ঘাসই জলা-ঘাস, আবার কিছু দূরে নিকটস্থ কোন গ্রামে, যেখানে দূর্ব্বা-

ঘাস আছে সেখানে শিশুরা বেশ সুস্থ ও সবল এবং মৃত্যুর হার খুব কম। এই রকম যে যে গ্রামে শিশু-মৃত্যু বেশী সেখানেই ঘাস খারাপ, আর যেখানে দুর্ব্বা-ঘাস সেখানে শিশু-মৃত্যু কম এটি আমি অনেক স্থানেই লক্ষ্য করেছি। এতে এই বোঝা যায় যে, আমাদের যেমন ধানের ক্ষেত দরকার, তেমনি গোচারণের মাঠও দরকার এবং মাঠে যাতে ভাল ঘাস হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

পল্লী সংগঠন বিষয়ে গোচারণ মাঠের প্রয়োজনীয়তার আর একটা দিক আছে। Jan St Lewinski নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত The London School of Economics এ রুস দেশের Village Community সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, রুসদেশে পতিত জমা বা গোচারণের মাঠ যা সাধারণে সকলেই ব্যাবহার করে কিংবা জঙ্গলা জায়গা, যেখান থেকে সকলেই কাঠ ভেঙ্গে নেয় এগুলি পল্লী সংগঠনের একটি বন্ধন স্বরূপ হয়ে আছে। আমাদের বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রামের Anti-Malarial Co-operative & Public Health Society তে সকল সভ্যকেই কিছু কিছু অংশ কিনতে হবে, এই নিয়ম করে প্রত্যেক গ্রাম্য সোসাইটিতে একটি করে যে ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করেছেন সেটিও অনেকটা এইরূপ গোচারণ মাঠ প্রভৃতির ন্যায় সকল সভ্যের বন্ধনী স্বরূপ হয়েছে এবং আমার অভিজ্ঞতায় এ প্রথা বেশ সফল হবে। উপরে গরুর খাদ্য ও শিশু-মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা বল্লুম তাই থেকে বেশ বোঝা যায় পল্লীগ্রামের অনেক সমস্যাই নিদ্ধারণ করবার আছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণের এই সমস্ত পল্লী-সমস্যা-সমাধান বিষয়ে গবেষণার একটি চেষ্টা হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বঙ্গীয় হিত-সাধন-মণ্ডলী'র অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—বিষয় শিক্ষা, আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি ও পাশ করেছি। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এখন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। কেবল

মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোন কাজের জিনিষ নয়। কোন উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।" এই কথাগুলি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ম্যালেরিযার মশার কথা বলতে পারি। ম্যালেরিয়ার মশার অনেক রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে। গ্রামের এক একটি ডোবায় একই প্রকার ম্যালেরিয়ার মশা বৎসরের পর বৎসর জন্মাচ্ছে, সে ডোবার জল গ্রীষ্ম কালে শুকিয়ে গিয়ে বর্ষায় নূতন জল হলেও প্রায়ই অন্য রকম মশা হয় না; সেই একই রকম মশা হয়। কিন্তু কেন যে এরূপ হয়, তা এ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানবিদ্ নির্দ্ধারণ করতে পারেন নি। এ রকম গামের অনেক সমস্যাই অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, জীবতত্ত্বে, কৃষিতে, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে বা অর্থকরী বিদ্যায় যে কোন বিষয় নিয়ে যদি যুবকেরা গবেষণার দ্বারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন তা হলে কেবল যে গ্রামের উন্নতি হয় তা নয়, জগতেরও একটি স্থায়ী উন্নতি হয় এবং বিজ্ঞান-জগতে একটি কীর্ত্তি রেখে যেতে পারেন। আজ কালের দিনে পণ্ডিত সমাজে গবেষণার ক্ষেত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের গবেষণার কত নূতন নূতন ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, সে দিকে কারও দৃষ্টি নেই।

পল্লী সংগঠনের যে বৃহৎ সমস্যা তার মধ্যে আমি সামান্য কিছু বলেছি, আমি কেবল পল্লীবাসীর চিন্তাধারার দিক দিয়া বলেছি। আর রামকৃষ্ণ মিশনের এই মহাসম্মেলনে আমার একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এই চিন্তার ধারা যদি নূতন দিকে নিয়ে যেতে হয় তবে রামকৃষ্ণ মিশনই তার ভার নিতে পারেন। এই মহা-সম্মেলনে মিশনের একটি উদ্দেশ্য—তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ। আমি আশা করি, রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-নির্দ্ধারণের মধ্যে পল্লী সংগঠনকেও স্থান দেবেন। বিশেষতঃ পল্লী সংগঠনের জন্য যে সকল কৃতসঙ্কল্প যুবক আধুনিক পল্লীবাসের অশেষ অসুবিধা, দুঃখ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ ভোগ সহ্য করে

এবং পল্লিবাসীর বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে পল্লী সংগঠন করতে পারেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগী যুবক-বৃন্দেরই এ বিষয়ে বিশেষ করে তার অগ্রগামিত্বের অধিকার আছে। এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধনে পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই বাণীই আমাদের মূলমন্ত্র। যদি এই মন্ত্র সাধন করতে হয় পল্লীই তার ক্ষেত্র আর তাঁরা পল্লীতেও তার সাধন করছেন, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে যদি তাঁরা এ বিষয়ে অধিক মনোযোগী হন তা হলে শুভ ফল যে অবশ্যম্ভাবী এতে আমাদের সন্দেহ নাই।

( সমাপ্ত ) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার।

---

# শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয় না। সেই বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন উপনীতেরই হয়। উপনয়ন দ্বিজেরই হয়, সুতরাং শূদ্রের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সম্ভব কিরূপে হইবে? তাহা হইলে বলিব, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না হইলে আংশিক বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হইবে না কেন? বেদার্থবোধ যদি অধ্যয়নের ফল হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিধির কি প্রয়োজন? শব্দজন্য যে জ্ঞান তাহার কারণ শব্দই হয়। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের কারণ প্রমাণই হয়, বিধি ত কখন জ্ঞানের কারণ হয় না। ধর্ম্মের পক্ষে বিধি কারণ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের পক্ষে বিধি কারণ নহে। বেদাধ্যয়নজন্য পুণ্য বিধিপূর্ব্বক পাঠের ফল হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর তাহাতে আবশ্যকতা কি? তাঁহারা পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বেদদ্বারা ব্রহ্মকে

জানিতে হইবে। সেই বেদ শব্দরাশিবিশেষ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের আবশ্যকতা কি?

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের মধ্যে "বেদপড়া উচিত" এইরূপ বেদাধ্যয়নবিধি থাকায় লোকে বেদ পড়ে, নচেৎ লোকে পড়িবে কেন? এজন্য বেদাধ্যয়ন বিধিপূর্ব্বকই হইল, আর তাহা অপর উপনয়নাদি-বিধি সহকারে হইতে গেলে শূদ্রের ভাগ্যে আর বেদাধ্যয়ন হয় না। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, লোকে যে প্রথমে বেদ পড়ে, তাহা কি বেদাধ্যয়ন করিবার পর পড়ে? বেদাধ্যয়ন করিবার পর বেদ পড়িলে আর প্রথমবার অধ্যয়ন করা হইল না। অতএব বিধিমূলক বেদাধ্যয়ন কিরূপে হইল?

যদি বলা যায়, পিতা বা গুরু পড়িতে বলেন বলিয়া অথবা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা পড়িতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই লোকে প্রথমবার বেদ পড়ে, তৎপরে বেদের বিধি বলেই লোকে পড়ে। সুতরাং বেদপাঠ বিধিমূলকই হইল? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, এইরূপ পাঠ বিধিমূলক না বলিয়া ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্যই হয়,—এইরূপ বলাই সঙ্গত। কারণ, গুরু, পিতা বা ব্রহ্মা বেদ পড়াইবার কালে পাঠকের কল্যাণ হইবে—ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়াই বা বলিয়া দিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করেন, অথবা স্থলবিশেষে পিতা বা গুরুর ভয়ে বালক পাঠ করিয়া থাকে; পরে বয়োবৃদ্ধ হইলে নিজের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই পড়ে। অতএব বিধিমূলকতা কোথায়? তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যে বেদাধ্যয়ন তাহা ত এতাদৃশ বিধির সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিতে পারে না, কারণ, তাহাতে অর্থবোধমাত্রই প্রয়োজন, তাহা ইষ্টসাধনতা জ্ঞানমূলকই হয়। অতএব অর্থবোধার্থ বেদাধ্যয়নে বিধিমূলকতা স্বীকারের আবশ্যকতা কি? উহা ইষ্টসাধনতা জ্ঞানমূলক।

কেহ হয় ত বলিবেন,—এই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানটি—"পড়" "পড়িলে ভাল হইবে" "নচেৎ পাপ হইবে" এইরূপ আদেশজন্য হয়। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকিলেও অনেক সময় প্রবৃত্তি হয় না, আদেশ কিন্তু সর্ব্বস্থলে প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে। অতএব বেদাধ্যয়ন বিধিমূলকই হইবে। তাহা

হইলে বলিতে পারা যায় যে, যাহার পুরাণাদি পাঠ করিয়া বা সাধুমুখে শুনিয়া বেদমধ্যস্থ জ্ঞানরত্নের জ্ঞান হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ক ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানাদিও হইয়াছে, সে ত স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আর আদেশ করিতে হয় না। সুতরাং এস্থলে বিধি কারণ হইল কি প্রকারে? বালকপ্রকৃতি বা অজ্ঞ অলসের পক্ষে বা যাহারা শ্রেয়ঃ জানিয়াও প্রবৃত্ত হয় না তাহাদের পক্ষে ইহা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র ত সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞান প্রবল হইলে তাদৃশ বালকেরও অধ্যয়ন প্রবৃত্তি হয়, অতএব বিধিকে কারণ না বলিয়া ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানকেই কারণ বলা ভাল। আর তাহা যদি হয়, তবে শ্রেয়োর্থীকে নিষেধ করা কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলা যাইতে পারে না। কৌশলে বহুকষ্টে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহাদিগকে মুক্তির পথে আনিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে নিষেধ যুক্তিযুক্ত হইলেও শ্রেয়োর্থীকে নিবারণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না।

যদি বলা যায়, এই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই বিধিমূলক। বেদে এইরূপ বিধি আছে বলিয়াই ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়। পুরাণাদিপাঠে বা সাধুমুখে শুনিয়া যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়, তাহাও বেদে এইরূপ বিধি আছে বলিয়াই হইয়া থাকে, নচেৎ হইত না। পুরাণবাক্য বেদেরই অনুবাদ, সাধুর উপদেশ তাহারই প্রতিধ্বনি যেহেতু বেদ ঈশ্বরবৎ নিত্য, উহাতে যে ভাবে যাহাকে বেদ পড়িতে বলা হইয়াছে সেই ভাবেই ব্রহ্মা ঋষিগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং গুরু বা পিতাও বালককে সেই রূপেই শিক্ষা দেন, তাহার অন্যথা কেহই করেন না। বেদ যদি নিত্য না হইত, তাহা হইলে প্রথমবারের অধ্যয়ন সম্ভবপর হইত। অতএব বেদাধ্যয়ন বিধিমূলকই হইয়া থাকে। তাহা হইলে বলিব যে, মানবের জ্ঞান-পিপাসাও স্বাভাবিক এবং নিঃশ্রেয়সলাভ কামনাও স্বাভাবিক, সুতরাং যে কোনরূপে বেদের জ্ঞানরত্নের সন্ধান পাইলে জিজ্ঞাসু ও শ্রেয়স্কামী যে তল্লাভে যত্ন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বেদ একবার জানাইয়া দিলেই হইল। বেদোক্ত ধর্ম্মলাভের জন্য না হয় বেদবিধির অনুসরণ করা আবশ্যক, কিন্তু বেদোক্ত নিত্যসিদ্ধব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সে

বিধির আবশ্যকতা কেন হইবে? বেদোক্ত সিদ্ধবস্তুর জ্ঞানের জন্য কি উচ্চারণ-উপবেশনপ্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষের জ্ঞান আবশ্যক হয়? এইরূপে বসিয়া পড়িলে বা এইরূপ সুর করিয়া পড়িলে তবে অর্থজ্ঞান হইবে নচেৎ হইবে না—এরূপ কি কোন নিয়ম থাকিতে পারে? এ বিষয়ে যিনি আগ্রহ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক আচরণ করিবেন।

ইহাতেও কেহ কেহ বলেন যে, বেদোক্ত নিয়মে বেদ পাঠ না করিলে বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞান হইতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে মুক্তিসাধক ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না; প্রত্যুত বিরোচনের ন্যায় বিপরীত জ্ঞানই হইবে। ইন্দ্রের মত প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিধিপূর্ব্বক পাঠাদি আবশ্যক। দেখ, অসঙ্গ ব্রহ্ম বৈদিকপ্রমাণগম্য। অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে, তিনি জগৎকারণ, সুতরাং তিনি সসঙ্গ, তিনি অসঙ্গ হইতে পারেন না। অতএব অনুমানাদি যুক্তির দ্বারা তাহার জ্ঞান অসম্ভব। আর অবিধিপূর্ব্বক পড়িলে তাহাতে সংশয় ও ভ্রমজ্ঞানই জন্মিবে। বিধিপূর্ব্বক পাঠে শ্রদ্ধাধিক্যবশতঃ সংশয়াদি জন্মে না। অতএব তাহার জ্ঞানও বেদবিধিপূর্ব্বকই হইবার কথা, অন্যথা নহে। ইহার উত্তরে তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, বেদের শব্দের সহিত তাহাদের অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা হইলে তাহা সাধারণ শব্দের সহিত তাহাদের অর্থের সম্বন্ধের ন্যায় নহে বলিতে হইল। ইহা কি অস্বাভাবিক কথা নহে? ইহা কাহারও স্বীকৃত নহে। অতএব সাধারণ শব্দের ন্যায় ইহার অর্থজ্ঞান হইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হয় আর মুক্তিও হয়। তাহার পর বিরোচনের যে জ্ঞান হয় নাই, তাহার কারণ, তাহার সামর্থ্যের অভাব। ইন্দ্রের সামর্থ্যের ন্যায় তাহার সামর্থ্য ছিল না এইমাত্র। ব্রহ্মা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব উপদেশ করিলেন তখন যে তাহার ভাল করিয়া জানা উচিত, তাহা আর তাহার মনে উদয় হইল না। ইহাই তাহার অসামর্থ্যের জ্ঞাপক। অতএব বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞান যথার্থজ্ঞানের কারণ হইল না, কিন্তু সামর্থ্য ও অর্থিত্বই কারণ হইল। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যে শূদ্র পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে অথবা ইহজন্মে পুরাণাদি পাঠ করিয়া কিংবা সাধুমুখে শুনিয়া কিঞ্চিৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

করিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি পুরাণের মূল কি জানিবার জন্য শ্রদ্ধাসহকারে বেদাধ্যয়ন অনুপনীতের পাঠরূপ যে অবিধি সেই অবিধিপূর্ব্বকও করে, তবে তাহার কেন সে জ্ঞান দৃঢ় হইবে না, কেন যে তাহার পাপ হইয়া সে জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে—ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্ম যদি ভূতবস্তু না হইতেন, ব্রহ্ম যদি নিত্যসিদ্ধ বস্তু না হইতেন, যদি তাঁহার জ্ঞান ও তিনি একই বস্তু না হইতেন, যদি তিনি বা তাঁহার জ্ঞান উৎপাদ্য হইত, যদি তাঁহার জ্ঞান তদ্বিষয়ক ভ্রমাপনয়নরূপ না হইত, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানে বিধিমূলকতা স্বীকার করিতে পারা যাইত। অতএব এতাদৃশ কঠোরতা শূদ্রের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং দ্বিজগণের নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, এখন যদি স্ত্রীশূদ্রের বেদাধ্যয়নে বিধিনিষেধ-বাক্যগুলি একত্র করিয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কি পাওয়া যায় একবার দেখা আবশ্যক। প্রথম দেখা যায়, উপনয়ন না হইলে বৈধ বেদাধ্যয়ন সম্ভবপর হয় না, সেই উপনয়নসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিধি আছে, শূদ্রের পক্ষে বিধি বা নিষেধ কিছুই নাই। কোন কোন গ্রন্থে বাচনিক উপনয়নের বিধি আছে। এতদ্দ্বারা শূদ্রের পক্ষে জাতিসামান্যে যে নিষেধ কল্পনা করা হয় তাহা যথার্থ নিষেধ পদবাচ্য হয় না। ইহা সন্দিগ্ধ নিষেধ বা আংশিক নিষেধ। কারণ, বিষ্ণুকে প্রণাম করিও বলিলে যে শিবকে প্রণাম করিও না—তাহা বুঝায় না। ইহারই ফলে নিষাদ রথকারের যাগবিশেষে অধিকারের ন্যায় সমর্থ প্রার্থী শূদ্রের অধিকার আছে—এরূপ কল্পনার অবকাশ বিলুপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং এতদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ বিধি অংশবিশেষে লব্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, শূদ্রের বেদাধ্যয়নে যে নিষেধ, তাহা পশুপ্রভৃতি নীচতাবোধক বিশেষণসংযুক্ত শূদ্রের পক্ষে নিষেধ, জাতিসামান্যে নিষেধ নহে। ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে একে একে আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা সমর্থ শূদ্রের পক্ষে বরং বিধিই লব্ধ হয়। কারণ, কোন একটির এক অংশে নিষেধ থাকিলে অপর অংশে নিষেধ আদৌ লভ্য হয় না, যেমন জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্ন দিবে না—বলিলে নীরোগ ব্যক্তিকে

যে দিবে বলা হইল, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এখন এইরূপ বিধির সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকারোক্ত সন্দিগ্ধ নিষেধের তুলনা করিলে সমর্থ শূদ্রের পক্ষে বিধিপক্ষই বলবত্তর হয়। কারণ, যাহার জন্য বিধি করা হয়, তাহাতে লোকের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি থাকে না, কিন্তু যাহা নিষেধ করা হয়, তাহার জন্য লোকের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি থাকে। এখন প্রথম প্রকারের সন্দিগ্ধ নিষেধ হইতে সমর্থের পক্ষে যে বিধি, অর্থাৎ কতকের বিধিতে অবশিষ্টের যে বিধি, সেই বিধির সহিত দ্বিতীয় প্রকারে লব্ধ যে বলবত্তর বিধি অর্থাৎ কতকের নিষেধে অবশিষ্টের যে বিধি, তাহা মিশ্রিত করিলে সমর্থ স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বিধিরই অত্যধিক প্রাবল্যই হইল।

তাহার পর তৃতীয়তঃ দেখা যায়, কতকগুলি বাক্য আছে যাহাতে শূদ্রের জাতিসামান্যে শ্রবণের বিধি আছে, বিপুল ধনদানদ্বারা উপনয়নেরও বিধি আছে, বাচনিক উপনয়নেরও বিধি আছে এবং বিশিষ্টবংশ-সম্ভূতা স্ত্রীদিগেরও পক্ষে বিধি আছে। এখন এই তৃতীয় পক্ষের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ফল মিলিত করিলে সমর্থ স্ত্রীশূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় যে অবিসংবাদী অধিকারই আছে, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকে না। অতএব কেবল মাত্র বিধিনিষেধের বাক্যগুলির তুলনা করিলে বিধির পক্ষেই বল অধিক হয়, অর্থাৎ বিধিই সিদ্ধ হয়।

আর যদি বিধির উদ্দেশ্য বিচার করা যায়, তাহা হইলে ত সমর্থ প্রার্থীকে বঞ্চিত করিবার কোন উপায়ই পাওয়া যায় না। যেহেতু বেদান্ত মধ্যে "কাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবে" যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে অধিকাংশ স্থলেই যে শান্ত, গুরুশুশ্রূষু, গুরুভক্ত ও শ্রদ্ধালু তাহাকেই দিবে, যে অশ্রদ্ধধান, অশিষ্য, দুর্বিনীত, অভক্ত তাহাকে দিবে না—এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। জাতি বা জন্মের উল্লেখ অধিকাংশ স্থলেই নাই। সামর্থ্যবোধক শব্দই আছে, জন্মবোধক শব্দ নাই। অতএব কোন মতেই শ্রদ্ধালু সমর্থ স্ত্রীশূদ্র অনধিকারী নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এস্থলে প্রতিপক্ষ তাদৃশগুণসম্পন্ন দ্বিজকেই দিবে, এইরূপ বলাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলিবেন, কিন্তু তাহা কর্ম্মকাণ্ড স্থলেই সঙ্গত,

জ্ঞানকাণ্ডে সঙ্গত হয় না, যেহেতু জ্ঞান কর্ম্মের ফল নহে উহা প্রমাণের ফল।

বস্তুতঃ বেদাদিব অধিকারী জাতি ও গুণকর্ম্ম দেখিয়া দিলে কি ফল হয় এবং কেবল জাতি দেখিয়া দিলে কি ফল হয় এবং কেবল গুণকর্ম্ম দেখিয়া দিলে কি ফল হয়—ইহা যদি বিবেচনা কবিযা দেখা যায়, তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, জাতি ও গুণকর্ম্ম দেখিয়া দিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল হইবার কথা, এবং কেবল জাতি দেখিয়া দিলে খুব ভাল লোকের সংখ্যা অল্প এবং মন্দ লোকেব সংখ্যা অধিক হয় এবং কেবল গুণকর্ম্ম দেখিয়া দিলে তাদৃশ খুব ভাল লোকের সংখ্যা আরও কম হয়, কিন্তু মন্দ লোকেব সংখ্যাও যথেষ্ট কম হয়। অধিকার-বিধি যদি এই দৃষ্টিতে বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতি-বিশেষকে জাতিসামান্যে শাস্ত্রীয় সংস্কারের শুভ ফল হইতে বঞ্চিত করা কথনই যুক্তিযুক্ত নহে, শাস্ত্রকার ও শাস্ত্র কাহারও তাহা অভিপ্রায় নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপবি উক্ত বিচারদ্বারা যদিও সমর্থ ও প্রার্থী স্ত্রীশূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহা ত আচার্য্য শঙ্করেব সম্মত হইতে পারে না। কাবণ, তিনি স্পষ্টভাবেই বলিযাছেন যে, জাতিশূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই. যথা—"শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বণ্যস্য অধিকার স্মবণাৎ, বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্তি অধিকারঃ শূদ্রাণাম্ ইতি স্থিতম্" (বেদান্ত সূত্র ১।৩।৩৮)। কিন্তু সমর্থ স্ত্রীশূদ্রের অধিকাব সিদ্ধ হইলে জাতিশূদ্রেরই অধিকাব সিদ্ধ হইল; কারণ, সমর্থ শূদ্র, জাতিশূদ্রের অন্তর্গত, বহির্গত নহে। জাতিশূদ্র বলিলে সমর্থ অসমর্থ সকল শূদ্রই পাওযা যায়। সুতবাং ওরূপ মত আচার্য্যের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এস্থলে তাহা হইলে এই জাতিশূদ্র শব্দের অর্থটা নির্ণেয়। জাতি শব্দের ব্যক্তিগত অর্থে জন্ম বুঝায়। সেই জন্ম মনুষ্যেব পক্ষে পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্য প্রভৃতি কর্ম্মফলানুরূপ এবং বাসনাপ্রভৃতি গুণানুরূপ হইয়া থাকে। বহু ব্যক্তিতে

ইহা যখন প্রযুক্ত হয়, তখন বহু ব্যক্তির যে কতকগুলি একরূপ কর্ম্মের জন্মগত সংস্কার ও এক প্রকার বাসনা বা আকৃতি প্রভৃতি তাহাই বুঝায়। ইহা জন্মদ্বারা কল্পনা করা হয় মাত্র। অনুমান করাও যায় না, যেহেতু জন্মটি তাদৃশ সংস্কারপ্রভৃতির পক্ষে ব্যভিচারী হেতু হয়। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ—যাহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত, শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা-যজনযাজন-দান-প্রতিগ্রহকর্ম্মরত, নিত্য-ব্রতী, সত্যপর, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য ও উপরত এবং শূদ্র শব্দের অর্থ—যাহারা সর্ব্বভক্ষ্যে রত, সর্ব্বকর্ম্মকারী, অশুচি, অনাচারী ও বেদ-ত্যাগকারী। সুতরাং জাতিশূদ্র বা জাতিব্রাহ্মণ বলিলে বুঝায় যে, যাহাদের পিতামাতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণাচারী বা শূদ্রাচারী, এবং জাতক নিজেও ব্রাহ্মণ বা শূদ্রাচারানুকূল স্বভাবাপন্ন। অতএব যদি কেবল পিতামাতা ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হন, তাহা হইলে জাতিশূদ্র বা জাতিব্রাহ্মণ হয় না, অথবা কেবল ব্রাহ্মণ বা শূদ্রানুকূল স্বভাবাপন্ন হন, তাহা হইলেও জাতিশূদ্র বা জাতিব্রাহ্মণ হয় না। জন্ম দেখিয়া স্বভাব অনুমান করিয়া লইব বলিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু জন্ম উহার প্রকৃত হেতু হয় না। এই কারণে আচার্য্যোক্ত জাতিশূদ্র শব্দে কেবল শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তি হইতে পারে না। আর তাহা যদি হয়, তবে শূদ্র পিতামাতার সন্তান যদি ব্রাহ্মণানুকূল স্বভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে তাহাকে আচার্য্য বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই, বলিতে হইবে। যেখানে জাতি অর্থাৎ জন্ম শূদ্রের অর্থাৎ শূদ্রাচারীর বিশেষণ হয়, সেখানেই জাতি-শূদ্র হয়। অতএব আচার্য্যের মত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় না। আজকাল কোন কোন পণ্ডিত জাতিব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ এবং জাতিশূদ্র ও শূদ্র—এই বিভাগরক্ষার্থ জাতি বা বর্ণকে আত্মগত ও শরীরগত বলেন। সুতরাং জাতিশূদ্রতা শরীরগত ধর্ম্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। এ মতটি ঠিক্ নহে। কারণ, আত্মগত বর্ণ থাকিতে পারে না, উহা উপাধিরই হয়। সেই উপাধি—কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে ত্রিবিধ। অতএব আত্মগত বর্ণতা স্বীকার অসঙ্গত হয়। তাহার পর আত্মাই যদি শূদ্রাদি হয়, তাহা হইলে মুক্তিতেও কি ভেদ থাকিবে না? অতএব এই মতটি নিতান্ত হেয়। এ বিষয় অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

# দ্বন্দ্ব ও মুক্তি

যোজনব্যাপী বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, চতুঃপার্শ্বস্থ অন্যান্য বৃক্ষরাজিকে উপেক্ষা করিয়া সুবৃহৎ বটবৃক্ষ উন্নতশিরে ধরাপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, অনন্তকাল ধরিয়া ঐ ভাবে সদর্পে বর্ত্তমান থাকিবার ইচ্ছা তাহার ভিতর সদা জাগরূক। নিজ শরীরের সমস্ত সঞ্চিত রস শাখাগ্রে আনয়ন করিয়া অনেকগুলি ফলের সৃজন করিল, ফল পাকিল, ভূমিতে পড়িয়া বীজ হইতে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর পৃথিবীর বক্ষভেদ করিয়া সদর্পে দাঁড়াইল। লক্ষ্য করিলে ঐ শিশুবৃক্ষে ও তাহার জন্মদাতার সাহস ও গর্ব্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই শিশুবৃক্ষ কালক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আপনার প্রাপ্য চাহিয়া লইতে আরম্ভ করিল—সে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়াইতে লাগিল, শেষে একস্থানে পিতা পুত্রের বাস অসম্ভব হইয়া উঠাতে নূতন বৃক্ষটি তাহার জন্মদাতা মহা বটবৃক্ষের ধ্বংস সাধন করিল। পুরাতনের ধ্বংসে নবীনের প্রতিষ্ঠা, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

নদীতীরে একটি হরিণ পানার্থ উপস্থিত। নদীর স্থির জলে সে তাহার বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত মস্তক ও সুন্দর পরিপুষ্ট বলশালী দেহ দেখিয়া অপার উল্লাসে লম্ফ দিয়া অতি কোমল শ্যামল তৃণরাজিকে নষ্ট করিতে লাগিল। বুদ্ধিবৃত্তি বিরহিত বলদৃপ্ত হরিণ তাহার সুন্দর দেহ-নির্ম্মাতা তৃণগুলিকে নিজ মদগর্ব্বের আনন্দে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। ধ্বংস-লীলার ইহা আর এক অভিব্যক্তি।

বহু পরিজন সমাবৃত ধনীর গৃহে নবজাত শিশুর আগমনে পিতা, মাতা, আত্মীয় পরিজন এমন কি দাস দাসীর পর্য্যন্ত আনন্দের অবধি নাই। প্রতিবেশিবর্গ গৃহকর্ত্তাকে তাঁহাদের আনন্দ জানাইতে আসিলেন—সদ্যজাত শিশুর গৃহ আশীষবাক্যে মুখরিত ও উপহার-দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শিশুর কলহাস্য ও নয়নানন্দকারী রূপ সকলের শ্রবণের ও দর্শনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে

শিশু তাহার জন্মগত সংস্কারের পরিচয় দিতে লাগিল ও পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সংস্কারের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিল। আমাদের এই শিশুটির নামকরণ হইল 'বেণী'। বেণী বড় হইতে লাগিল, সঙ্গীরা বলিল—'দুষ্টু', মা বলিলেন—'লক্ষ্মী ছাড়া', পিতা বলিলেন—'অসভ্য', পল্লীস্থ ভদ্রলোকেরা বলিলেন—'বজ্জাত'। বাল্যে স্বগৃহে আসবাব পত্র ধ্বংস করিল. কৈশোরে পল্লীস্থ বালক বালিকাকে অকারণ প্রহার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল, যৌবনে পরিপূর্ণ দেহ-মন লইয়া অপরের সর্ব্ববিধ উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সদসৎ উপায়ে প্রতিবেশীর অপকার সাধনে কটিবদ্ধ হইল, প্রৌঢ়াবস্থায় শারীরিক বলাভাবে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া মামলা প্রতারণা জালিয়াতি করিয়া পল্লীর শত্রু হইয়া উঠিল, বার্দ্ধক্যে শরীর-মন উভয়ই জরাগ্রস্ত বলহীন হইলেও গালা-গালি দিয়া ও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া সকলকে ধ্বংসমুখে প্রেরণের জন্য সচেষ্ট হইল। ধ্বংস-লীলার কি বিচিত্র ইতিহাস!

মানব-জগতে যেমন 'বেণী' আছে, তেমনই 'সুশীল'ও আছে; ইহাদের মধ্যে কাহার সংখ্যা অধিক তাহা স্রষ্টা ব্যতিবেকে অন্য কেহই বলিতে পারেন না। একই অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুশীলও শরীর-মনের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। বাল্যে সে, সঙ্গী দুষ্ট বালকের মনের অপরিণত চপলবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, কৈশোরে সহপাঠিদিগের সহজ কুকার্য্য কুবচন ও কুচিন্তায় বাধা দিতে লাগিল, যৌবনে পল্লীর ও স্বদেশের দুরবস্থা নাশে সচেষ্ট হইল, প্রৌঢ়ে তাহার দৈহিক বলাভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিল এবং বুঝিল যে জগতের সমস্ত কু ধ্বংসাপেক্ষা নিজ স্বভাবে সঞ্চিত সদা সর্ব্বদা পীড়াদায়ক অশুভ সংস্কাররাজির সন্ধান লইয়া একটির পর অন্যটির আমূল বিনাশে যত্ন লইলে অধিক উপকার হইবে। বার্দ্ধক্যে এই বুদ্ধি পরিণতি লাভ করিল, তাহার এতদিনের প্রিয় জগৎ, প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন আর আনন্দ দান করে না, সে মনের রাজ্য বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। এতদিন তাহার কাছে যাহা অতি নিকট ছিল তাহাকে দূরে সরাইয়া অতিদূরকে সন্নিকট বলিয়া জানিতে শিখিল, তাহার নিজ আত্মাকে আনন্দময় বলিয়া চিনিয়া

লইতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু এখানেও আমরা দ্বন্দ্বের, ধ্বংসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলাম।

উদ্ভিদ্-জগতে ধ্বংসের ইতিহাসের মূলকথা আত্মপ্রতিষ্ঠা, পশু-জগতে ইহার পরিচয় পাই মদগর্ব্বে ; আর বিধাতার চরমসৃষ্ট প্রাণী মানব, এই ধ্বংসের ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠা, মদগর্ব্ব ব্যতীত অন্যান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। তাহার মধ্যে শুভ হইতেছে পরের দুঃখ দূর করা এবং অশুভ হইতেছে অকারণ হিংসাদ্বেষ। সুতরাং কি উদ্ভিদ্-জগতে, কি বুদ্ধিবৃত্তি বিরহিত প্রাণী-জগতে এবং সর্ব্বশেষে সু এবং কু উভয় ভাবাত্মক মানব জাতি—সকলের মধ্যেই ধ্বংসের ইতিহাস পাইতেছি।

বেণী ও সুশীল মানব-জগতে দুই বিপরীত সৃষ্টি। আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত মনুষ্য দেখিতে পাই তাহারা বেণী ও সুশীল উভয়ের সদসৎ গুণরাশি জড়িত, তবে কাহারও মধ্যে একটি গুণ অপরটি অপেক্ষা অধিক ব্যক্ত। সাধারণ মানব এই জগতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সুখী হইতে চায়, প্রতিষ্ঠা চায় ; সে চায় সবল হইতে, মনের আনন্দে থাকিতে ও যশস্বী হইতে। প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম—অনেকগুলি প্রাণবিশিষ্ট দ্রব্যকে আমূল পরিবর্ত্তিত না করিয়া কিংবা সংহার না করিয়া মানব জীবন ধারণ করিতে পারে না ; মনের আনন্দ লাভ করিতে হইলে অনেক সময়ই অপরের মনকে পীড়া দিতে হয়, প্রতিষ্ঠা বা যশ লাভ করিতে হইলে অপরের যশোবীর্য্য খর্ব্ব করিতেই হইবে। মোট কথা, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, অপরের কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ না করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করা সাংসারিক হিসাবে অসম্ভব। সুখ ও দুঃখ একই অনুভূতির বিপরীত দিক, যখন সুখের চিন্তার আধিক্য হয় তখন দুঃখানুভূতি কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে, আবার যখন দুঃখের আধিক্য হয় তখন সুখ কল্পনার বস্তু বলিয়া মনে হয়। দুঃখ ও সুখের ন্যায় প্রলয় ও ধ্বংসের দ্বন্দ্ব পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া চলিতেছে, ধ্বংস ব্যতীত যেমন সৃষ্টির চিন্তা অসম্ভব তেমনই সৃষ্টি ব্যতিরেকে ধ্বংস-চিন্তা চলে না। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এমন অনেক দার্শনিক ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও আছেন যাঁহারা কোনরূপ ধ্বংস-চিন্তা কল্পনায় পর্য্যন্ত আনিতে

রাজী নহেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, চলুক আনন্দের হাট অবিচ্ছিন্ন ভাবে মহোল্লাসে মহানন্দে—কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া; কোনরূপ বিয়োগ কোনরূপ পরিবর্ত্তন তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না—যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকে যযাতির ন্যায় অনন্ত যৌবন ও অনন্ত বাধাহীন ভোগেচ্ছার উপায় করিতেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে বৃন্দাবনের মধুরলীলা ব্যতিরেক অন্য কোন আচরণ, কোন লীলা কল্পনায় আনিতেও বিভীষিকা দেখেন এবং মধুর ভাব চিন্তা করিতে করিতে ভাবে গদ গদ হইয়া অনেকরূপ অমানুষিক আচরণ করেন, কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি, দ্বারকার কালযবনাদির ধ্বংস-কারী, মহারাজ্য স্থাপনকারী পরিশেষে নিজবংশে পাপ প্রবেশ করিলে সেই মহা যদুবংশকে নির্ম্মম ভাবে নষ্টকারী শ্রীকৃষ্ণ-জীবন যাঁহারা পাঠ মাত্র করেন—সেই বিরোধ অনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণও যখন তাঁহাদের মন্দিরাদি কোন কারণে অপবিত্র হয় তখন নিজেদের সহজ শান্ত আচরণ বিস্মৃত হইয়া লগুড়াদি ধারণ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র বিলম্ব করেন না। সেই পুণ্যকীর্ত্তি জিনরাজ মহাবীরের মতানুযায়ী জৈনগণ—যাঁহাদের ধর্ম্মের মূল কথা 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম', যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার জীবের সেবা করেন, যাঁহারা জীবের সামান্য কষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া নানারূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন এবং নিজ শরীরকে নিয়ত নিগ্রহ করেন, সেই সর্ব্ব প্রকার 'নির্ব্বিরোধের' প্রচারকারী ও আচরণকারিগণও বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক 'জমিন জরুর' ধ্বংস ও অমর্য্যাদায় চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া নানা উপায়ে বাধা দেন; এমন কি ভগবান্ বুদ্ধের প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণকারিগণের মধ্যেও যখন নানারূপ যুদ্ধ ও বিবাদাদির সংবাদ আমরা পাই তখন আমরা ধ্বংস-চিন্তা অবশ্য সম্ভব এই কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

তবে সকল ধর্ম্মেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও মানব জাতির আদর্শ স্থানীয়: সেই অতি-মানবেরা যখন এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকালয় পরি-ত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যে বসিয়া, মনের এই দ্বন্দ্ব সমূলে উৎপাটিত

করিয়া শান্ত ভাব পাইতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহারা মানসিক রাজ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ করেন তাহার তুলনায় এ জাগতিক যুদ্ধ অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের কঠোর সাধন সকলের পক্ষে সম্ভব না হইলেও তাহাই একমাত্র সমীচীন পন্থা বলিয়া মনে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না মানব সেই সচ্চিদানন্দময় আত্মার সন্ধান পাইতেছেন, যতদিন না তিনি জানিতে পারিতেছেন, তিনি অজঃ শাশ্বত বিশুদ্ধ ও সর্ব্ব প্রকার দ্বৈত ভাবের অতীত ততদিন এই বিরোধ, এই ধ্বংস ও সৃষ্টি, এই প্রলয়ের চিন্তায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ এবং সৃজনের আশায় নীরব সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত উল্লাস, ইহার পারে যাওয়া—মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মানব সেই মহানন্দময় শান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়া জানিতে পারে ও বলে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

ব্যষ্টি মানব এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে চাহিলে আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু সাধারণ মানব এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারেন না এবং চাহেনও না, তাঁহারা এই জগতেই সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন। জগতে যদি কোন দিন এমন সম্ভব হয় যে, জগতের প্রত্যেকে এককালে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে তখন এই দ্বৈতভাবাত্মক জগৎ এককালে বিলীন হইয়া যাইবে; কিন্তু এমন অবস্থা যে কোন দিন হইবে তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "স ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।"

আমরা সাধারণ ভাবে দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি ধ্বংস ও সৃষ্টি অনিবার্য্য। সৃষ্টি আমাদের মনে বাথা দেয় না, কিন্তু ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড, বিরাট যুদ্ধ, দেশের পর দেশের সমূল—কোনরূপ চিহ্ন না রাখিয়া বিনাশ, আর্ত্তের গগনবিদারী ক্রন্দন, স্বেচ্ছাচারীর দুর্ম্মদ বাসনার কোপে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকুল আর্ত্তনাদ, পবিত্র মসজিদ

ও মন্দিরাদির ধ্বংস, পৈশাচিক গুপ্ত হত্যা, মাতৃজাতির অবমাননা ও অন্যান্য মহাগর্হিত কার্য্য সকলেরই মনে বিক্ষোভ আনয়ন করে; সকলেই ভাবে এই অনর্থময় অনাচারের কি কোন প্রতিকার নাই? বিজন অরণ্যে গিয়া, সভ্য জগতের মহা সভ্যতার মুখে মসী লেপন পূর্ব্বক (?) সমস্ত আনন্দময় বন্ধন ত্যাগ করিয়া যে সমস্যার সমাধান হয় তাহাকে অতি-মানবের বা দেব-মানবের কীর্ত্তি—যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আচরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও অনুকরণ দুঃসাধ্য। কিন্তু, সাধারণ মানব ইহার কি করিতে পারেন—ইহাই প্রশ্ন।

প্রতিকার আছে—যদিও সে উপায়ে সুখ ও শান্তি চিরস্থায়ী হয় না, তথাপি কিছুদিনের জন্য তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি আনয়ন করে। মানব যদি কিছু দিনের জন্য নিজের স্বার্থ, নিজের অদম্য ভোগেচ্ছা কমায়, যদি তাহার মমত্ব বুদ্ধি খর্ব্ব করে, সে যদি তাহার 'আমার'টিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে, তবে বোধ হয় কিছুদিনের জন্য তাহার দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়। মানব, সমাজবদ্ধ জীব—প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। মানব যদি তাহার ভালবাসা নিজ শরীর নিজ পরিবার হইতে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া ক্রমে স্বগ্রাম, স্বদেশ শেষে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মীতে আরোপ করে, যদি সে ব্যথার ব্যথী হয়, পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, পরের সেবা করিতে নিজ স্বার্থ বলি দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ না করে, তবেই কিয়দ্দিনের জন্য এ জগতে শান্তির প্রয়াস, শান্তির আশা সম্ভব হয়—অন্যথা নহে।

—বিজয়ানন্দ।

# ভুল

মনের বনের মাঝারে আজি গো
পাপিয়া গেয়েছে গান।
আমি, সন্ধ্যা কুসুমে ভরিয়া আঁচলি,
দিয়াছি তোমার চরণে কাঁচলি,
এখনও কুসুম মাঝারে ভ্রমরা
তুলিছে তরল তান।
আমি, ভেবেছিনু বন হতে মোর
বসন্ত গেছে চলিয়া
আমি, ভেবেছিনু সব কথা বুঝি
গিয়াছ আমারে বলিয়া
আমি, সকাল সন্ধ্যা ঘুরিয়া ঘুরিয়া
দেখেছিনু, মম হৃদয় পূরিয়া
তোমার শেষের চরণ রেখা গো
ভরিয়া রয়েছে প্রাণ।
দোয়েল, কোকিল, শ্যামা ও পাপিয়া
চলে গেছে বুঝি সবে
শ্যামল কুঞ্জ ভেবেছিনু বুঝি
হরিত বরণ হবে,
নয়ন পলকে আমারি কুঞ্জ
ভরিয়া দিয়াছে কুসুম পুঞ্জ
অমল কমল সমান তোমার
মানসে ফুটিছে গান।

শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস।

# সমালোচনা

সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাস রামায়ণ—মূল্য ৪৲ টাকা। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ কর্তৃক সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত। প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এস-সি। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণের সম্পাদিত রামায়ণ হইতে এই নব প্রকাশিত গ্রন্থখানির বিশেষত্ব আছে। কবিভূষণ ইহাতে কয়েকটি নূতন জিনিস সংযোগ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। প্রথম—মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান, জন্মসময়, বংশপরিচয় ও জীবন-চরিত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; দ্বিতীয়—রামায়ণ রচনার কাল নিরূপিত হইয়াছে; তৃতীয়—বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাস-রামায়ণের যে যে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, সেই সমস্ত অংশের উপাদান সমূহ অনেক স্থলে 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ', 'জৈমিনি ভারত' 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; চতুর্থ—কবিভূষণ মহাশয় কৃত্তিবাসের ভাব, ভাষা, ছন্দঃ, অলঙ্কারজ্ঞান, অনুপ্রাস, বর্ণবিন্যাস ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; পঞ্চম—কেরি সাহেবের উদ্যোগে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাস-রামায়ণ যখন প্রথম সম্পাদন করেন তখন বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার তাৎকালিক রুচি অনুযায়ী তিনি মূল গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় হস্তলিখিত পুঁথি হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া তৎসম্পাদিত রামায়ণে উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন; ষষ্ঠ—পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস রামায়ণের ভূগোল-তত্ত্ব লিখিয়া দিয়াছেন; তাহা ছাড়া

একটি মানচিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রমণপথ, ভরতের ভ্রমণপথ এবং ভরতকে আনিতে দূতের ভ্রমণপথ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষার যেরূপ আদি কবি, কৃত্তিবাস বাংলা ভাষার তদ্রূপ আদি কবি। ব্রহ্মবিগলিত করুণা ধারা গোমুখীর মুখে যেমন পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর কবিত্ব, মাধুর্য্য ও সাধনা তেমনি কৃত্তিবাসের লেখনী-মুখে প্রথম মহাকাব্যের মনোহারী রূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী জানিত না,—তাহার এত ভাব আছে, এত ছন্দঃ আছে, এত কবিত্ব আছে এবং সেই কবিত্ব প্রকাশ করিবারও এত শক্তি আছে, মহাকবি কৃত্তিবাস-ই বাঙ্গালীর সেই ভাবের ফোয়ারার মুখ প্রথম খুলিয়া দেন। সেই দিন হইতে উহা নব নব প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া অনন্ত ধারায় পৃথিবীর বুকে আজ অফুরন্ত অমৃতের রস ঢালিয়া দিতেছে। স্বর্গীয় সার অশুতোষ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন,—"মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টি-কৌশলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর আজ পর্য্যন্ত যত কবি বঙ্গবাণীর পাদপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণ-রূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত।"

পুস্তকের কাগজ, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

SWAMI VIVEKANANDA ON RELIGION AND PHILOSOPHY—First Part; Price Twelve annas. Compiled by Swami Nirvedananda.

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী হইতে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে মূল্যবান কথাগুলি স্বামী নির্ব্বেদানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। আশা করি, বাংলা ও বাংলার বাহিরে পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে।

অভয় আশ্রম—তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। কুমিল্লা—

অভয় আশ্রমের রিপোর্ট দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক—"মাতৃভূমির সেবার দ্বারাই ভগবান্ লাভ"—এই বাক্যটি। শ্রীভগবান্ অভয় আশ্রমকে 'অভয়' করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বহিরঙ্গ সাধন অতি সুচারুরূপে হইতেছে—আমরা স্বীকার করি, কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধন সম্বন্ধে দৈনন্দিন কার্য্য-বিবরণীতে কোন উল্লেখ নাই। আমাদের বহুকালের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় মানসিক অনুশীলনের দ্বারা ভাবের বিকাশ না হইলে বাহ্য জগতের সেবা শেষে দৈহিক কষ্টে পরিণত হয় এবং প্রেম—যাহা স্বরূপতঃ অতি শুদ্ধ ও সকল সৎ কর্ম্মের প্রেরক তাহা ধীরে ধীরে দেহকে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের 'ইয়ং বেঙ্গলকে' লক্ষ্য করিয়া আমরা বলি, তাঁহারা তাঁহার নিম্নোক্ত বাক্যটি প্রণিধান করুন—"বিদ্যা ও তপস্যার অভাবে সকল সম্প্রদায়ের অবনতি হয়," বিদ্যাহীন তপস্যা কায়িক ক্লেশ মাত্র, তপস্যাহীন বিদ্যা উন্মত্ত প্রলাপ।

গত বৎসর অভয় আশ্রম প্রায় ৯০,০০০ টাকার খদ্দর উৎপাদন ও ৭৪৬২০ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই বিভাগে আশ্রমের মূলধন ১১০০২।৯ পাই ছিল, এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কে শতকরা ৯৲ টাকা হার সুদে ১১০৩৷৵, নিখিল-ভারত চরকা-সমিতির ১০০০০ টাকা, বেঙ্গল খাদি বোর্ডের ১০০০ টাকা দেনা আছে।

খদ্দর-বিভাগ ছাড়া আশ্রমের বয়ন, চিকিৎসা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, সমবায় ও কৃষি-বিভাগ আছে।

অভয় আশ্রম সকল দিকেই বাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয় হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

দেওঘর—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের ১৯২৫ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ প্রদত্ত ষাট বিঘা জমির উপর নব নির্ম্মিত নিজস্ব গৃহে বিদ্যাপীঠ স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠ যে পনের-

জন সাধু কর্ম্মী পাইয়াছে তন্মধ্যে দশজন শিক্ষকশ্রেণীভুক্ত এবং এই দশ জনের মধ্যে সাতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছেচল্লিশ জন। শিক্ষার সহিত বালকগণের নৈতিক চরিত্র যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহাদের শিক্ষা কার্য্যকরী হইয়া যাহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে।

বর্ষের প্রারম্ভে সাধারণ-তহবিলে ২০৬৩৵১০ পাই জমা ছিল, ৯০১২৵০১ পাই আরও পাওয়া গিয়াছে, মোট ৯২৫৭৵১০½ পাই খরচ হইয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে গত বর্ষের ৬১০৭৵৬ পাই উদ্বৃত্ত ছিল, আরও ১০৫০৯৷৵১০ পাই পাওয়া গিয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ কল্পে ১৬১০৪/৯ পাই খরচ হইয়াছে।

দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের ভবিষ্যৎ সেবক—বালকগণকে সুশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যে শিক্ষায় মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, যে শিক্ষায় মানুষ প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থাসংঘাতে দমিত না হইয়া আপনার ও অপরের দেবত্বকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করে, যে শিক্ষায় মানুষ দেশকে 'মা' বলিয়া ভাবে কিন্তু বিদেশকে 'পর' মনে করে না, এইরূপ সনাতন ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত, সম্পূর্ণ, অখণ্ড শিক্ষার দেশে বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যাপীঠ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

এই শুভ কার্য্যে যে কোন নরনারী যে কোন উপায়ে নিজেকে জড়িত রাখিবেন তাঁহারই জীবন ধন্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

# আমেরিকায় প্রচারকার্য্য

স্বামী বোধানন্দ, কালিফোর্ণিয়া সহরে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পথে তিনি ওরেগন এবং ওয়াসিংটন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি লস্ এঞ্জেল্স্ পৌঁছিয়া ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস তথায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রালোচনা করেন।

এপ্রিল মাসে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরে আগমন করিয়া স্বামী বোধানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি-মন্দিরে স্বামী প্রকাশানন্দের অতিথিরূপে একমাস ছিলেন। এখানে তিনি চারিটি ক্লাস করেন।

মে মাসে তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো পরিত্যাগ করিয়া স্বামী প্রভবানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পোর্টল্যাণ্ড ওরেগন) বেদান্ত-সমিতিতে আসিয়া তিনটি বক্তৃতা দেন। তৎপরে স্বামী বোধানন্দ সিয়েট্‌ল্ (ওয়াসিংটন) এবং টাকোমা সহরে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি যখন টাকোমাতে তখন স্বামী প্রভবানন্দ দ্বিতীয়বার সিয়েট্‌ল্ আসিয়া থিওসফিকাল লজে এবং চেম্বার্স-অফ-কমার্স অডিটোরিয়ামে চারিটি বক্তৃতা দেন। গতবারের ন্যায় এবারেও বক্তৃতা-গৃহ শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা বেদান্তের বাণী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সকলের অনুরাগ এখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিনা ম্যাকডোনাল্ড।

---

আগামী ২৬শে ভাদ্র, রবিবার, শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের এক-অশীতিতম জন্মোৎসব, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মিত্রের ৫।১।এ নং পাঁচু খানসামা লেনস্থ বাড়ীতে সম্পন্ন হইবে।

---

আশ্বিন, ২৮শ বর্ষ।

# আগমনী

বাংলা-ভবনে আসিছে ভবানী ভাবনা করি না আর,
কোন্ ডালিখানি সাজায়ে বাঙালী দিবে তারে উপহার ?
তণ্ডুলকণা, কদলী দিয়েছ, দিয়েছ নিরীহ ছাগ,
হায় বীরাচারি, এই কি তোমার শক্তি পূজার যাগ ?
ধমনী হইতে শোণিত চিরিয়া এখনো দাও নি তারে,
রণদা আমার শুষ্ক বদনে ফিরে গেছে বারে বারে।
বনের পশু তো মেরেছ অনেক প্রাণের পশুরে ধরি,
মায়ের চরণে দিও উপহার 'মাভৈঃ' মন্ত্র পড়ি।
রক্তবস্ত্র কর পরিধান, রক্ত চাঁদোয়াখানি,
নীল নভোতল ঢাকিয়া দাও রে মাথার উপরে টানি।
হাজার হাজার রক্তজবার গাঁথিয়া রঙিন্ মালা,
গৃহ-লক্ষ্মীর করে তুলে দাও সাজাতে বরণ ডালা।
রক্ত সিঁদুর ঘটে লেপে দাও, লাল চন্দন আর,
দীপ্ত ললাটে এঁকে দাও ওগো রক্ত বারম্বার।

বাহিরে ভুবনে যখনি তাকাবে তখনি হেরিবে তুমি,
মহিষ-মহা-মর্দ্দিনী মাতা আসিছে রঙ্গভূমি !
একই মন্ত্রে সূর্য্য চন্দ্র দীপ্ত তারকাচয়,
ঘোষে যেন ওরে, জগজ্জননী জয় জয় তব জয়।
জয় হে ভক্ত, জয় হে মুক্ত, জয় জয় জননীর ;
জয় জয় আজ বীর বাংলার, এ শ্যামল ধরণীর।

সকল জীবের মাঝারে যে আছে অসীম শক্তি সম,
আজিকার দিনে হে সখা আমার নমো নমঃ তারে নমঃ।
নিখিল জগতে মায়ের রূপেতে চেতনার রূপে আর,
যে দেবী রয়েছে, হে মানব! তারে কর হে নমস্কার।
ধন-জন-যশঃ দেহি দেহি বলি কেঁদোনা শিশুর সম,
বজ্র-বাহুব কঠোরতা মাগি হও কিছু নিরমম!
যৌবন-বর চাহিও এবার রণচণ্ডীর পাশে,
মৃত্যু-মলিন মুখে যেন তোব আবার জীবন হাসে।
শান্তি, শান্তি বলিয়া কাঁদিবে, শান্তি কোথায় তোর?
অন্নহীনের শান্তি যেন রে নিশীথের ঘুমঘোব!
চণ্ডীর কাছে বলিও এবার নাও, এ শান্তি নাও,
ভাবী অশুভেব ছায়া-বিভীষিকা বারেক দেখায়ে যাও।
এ দুখের ভয় এ সুখের আশা, এ মোহ দাও রে ডালি,
দুর্গাপূজার যজ্ঞ-আগুনে দাওরে আগুন জ্বালি।
এস তবে আজ হাজার কণ্ঠে বিজয় মন্ত্র পড়ি,
দীপ্তা রাগিণী জননীব মোরা শুভ আহ্বান করি।

রক্তবরণা সন্ধ্যা লগনে এস মা চণ্ডী এস,
আনন্দে মোরা বন্দনা করি পরিয়া বক্তবেশ।
অলক্ত রাগে সিক্ত করিয়া চরণ দুখানি তোর,
বঙ্গভূমির অঙ্গে অঙ্গে আঁক সে চিহ্ন ঘোর।
নাশ মা হৃদয়-মত্ত-অসুরে তার সে কাঁদন-সুর,
তোমার চরণ-নূপুবের মত বাজে যেন দূব দুর।
ভ্রূকুটি-কুটিল-ললাট ফলক ফাটিয়া আজিকে তোর,
হাসিয়া উঠুক ভীষণা করালী রক্ত-নয়না ঘোর।
কোথা বৈষ্ণবীচক্র মা তোর হিংসার বিষভরা?
রক্তদন্ত বিকশিত হাসি কোথা প্রলয়ঙ্করা?
অম্বর-পথে অম্বিকা ওঠ ত্র্যম্বক তোর পায়,
মূর্চ্ছিত হয়ে শক্তির তরে আশ্রয় যেন চায়।

গলেতে মুণ্ড, করেতে মুণ্ড, চরণে মুণ্ড পরি ;
আয় চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী হেরিয়া নৃত্য করি।
শোণিত-বসনা, সলোল রসনা ভীম দরশনা মাগো,
মহাসন্ধির সন্ধির ক্ষণে ভৈরবীরূপে জাগো।
সেদ্ধত লক্ষ্মী বাঘবের মত আজি বাংলার জন,
উৎসাহ-ভরে করিছে তোমার অকাল উদ্বোধন।
ধর্ম্ম গিয়াছে, বীর্য্য গিয়াছে শৌর্য্য গিয়াছে সব,
হে মহাশক্তি, মোরা তাই করি তোমার মহোৎসব।

ভয়ে কালো মেঘ সাদা হয়ে গেছে রণদা আসিবে বলি'
কোমল শিউলি শিহরি উঠিছে, ফাটিয়া পড়িছে কলি।
গৈরিকরূপী গঙ্গা ছুটিছে, পদ্মা ভীষণা বেগে
তরঙ্গ নাদে চলিছে,—যমুনা মহাসিন্ধুর লেগে।
ব্রহ্মনদের মর্ম্মে লেগেছে কম্প-রাগের বান,
মহাবেগময়ী মেঘনা ধ্বনিছে ভীম-যৌবন-গান।
রুদ্রদেবের ধারা আসিতেছে হিম নীর বুক চিরি,
নবীন যুগের ভাবের বন্যা রোধিবে যে কোন গিরি ?
মহা-যৌবনা-যোগিনী আসিছে কাঁপিছে কাশের বন,
আজি বাংলার ঘরে ঘরে হবে যৌবন বিতরণ।
কোটি কোটি ছেলে লুটে নিয়ে যাও আশীষের ভরা ডালি
মায়ের প্রসাদে বিবাদ ঘুচায়ে দাও, দাও করতালি।
যৌবন জয় হবে নিশ্চয় করিও না ভয় আর,
ভবানীর হাতে দেখেছি এবার ভয়হরা তরবার।
আজ হতে মোরা তরুণের দল তোমার পূজারী হব
দশ প্রহরিণী মায়ের আশীষ কোটী শিরপাতি লব।
নীল আকাশের তলেতে আবার শান্তি পতাকা তুলি,
ধর্ম্মের বলে হবো বলীয়ান্ সকল বিভেদ ভুলি।
এ নহে শুধুই ভাষার গাঁথুনি শুধুই কাব্য-কথা,
জীবনে মরণে মিশান রবে যে ভারতের জয়গাথা।
এস তবে আজ হাজার কণ্ঠে বিজয় মন্ত্র পড়ি,
জগজ্জননী ভবানীর মোরা শুভ আহ্বান করি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

# শ্রীশ্রীমায়ের কথা

## ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কি ভাবে জীবন যাপন করবো ?'

মা বলিলেন, "যেমন করছো ঐ ভাবেই কাটিয়ে যাও। তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করবে। সদাসর্ব্বদা স্মরণ মনন রাখবে।"

আমি—"বড় বড় মহাপুরুষদেরই পতন হয় দেখে মনে বড় ভয় হয়, মা।"

মা—"ভোগের জিনিষ সব নিয়ে থাকলে তার ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে বাবা, কাঠের যদি মেয়েমানুষ হয়, তবু সেদিকে চাইবে না—সেদিক দিয়ে যাবে না।"

আমি—"মানুষ ত কিছুই করতে পারে না, তিনিই ত সব করাচ্ছেন।"

মা—"তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে ত হয় ? লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।"

তারপর জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর বল্‌তেন—'সাধু সাবধান !' সাধুর সর্ব্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্ব্বদা সাবধানে থাকবে। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্ব্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা ? সাধু, মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগ্‌লসের মত তাকে রক্ষা করে। কেউ তাকে মারতে পারে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

"মন্দ কাজে মন সর্ব্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলস্য বশতঃ করলুম না। তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ্ চাই। যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠ্‌তো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম—'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' নবতে থাকবার সময় ঠাকুর এমন কি রামলালকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতেন, রামলাল তো ভাসুরপো হয়! এখন ত সকলের সঙ্গে কথা কই, সামনে বেরোই।

"তুমি কলকাতার ছেলে, ইচ্ছা করলে বিয়ে করে সংসার করতে পারতে—সে সব যখন ত্যাগ করেছ আবার সেদিকে লক্ষ্য করছো কেন? থুথু ফেলে আবার সেই থুথু ঘাঁটা?"

* * *

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আসন প্রাণায়াম করা কি ভাল?"

মা—"আসন প্রাণায়াম করলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।"

আমি—"সাধুর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভাল?"

মা—"মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?"

আমি—"মা, ধ্যান হয় না। কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে দিন।"

মা—"জাগবে বই কি? একটু ধ্যান জপ করলেই জাগবে। আপনিই কি আর জাগে? ধ্যান জপ কর। ধ্যান করতে করতে মন এমন স্থির হয়ে যাবে যে, ধ্যান আর ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। যেদিন ধ্যান না হবে, জোর করে ধ্যান করবার আবশ্যক নেই—সেদিন প্রণাম করেই উঠ্‌বে। যেদিন হবে আপনিই হবে।

"উদ্বোধন"—৫ই আষাঢ়, ১৯-৬-১২

আমি—"মা, মন স্থির হয় না কেন? যখন ভগবানের বিষয় চিন্তা করি, তখন মন নানা বিষয়ে যায়।"

মা—"বিষয় বল্‌তে টাকা কড়ি, পুত্র পরিবার—এই সব বিষয়ে মন যাওয়া খারাপ। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে মন ত যাবেই। ধ্যান না হয় জপ করবে, জপাৎ সিদ্ধি। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে। ধ্যান হল ভাল, না হয় জোর করে ধ্যান করবার দরকার নেই।"

কাশীধাম—২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৯১২

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীতে মঠে থেকে সাধন ভজন করা ভাল, না নির্জ্জনে সাধন ভজন করা ভাল?"

মা বলিলেন, "নির্জ্জনে হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন ভজন করে মন পাকলে তারপর মনকে যেথানেই রাখ, যে লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপই থাকবে। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জ্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।"

আমি—"আমার ত সাধন ভজনের শক্তি নাই, আপনার পাদপদ্ম ধরে পড়ে আছি যা হয় করুন।"

মা হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ঠাকুর তোমার সন্ন্যাস রক্ষা করুন। তিনি দেখছেন তোমার ভয় কি? ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।"

কাশীধাম—১৭ই পৌষ

আমি—"কিরূপ ভাবে কিরূপ স্থানে গিয়ে সাধন ভজন করতে হবে?"

মা—"কাশী তোমাদের স্থান। সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে।"

আমি -"অনুরাগ না থাকলে শুধু নাম জপ করলে কি হবে?"

মা—"জলেতে ইচ্ছা করেই পড় আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি না? ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্ব্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।"

আমি—"জীবনের উদ্দেশ্য কি?"

মা—"ভগবান লাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মগ্ন হয়ে থাকা। তোমরা সন্ন্যাসী, তাঁর লোক। তোমাদের ইহকাল পরকাল তিনিই দেখছেন। তোমাদের ভাবনা কি? সর্ব্বদা কি ভগবানের চিন্তা করতে পারা যায়? কখনো বেড়াবে, কখনো তাঁর চিন্তা করবে।"

কাশীধাম—১০ই পৌষ, বুধবার

মা—"সাধুর রাগ দ্বেষ থাকবে না। সব সহ্য করা সাধুর দরকার। হৃদয়কে ঠাকুর বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি—আমি তোর কথা সহ্য করবো, তবে হবে, তা না হলে খাজাঞ্চীকে ডাকতে হবে'।"

কাশীধাম—১৩শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার, বেলা ৯॥ টা

মা—"ঠাকুর আমাকে বলতেন, 'একটু একটু বেড়াবে। না হলে শরীর খারাপ হবে।' আমি তখন নবতে থাকতুম। ভোর চারটায় গঙ্গাস্নান করে ঘরে ঢুকতুম। একদিন ঠাকুর আমায় বল্লেন, 'আজ একজন ভৈরবী আসবে। তার জন্যে একখানি কাপড় ছুপিয়ে রাখবে, তাকে দিতে হবে।' ঐদিন কালীঘরের ভোগ রাগের পর ভৈরবী আসিলে ঠাকুর তার সঙ্গে নানা কথা কইতে লাগলেন। সে ভৈরবীটি

একটু মাথা গরম ছিল। সে আমায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করতো। কখনো কখনো আমায় বল্‌তো, 'তুই আমার জন্যে পান্তা ভাত রাখবি। না রাখিস ত তোকে ত্রিশূলে করে মেরে রেখে যাব।' শুনে আমার ভয় হতো। ঠাকুর বল্‌তেন, 'তোমার ভয় নেই, ও ঠিক ঠিক ভৈরবী, সেজন্যে একটু মাথা গরম।' কখনো কখনো এত ভিক্ষা করে আনতো যে সাত আট দিন চলতো। তাতে খাজাঞ্চী বল্‌তেন, 'মা তুমি কেন বাইরে ভিক্ষায় যাও, এখানেই নিতে পার।' সে বল্‌তো, 'তুই আমার কাল্‌নেমি মামা, তোর কথায় বিশ্বাস কি?' ঠাকুরের সাধন অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিষ দেখে তিনি জড় সড় হতেন। সে সব প্রলোভনের জিনিষ তিনি চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তার নিকটে এল। তিনি তাতে চিন্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হল? তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানস-পুত্ররূপে ব্রজের রাখাল আসবে। যখন রাখাল এলো তখন তিনি বল্‌লেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। তোমার নামটি কি বল দেখি?'—'রাখাল।'—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি।

"ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র রাখাল, এ সবের জন্যে এত ভাবেন? সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না।' ঠাকুর বল্‌লেন, 'এই ত্যাখ্, ঈশ্বরের ভাবে থাকি'—বলে তাঁর সমাধি হল। দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠ্‌লো। এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন। রামলাল তখন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল। নাম শুনাতে শুনাতে তবে তাঁর চৈতন্য হয়। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বল্‌লেন, 'দেখলি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা। তাই নরেন্দ্র এদের নিয়ে মনকে নীচে নামিয়ে রাখি।' রামলাল বল্‌লে, 'না—আপনি আপনার ভাবেই থাকুন'।"

আমি—"একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করছি—করবো কি?"

মা—"একটু একটু করতে পার, বেশী করে মাথা গরম করা ভাল নয়। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?"

আমি—"কুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হল না।"

মা—"জাগবে বই কি? তাঁর নাম করতে করতে সব হয়ে যাবে। মন স্থির না হলেও ত বসে তাঁর লক্ষ লক্ষ নাম জপ করা যায়। কুণ্ডলিনী জাগবার পূর্ব্বে অনাহত ধ্বনি শোনা যায়। মা জগদম্বার কৃপা না হলে হয় না;" তারপর বলিলেন, "শেষ রাত্রে মনে মনে ভাবছিলুম, বাবা বিশ্বনাথকে বুঝি দর্শন করতে পারব না। ছোট লিঙ্গমূর্ত্তি—আর, যা সব জল বিল্বপত্রে ডুবিয়ে রাখে, বাবাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি কি—কালো কুচ্‌কুচে পাথরের শিবলিঙ্গ—বিশ্বনাথ। নটীর মা, শিবের মাথায় হাত বুলুচ্ছে। আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলুম।"

আমি—"মা, আমাদের আর পাথরের শিবলিঙ্গ ভাল লাগে না।"

মা—"বাবা, কত মহা মহা পাপী কাশীতে আসছে, আর বিশ্বনাথকে স্পর্শ করে উদ্ধার হচ্ছে। তিনি সকলের পাপ নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করছেন।

"শনি-রবিবারে যখন সব লোক এসে প্রণাম করে, তখন পা একেবারে জ্বলতে থাকে। পা ধুয়ে এসে তবে বসতে পারি।"

আমি—"তিনি যদি সকলের বাপ মা, তবে তিনি কেন পাপ করান?"

মা—"তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক—কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।"

### কাশীধাম—১লা জানুয়ারী, ১৯১৭

আমি বলিলাম, "মা, আমার ধ্যান যাতে ভাল হয় ও তাঁতে মগ্ন হয়ে যেতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।" মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন আর বলিলেন, "সর্ব্বদা সদসদ্‌ বিচার করবে।"

আমি—"মা, বসে বসে বিচার করতে পারি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিচার আসে না। তখন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শক্তি দিন, যাতে সে সময় ঠিক থাকতে পারি।"

মা—"বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করবেন।" তারপর বলিলেন, "তোমার জ্ঞান চৈতন্য হোক্।" জনৈক সন্ন্যাসী ভক্তকে মা বলিতেছেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ।"

কোয়ালপাড়া—২৭শে মে, ১৯১৯

আমি—"মা, এতদিন গেল, কি হল ?"

মা—"তিনি সংসারের সব ঝঞ্ঝাট হতে টেনে এনে তাঁর পাদপদ্মে রেখেছেন, এ কি কম ভাগ্য। যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বল্‌তো— 'জপ ধ্যান করি আর না করি, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট নেই।' দেখ না, আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নির্জ্জনে কোন বাগানে কিছুদিন সাধন করতে আমার ইচ্ছা হয়।"

মা—"এই ত করবার সময়। এই বয়সেই করতে হয়। করবে বৈকি ? কিন্তু খাওয়া দাওয়া বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) কঠোর করে করে শেষে বড় কষ্ট পেয়ে শরীর গেল।"

কোয়ালপাড়া—২৯শে মে, ১৯১৯

আমি, "—বাবু আর মঠে আসেন না। আপনার বাড়ীতেও আসেন না। তাঁর কেন এরূপ হল ?

মা—"হাঁ, আমি যখন কলকাতায় ছিলুম তখনও আমার কাছে আসত না।"

আমি—"এত দিনের পুরানো ভক্ত, কেন এরূপ হল ?"

মা—"সব কর্ম্মফল। অনেক জন্মের কর্ম্ম ছিল। শেষে আর থাকতে পারলে না। যে কটা ঢেউ আছে সব কেটে যাবে ত ? এক জন্মে যে মুক্তি হবে।"

আমি—"তাঁর ইচ্ছায় যদি সব হচ্ছে তবে তিনি কাটিয়ে দেন না কেন ?"

মা—"তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি সব কাটিয়ে দিতে পারেন। দেখ না, কর্ম্মের ফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। ঠাকুরের বড় ভাই রাম-কুমার) বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নেন, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলি নি, তুইও তেমনি শেষ সময় কিছু খেতে পাববি নি।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি ত তোমার ভালর জন্যে করেছি, তুমি আমায় শাপ দিলে?' তাতে তিনি কেঁদে বললেন, 'ভাই, কেন আমার মুখ হতে এমন কথা বের হল জানি নে।' দেখ, অসুখের সময় তাঁকেও কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়েছে। কোন জিনিষ খেতে পারতেন না। এরূপ অনেক জন্মের সংস্কারের ফলে এরূপ হয়েছে। দেখ না, আ—র কি হল? কোথা হতে যে কি হয়, বুঝতে পারা মুস্কিল।"

কোয়ালপাড়া ৫ঠা জুন, ১৯১৯

আমি—"মা, সংখ্যা রেখে জপ করবো কি?"

মা—"সংখ্যা রেখে জপ করলে সংখ্যার দিকেই লক্ষ্য থাকে। এমনি জপ করবে।"

আমি—"জপ করতে করতে মন কেন তাতে মগ্ন হয় না?"

মা—"করতে করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপ শিখার মত। বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনা বাসনা থাকলে মন স্থির হয় না। ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে দেরী হয়। একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণী-নাথায়।' সে 'রুকু' 'রুকু' জপ করতো। সেজন্য তাকে কিছুদিন ঠেক্‌তে হয়েছিল। পরে আবার তাঁর কৃপায় সে ঠিক মন্ত্র পায়।"

কোয়ালপাড়া—১২ই জুন, ১৯১৯

আমি—"কিছুদিন হল আসন অভ্যাস করছি—শরীর ভাল থাকবার জন্যে। এই আসন অভ্যাস করলে হজম হয় ও ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে।"

মা—"শরীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে শরীর খারাপ হয়, এই বুঝে করবে।"

আমি—"মা, আমি পাঁচ দশ মিনিট করি, ভাল হজম হবার জন্যে।"

মা—"তা করবে। কোন ব্যায়াম করে ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয় তাই বল্‌ছিলুম। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, চৈতন্য হোক্।"

শ্রী—

---

# ট্র্যাপ্

( ১ )

সুরেশ আবাল্য সহরে কাটাইয়া তেইশ বৎসর বয়সে যখন স্থায়ী ভাবে পল্লি-বাসের জন্য গ্রামে আসিল তখন পল্লির মাঠ ঘাট, নদী খাল, বন বাগান, আকাশ বাতাস সবই এক সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য লইয়া, তাহার চোখের সন্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুরেশ পূর্ব্বে জানিত না, অবারিত মাঠ এত উদার, নদীর জল এত নির্ম্মল, পাখীর গান এত মধুর, আকাশের নক্ষত্র এত উজ্জ্বল। বাল্যকালে কখনো কখনো সুরেশ তাহার বাপ মায়ের সহিত দেশে আসিত, কিন্তু পল্লি তাহাকে আর কখনো তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই বরং গ্রামের সজীব নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া সহরের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিত।

সুরেশের বাবা নিখিলচন্দ্র রায় ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার কলিকাতার বাসায় সুরেশ মায়ের কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। থার্ড ইয়ারে পড়িবার সময় সুরেশের বাবা রাজসাহীতে মারা যান, এক বৎসর পরে মাও তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

গাছের উপর বজ্রাঘাত হইলে বাহিরে সে যেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ভিতর যেমন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তেমনি এই দুইটি অশনিপাত সুরেশের বক্ষপঞ্জর দগ্ধ করিয়া যেন তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইবার জন্য তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

বি-এ পরীক্ষা দিবার মত মনের অবস্থা সুরেশের ছিল না, তথাপি বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পরীক্ষা দিতে হইল এবং পাশও করিল, তারপর কিছুদিন লক্ষহীন ভাবে এখানে ওখানে ঘুরিয়া সুরেশ তাহার পিতার জন্মভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইল। পল্লিগ্রাম তাহার কোনদিনই ভাল লাগে নাই এখনো না লাগিবারই কথা, কিন্তু বাড়ীর প্রত্যেক রেণুতে সে যেন তাহার পিতামাতার চরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইল; সে অনুভব করিল—বায়ুস্তরে সঞ্চিত পিতামাতার নিশ্বাস যেন প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। সুরেশ ভাবিল, এইখানে—তাহার পিতামাতার স্মৃতি বিজড়িত এই পল্লি-ক্রোড়েই সে আজীবন কাটাইয়া দিবে, সহরের চঞ্চল ক্ষুব্ধ আবহাওয়ার সহিত আর কোন সংশ্রব রাখিবে না।

সুরেশের দিদি বিধবা হইয়া এইখানেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা লীলা মায়ের কাছেই থাকিত। দিদি তাঁহার ছোট ভাইকে আশীর্ব্বাদের অশ্রুধারায় প্লাবিত করিয়া গ্রহণ করিলেন; লীলাও নিত্য নূতন আবদারে, অভিমানে, স্নেহে, দুষ্টুমিতে তাহার শোকের অনেকখানি অংশ ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে মুছিয়া দিল। যখন চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিবার মত, সকলের সহিত ভাল করিয়া মিশিবার মত অবস্থা সুরেশের হইল তখন দেখিতে পাইল—প্রকৃতির এই উদারতার মধ্যে, গ্রামবাসীর সরলতার আবরণে একটা বিরাট অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা যেন যুগযুগান্ত ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা কাহারো নাই, এমন কি উহা যে পাথরের মত সমাজের বুকের উপর বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে মায়াবীর মন্ত্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাও কেহ বুঝিতে পারিতেছে

না। গ্রামবাসীদের শিক্ষা নাই, বুদ্ধির সংস্কার নাই, হৃদয়ের প্রসারতা নাই, কতকগুলো প্রাচীন বিকৃত নিয়মকানুন যন্ত্রের মত মানিয়া চলে, একদিন যাহা সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল আজ তাহাই যে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতেছে ইহা বুঝাইয়া দিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না।

জনসাধারণের এই অজ্ঞতা, এই সঙ্কীর্ণতা সুরেশকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। সুশিক্ষা পাইলে হয় তো তাহারা মানুষ হইতে পারিবে, জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া সুরেশ তাহাদের বাহির বাটীতে গ্রামের ছোট লোকের ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রথমেই বাধা আসিল তাহার দিদির নিকট হইতে। পড়াইবার বিপক্ষে তিনি নহেন, তবে ছত্রিশ জাতের ছেলে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সুরেশের উপর দিদির বিরূপ হইয়া উঠিবার আরও একটা কারণ ছিল। একদিন তিনি দেখিলেন, লীলা তাহার ঘরে অর্গলবদ্ধ করিয়া বাড়ীর ঝি নেশা কালীর মেয়েকে ও চৌকিদার পুঁটে হাড়ির বিধবা বোনকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইতেছে। ছোট-লোকের মেয়েদের সহিত কন্যাকে মিশিতে দেখিয়া দিদি আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা, এ সব কি হচ্ছে?"

লীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এদের একটু আধটু শেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দিচ্ছি, মা।"

মা বলিলেন, "কেন, কি হবে?"

"কেন মা, এরা জামাটামা তৈরী করে পরবে—বিক্রী করবে।"

একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বিরক্তির সহিত মা বলিলেন, "ছোট-লোকের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তোমার লজ্জা করে না?"

আশ্চর্য্য হইয়া লীলা উত্তর করিল, "কেন? মামাবাবু যে মিশেন।"

লীলার মা কমলা একটু থামিয়া, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "তা হোক্, তুমি মেয়েমানুষ তোমার এসব ভাল নয়।" সেইদিন হইতে

লীলার ছাত্রীরা নিয়মিত আসিত না, তবে কোন কোন দিন সময় বুঝিয়া লীলা তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত, ইহা কমলার অগোচর ছিল না।

বিরুদ্ধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সুরেশের স্কুলে ছাত্র সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। গ্রামের ছোটলোকরা তাহাদেব জীবনে যেন একটা নূতন পথেব সন্ধান পাইল। সুরেশ দেখিল, সুকুমার পুত্রের হাত ধরিয়া পিতাও আসিতেছে, কোন লজ্জা নাই, জ্ঞানেব অন্বেষণে আজ পিতা পুত্রের বিরাট ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া সুরেশের আনন্দে কান্না আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, শিক্ষা পাইবার জন্য যাহাদের এত উৎসাহ তাহারা শত শত বর্ষ ধরিয়া এমন অশিক্ষিত ভাবে, মানুষ হইয়াও পশুর মত পড়িয়া আছে কেন? বোধ হয়, সুযোগ পায় না বলিয়া। সুযোগ পাইলে ইহাদের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হইত যাহাদের জন্য দেশ গর্ব্ব করিতে পারিত। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হইয়া হয় তো এমন কাজ করিয়া বসে যাহার জন্য অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও সে সমাজের চক্ষে একজন হীন চরিত্রের লোক বলিয়া চিরদিন গণ্য হয়। সমাজ অনেক স্থলে লোকের ভাল করিতে পারে না, তাই বলিয়া কেহ মন্দ পথে যাইলে তাহাকে অঙ্কুষ মারিতেও ছাড়ে না।

একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই সুরেশ শুনিল, কালু বাগ্দী পরাণ হালদারের গোলা হইতে ধান চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কালু সুরেশের ছাত্র। একখানা ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, অনাবৃত বিস্তৃত বক্ষে এই যুবক যেদিন সুরেশের কাছে আসিয়া অতি লজ্জায় ও সঙ্কোচের সহিত পড়িবার ইচ্ছা জানাইযাছিল সুরেশ সেদিন নিজের সাধনাকে সার্থক মনে করিয়া আনন্দে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। সে তাহাকে অতি সাহসী, সরল, বিনীত ও আজ্ঞানুবহ যুবক বলিয়াই বরাবর জানিত। সুতরাং চৌয্য অপরাধে প্রিয় ছাত্র ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, আশ্চর্য্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া সুরেশ হালদারদের বাড়ীর দিকে ছুটিল; গিয়া দেখিল একটা বাঁশের খুঁটির সহিত কালু বাঁধা রহিয়াছে।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে কালো কালো ফোলা দাগ, স্থানে স্থানে ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে ; অতিশয় বৃদ্ধা ও রুগ্না তাহার মা হালদার মশায়ের পা জড়াইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কালু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কিন্তু সুরেশকে দেখিয়াই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেশ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে কালু?" কালু অনেকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না। খানিক পরে কান্নাকে কোনরূপে দমিত করিয়া বলিল—গত বছর হালদার মশায়ের জমী সে ভাগে চাষ করিয়াছিল, কিছু ধান হালদার মশায়ের কাছে তাহার পাওনা আছে। ধানের জন্য কয়েকদিন সে আসা-যাওয়া করিতেছে, কিন্তু ধান দেওয়া দূরে থাক্ হালদার মশায় পরন্তু তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অপমানিত হইয়া তাহারও রোক্ বাড়িয়া যায়। যে কোন উপায়ে তাহার ন্যায্য দাবী আদায় করিবে এইরূপ জিদের বশবর্ত্তী হইয়া কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে হালদার মশায়ের গোলা ভাঙ্গিয়া ধান লইয়াছিল। সে চুরি করে নাই, কারণ হালদার মশায়ের চাকর তাহার সামনেই ছিল। তারপর সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আর কিছু সে বলিতে পারিল না, আবার কাঁদিতে লাগিল। বলিবার কোন প্রয়োজনও হইল না, কারণ তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা তো কালুর সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগে লেখাই রহিয়াছে!

কালুকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সুরেশ হালদার মশায়কে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তোমার জন্যেই তো এই সব হচ্ছে, আগে ছোটলোকরা ভদ্রলোকদের রীতিমত মান্য ও ভয় করে চলতো, এখন তোমার প্রশ্রয়ে তাদের ঔদ্ধত্য ভয়ানক বেড়ে গিয়েছে। পথে ঘাটে আমাদের দেখে ছোটলোকরা আগে পথ ছেড়ে দিত, এখন বুক ফুলিয়ে চলে যায়। ছোটলোকদের এ রকম করে আস্কারা দিলে আমাদের গ্রামে বাস করা দুষ্কর হয়ে উঠবে" ইত্যাদি অনেক উপদেশ হালদার মশায় সুরেশকে দিতে লাগিলেন। কোন ফল হইবার আশা নাই দেখিয়া সুরেশ চলিয়া আসিল, কিন্তু

কনিষ্ঠ ভায়ের মত কালুকে এই নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থার মধ্যে ছাড়িয়া আসিতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

এমন সময় নিকটস্থ মাণিকপুরের জমীদারী-সেরেস্তার নায়েব যতীশ ঘোষাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হালদার মশায়ের মুখে সুরেশের আচরণের কথা শুনিয়া বলিল, "দেখ হালদার, আমি 'ন্যায়' পড়ে তবে নায়েবীতে ঢুকেছি, বুদ্ধি আমার কাছ থেকে নাও। অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি তাই—বল্‌ছি। যদি বল, তবে এক চালে ছোঁড়াকে মাৎ করে দি, জান ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে গেলে আমার আপনও নেই, পরও নেই। আমার দূর সম্পর্কের এক বিধবা আত্মীয়া ছিল। তাকে বল্লুম—তোর গহনাগুলো আমার কাছে গচ্ছিত রাখ্, আর তুই কাশীবাসী হয়ে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্, চিরকালই কি সংসার সংসার করবি? কোন ভাবনা নেই তোর—আমি তোকে মাসহারা পাঠাব। তা শুনলে না—তাই তার স্বভাবের দোষ দিয়ে দিলুম একটা বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে বারোয়ারী তলায়। আর যাবে কোথায়—সেই কাশীই যেতে হল, গহনাগাটিও হাতে এল, মাঝে থেকে আমারও বাবা-বিশ্বনাথের দর্শন হয়ে গেল।" ইতিমধ্যে দারোগা বাবু আসিয়া পড়িলেন ও হাতে হাতকড়া দিয়া মারিতে মারিতে কালুকে থানায় লইয়া গেলেন।

বাড়ীতে আসিয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল—এ কি রকম বিধান! অনলবর্ষী সূর্য্যতাপ ও বর্ষায় এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও যাহারা খাওয়া পরার সংস্থান করিতে পারে না, তাহাদের রুধিরসিক্ত কড়ি হইতে ধনীরা বঞ্চিত করে কি করিয়া? ন্যায্য দাবী করিলেও তাহাদের নিগ্রহের আর সীমা থাকে না। মুষ্টিমেয় ধনী যুগযুগান্ত ধরিয়া কোটী কোটী মূক, পরিশ্রমী ও সরল লোকের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতেছে। মানুষের উপর মানুষের এই অন্যায় অত্যাচারের কী অধিকার আছে—সুরেশ তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ন্যায়ের বিধানে লুণ্ঠনকারী অপরাধী, কিন্তু যাহারা সেই আইনকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, গরিবের মুখের গ্রাস লুণ্ঠন করিয়া যাহারা অসংখ্য মানুষকে প্রত্যহ জবাই করে তাহারাই আবার

২

সমাজের কর্তা হইয়া বসে। তাহাদের স্বার্থের পরিপোষক যে নিয়মসূত্র তাহাই বিধান, এই বিধান যে মাথা পাতিয়া লয় দাসত্বের বক্সিস্ তাহারই প্রাপ্য, আর যে তাহা স্বীকার করে না সে অপরাধী বলিয়া দণ্ডনীয় হয়। মানুষকে অতি হীন ভাবে তাঁবে রাখিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইবার জন্য তুচাবতন চালাক ও ক্ষমতাপন্ন স্বার্থপর লোকের রচিত যে বিধান—এই বিধান কি সত্য? এই বিধান অমান্য করিলে কি বাস্তবিকই অন্যায় হয়? সেই পরম সত্যের সহিত এই সত্যের কি কোনরূপ সম্বন্ধ আছে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়া সামনের আমগাছের ছায়াকে যখন দীর্ঘতর করিয়াছে তখন কমলা আসিয়া বলিল, "সুরেশ খাবে না?"

চমকিত হইয়া সুরেশ যথাসাধ্য সহজ গলায় উত্তর দিল, "হাঁ এই যাচ্ছি, দিদি।"

সুরেশ আহারে বসিলে কমলা পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ভাই, লালার তো বয়স হল, আর তো ওকে রাখা যায় না।"

একটু অন্যমনস্ক ভাবে সুরেশ উত্তর করিল "হুঁ, কিন্তু এখনও তো তেমন বড় হয় নি, এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"বড় হয় নি কি রে? মাঘ মাসে ও তো চোদ্দয় পড়বে।"

"চোদ্দ বছর আবার বয়স? ঐ বয়সে তো ছেলেরা ছুটোছুটি করে বেড়ায়।"

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "শোন কথা—ছেলে আর মেয়ে কি সমান হল, ভাই?"

সুরেশ একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল, "হুঁ, তা ঠিক।"

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ ভারাক্রান্ত মনে ছাতে বেড়াইতেছিল। সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের খানিকটা তখনো লাল হইয়া আছে। তাহার রক্তাভা গাছের মাথায় ও দাঘির জলে আসিয়া পড়িয়াছে। মরণের পূর্ব্বক্ষণে মা যেমন হৃদয় নিঃস্ব করিয়া সন্তানকে শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়, বিদায় বেলায় নিজেকে রিক্ত করিয়া দিবস তাহার শেষ আলোকটুকু তেমনি পৃথিবীর উপর ঢালিয়া দিয়া গেল—এই কল্যাণ-করুণদৃশ্য সুরেশ

আজ নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই দেখিতেছিল। কারণ, তাহার মন তখন অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ কালুকে খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিল। তাহার কি হইবে, তাহার মায়েরই বা কি হইবে? বৃদ্ধা—রুগ্না ও পরিজনহীনা। পুত্রশোকে ও অনাহারে হয় তো তাহাকে মরিতে হইবে। কালু যখন ছমাস কি একবছর পরে ফিরিয়া আসিবে তখন মানব-সমাজ তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। সমাজের চক্ষে সে হীন, বদ্‌মাস্, চোর। মানুষের রচিত ন্যায়, অন্য একজন মানুষের গায়ে অন্যায় করিয়া, মিথ্যা করিয়া চোরের দাগ আঁকিয়া দিল। এইরূপ ন্যায়ের বিধানই সমাজ শাসন করিতেছে, অথচ ইহার বিরুদ্ধে যে একটি কথাও মুখ ফুটিয়া বলিবে—সেই সমাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডনীয়।

সুরেশ, পায়ের শব্ শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, লীলা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লীলাকে সে আর এরূপ কখনো দেখে নাই। কৈশোরে পদার্পণ করিলেও লজ্জা আসিয়া এখনো তাহার অসঙ্কোচ অবারিত মনকে নষ্ট করিয়া দেয় নাই, কিন্তু সুরেশ লক্ষ্য করিল আজ তাহার থম্‌থমে মুখের উপর যেন লজ্জার একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। যে লীলা অনর্গল অনাবশ্যক বকিয়া সুরেশকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত, আজ সে যেন কি বলিতে আসিয়া বলিতে পারিতেছে না, মনের কথা মুখের কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। সুরেশ অনেকটা অনুমান করিয়া বলিল, "লীলা, দিদি যে তোর বর দেখতে বলছিলেন।"

লীলা লজ্জায় কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "যাঃ—"

"সত্যি, তুই শুনিস নি, দিদি যে বলছিলেন খাবার সময়।"

পুনরায় "যাঃ—" বলিয়া লীলা পলাইতেছিল।

সুরেশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, তুই বে করবি নে?"

কোন কথার উত্তর না দিয়া লীলা মামাবাবুর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুরেশ আর একটু শক্ত করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, "লজ্জা কি, তুই আমার কাছে বল্ না, তোর কি ইচ্ছে।"

কোন কথা না বলিয়া লীলা চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্রে কি বলে জানিস? মৌন সম্মতির লক্ষণ; তা হলে তোর সম্মতি আছে তো?"

লীলা এবার লজ্জাকে কোনরূপে ঠেলিয়া উত্তর দিল, "না।"

"না—কিরে?"

লীলা আবার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বে করবি নে?"

লীলা এবার অপেক্ষাকৃত সহজ গলায় উত্তর দিল, "না।"

সুরেশ, লীলার হাত ছাড়িয়া দিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অবাক করলি লীলা, কে তোকে এ বুদ্ধি দিলে?"

আর কোন কথার উত্তর না দিয়া, লীলা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

লীলা চলিয়া গেলে সুরেশ ভাবিতে লাগিল—আশ্চর্য্য যা হোক. এর মাথায় আবার এ বুদ্ধি ঢোকালে কে? কিন্তু দিদি শুনলে তো মুস্কিল বাধাবেন দেখছি, ভাববেন—এ আমারই কাজ। অভাবনীয় অনুকূল আশাতীত ঘটনা ঘটিলে মানুষ যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, সুরেশের মন তাহা অপেক্ষাও অধিক উল্লসিত হইয়া উঠিল। কালু তাহার বুকের উপর যে ছায়া ফেলিয়াছিল, লীলা যে তাহা এরূপ সহজে অবলীলাক্রমে মুছিয়া দিবে সুরেশ তাহা কল্পনাও করে নাই।

( ২ )

কাজ না থাকিলে গ্রামের যে সমস্ত ছেলেরা থিয়েটারের আখ্ড়া দিয়া বেড়াইত, কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন আসিয়া সুরেশের সহিত বন্ধুত্ব করিল। সুরেশকে তাহারা সমিহ করিত, তাহার গাম্ভীর্য্যকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সহিত দূরত্ব রাখিয়া চলিত। কিন্তু দুই একটা ঘটনায় যখন ছেলেরা বুঝিল, সুরেশের গাম্ভীর্য্যে দাম্ভিকতা নাই বরং গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মের নীচে স্বাভাবিক কোমল সরল প্রাণ খেলা করিতেছে তখন সেই শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসা আসিয়া তাহাদিগকে

সুরেশের দিকে আকর্ষণ করিল। সুরেশও অতি সহজেই তাহাদের নিকট নিজেকে ধরা দিল।

সুরেশ সময় মত তাহাদিগকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে লাগিল—সমাজের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হয় না, কারণ, কতকগুলো বিভিন্ন সমাজের সমষ্টি লইয়াই একটা দেশ, সমাজের অধিকাংশ লোকই যদি অশিক্ষিত, পরশ্রীকাতর ও সর্ব্ব বিষয়ে অনুন্নত হয় তবে দেশের কল্যাণ কি করিয়া সম্ভব? নেতাদের এ দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহারা মনে করিতেছেন তাঁহাদের মত কয়েকজন উকিল ব্যারিষ্টার লইয়াই বুঝি দেশ তাই তাঁহারা রাজনীতির চাল্ লইয়াই ব্যস্ত। ওদিকে অতখানি সময় ও চেষ্টার অপব্যবহার না করিয়া সমাজের যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে সে দিকে যদি তাঁহারা দৃষ্টি দিতেন তবে ঢের বেশী কাজ হইত। তাঁহারা ভাবেন, বিদেশীরা তাঁহাদের অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু সমাজের যাঁহারা চূড়ায় বসিয়া আছেন তাঁহারা যে কত শত বৎসর ধরিয়া, কত শত সহস্র লোককে পেষণ করিয়া মারিয়া, আজ দেশকে এই অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছেন তাহার খবর কে রাখে? তাঁহাদের কাছে ন্যায়, যুক্তি, দয়া, সহানুভূতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, নিজেদের স্বার্থ ও জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা শাস্ত্রের অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করেন অথবা শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের লোপ পাইয়াছে, তাঁহাদের অবিচার-অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন পরম আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সনাতন ধর্ম্মের ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিতেছে। সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার তাঁহারা অসংখ্য উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু প্রবেশের একটুখানিও ছিদ্র রাখেন নাই, তাঁহারা মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করেন, দুর্ব্বলকে তিল তিল করিয়া মারেন। এইরূপ অবিচার ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত করিতে, দেশের একটা প্রকাণ্ড অংশকে এই প্রচণ্ড আঘাত হইতে রক্ষা করিতে প্রত্যেকেরই আজ কঠোর ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

সুরেশের কথার ভিতর ছেলেরা যুক্তি যতটা ধরিতে পারিল

তাহা অপেক্ষা সুরেশকে তাহারা ভাল করিয়া বুঝিল; দেখিতে পাইল, সকলের মত সে আহার নিদ্রা করিলেও তাহার মনের খানিকটা অংশ যাহাদের জন্য পীড়িত হইয়া আছে তাহাদের কথা কোন দিন কেহ ভাবে না। সুরেশের হৃদয় তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া, জাগাইয়া, কাঁদাইয়া তুলিল। তাহারা সুরেশের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে তাহাদিগকে হঠাৎ কাজে না নামাইয়া তাহাদের এই প্রেরণা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস কি-না দেখিবার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময় একদিন রাত্রে পরাণ হালদারের একটা ভাঙ্গা আটচালা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। পরাণ থানায় গিয়া বলিলেন, সুরেশের পেয়ারের লোক কালুর জেল হওয়ায় প্রতিশোধ লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া সে তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কোর্টে অভিযোগ উঠিল। সত্যের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আশু চাটুজ্জে বলিল, আগুন লাগিবার কিছু পূর্ব্বে গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার সময় সুরেশকে হালদার মশায়ের বাড়ীর কিছু দূরে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কেনা সরকার বলিল, আগুন দেখিয়া সে যখন পরাণের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল সুরেশ তখন ঐদিক হইতে আসিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সুরেশ সে রাত্রিতে বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও যায় নাই ইহা এক মাত্র লীলা ও কমলাই বলিতে পারে, কিন্তু নিজের মান বাঁচাইবার জন্য সুরেশ তাহাদিগকে সাক্ষীর সম্মান দিতে কিছুতেই রাজী নহে। সে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মিথ্যা এখানে সত্যের আসন টলাইয়া তাহাকে কারাগৃহে বরণ করিয়া দিয়া আসিল।

* * * *

* * * *

দুবছর পরে সুরেশ যখন জেলখানা হইতে সাধারণ-কয়েদীর ছাপ পরিয়া বাড়ী ফিরিল তখন তাহার ভিতরে ও বাহিরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ছাত্ররা কেহ মরিয়াছে, কেহ

জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য চাষীবাসী বা চোর ডাকাত হইয়াছে। কালু ছমাস পরে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া সুরেশের শূন্য স্কুলে সারাদিন চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া রাত্রির আবরণে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কমলা চোখ মুছিয়া ভায়ের হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল, লীলা আসিয়া তাহার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া দুঃখে ও আনন্দে অনেক কাঁদিল, দু একজন বন্ধু অনেক সমবেদনার কথা শুনাইয়া গেল। সুরেশ লক্ষ্য করিল, লীলা যেন নিজেকে একটু অস্বাভাবিক রূপে গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার কথাবার্ত্তা ও চালচলনের মধ্যে একটা রুক্ষতার ভাব প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল।

প্রায় মাস দুই পরে সুরেশের এক মামাত ভাই আসিয়া তাহাকে বলিল, "লীলা যে বেজায় বড় হয়ে উঠেছে সুরেশ—একটা বরটর দেখ্।"

সুরেশ হাসিয়া উত্তর দিল, "আর আমিই বুঝি ছোট আছি?"

মামাত ভাই অতুল, সুরেশের প্রায় সমবয়সী, তাহাদের উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। সে বলিল, "তোমার জন্যে তো ভাবনা নেই ভাই, তুমি ব্যাটাছেলে, লীলা তো আর ব্যাটাছেলে নয়।"

সুরেশ তেমনি হাসিয়া উত্তর করিল, "লীলাও মেয়েছেলে—তার জন্যেই বা ভাবনা কি?"

অতুল ভাবিল, জেলে থাকিয়া সুরেশের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিস ভাই, কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

সুরেশ বলিল, "আসল্ কথা হচ্ছে, ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে রাজী নই।"

"তুমি তার অভিভাবক, তুমি না গেলে কে যাবে বল তো?"

"সে যদি বে করতে না চায়, আমি মাঝে থেকে একটা বন্ধনের সৃষ্টি করতে যাই কেন?"

অতুল আশ্চর্য্য হইয়া, চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "কি বল্‌ছিস সুরেশ, বে করবে না কি?"

অত্যন্ত সহজভাবে সুরেশ উত্তর করিল, "আমার তো তাই বিশ্বাস, এদিকে তার বিশেষ ঝোঁক আছে বলে তো আমার মনে হয় না।"

"তার ঝোঁক যদি নাই থাকে তাতেই বা হয়েছে কি?"

সুরেশ বলিল, "আমি জোর করে কারো স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে, অতুল।"

অতুল বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "দরকার হলে তা দিতে হবে বৈকি?"

"কিন্তু, আমি তো কোন দরকার দেখছি নে।"

"কিছুই দেখছ না?"

"না।"

"লীলার সম্বন্ধে তোমার কোন আশঙ্কা নেই?"

সুরেশ স্থির হইয়া বলিল, "কোন্ আশঙ্কার কথা তুমি বলছ, অতুল?"

"সামাজিক আশঙ্কা, এমন কি লীলার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা।"

সুরেশ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, "সমাজকে আমি ভয় করি নে অতুল, যে সমাজের কাছে ন্যায় অন্যায় বলে কোন জিনিস নেই, সে সমাজকে মানবার মত দুর্বুদ্ধি ভগবান যেন আমায় কখনো না দেন। তবে যখন লীলার ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুললে, তখন তার জবাব দিতে আমি বাধ্য; কিন্তু তার আগে তোমায় বলে রাখছি—এর উত্তর দিতে হলে এমন কতকগুলো কথা আমায় বলতে হবে যা তোমার কানে হয় তো ভাল শুনাবে না, অতুল।"

অতুল উৎকণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল, "তা হোক্, তুমি বল।"

"আশঙ্কা বলতে তুমি যা বোঝ ভাই, অবিবাহিত-জীবন অপেক্ষা লীলার বিবাহিত-জীবনে আমি সে আশঙ্কা ঢের বেশী করি। ঢের বেশী করি বলেই, অনিশ্চিতের ভয়ে একটা সুনিশ্চিত বিপদের মধ্যে তাকে ফেলে দিতে আমি চাই নে। যাকে ভালবাসি, যাকে স্নেহ করি, জেনে শুনে তাকে একজন অসংযত লোকের হাতে সেধে দিয়ে আসবার মত

প্রবৃত্তি আমার নেই। যে এতদিন এত যত্ন করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে এত যুদ্ধ করে জীবনের একটা আদর্শ, একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরেছে, সেই অবলম্বনকে নির্দ্দয়ের মত তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে, তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি কি করে বল তো ?"

অতুল বলিল, "কিন্তু, বিবাহ যে ধর্ম্ম-সঙ্গত।"

সুরেশ উত্তর করিল, "কিন্তু, ধর্ম্ম অপেক্ষা মোক্ষ আরো বড়, এই মোক্ষের ভিত্তি পবিত্রতা। যারা মোক্ষমার্গের পথিক তাদের কাছে ওসব মস্ত অন্তরায়। আদর্শ কঠিন বলে তো আর ত্যাগ করা যায় না। শাস্ত্র যাকে আদর্শ বলেছেন তা নিশ্চয়ই ন্যায়-সঙ্গত। আমি তো শাস্ত্র ছাড়া কিছু বলছি নে, আমি বলছি—যারা মোক্ষমার্গের পথিক তারা কোনো দুর্ব্বলতার সঙ্গে Compromise করবে না। আদর্শ—জীবনে পরিণত করতে যাওয়াটা পাপ নয়। যা ন্যায় তা চিরকাল ন্যায়, যা অন্যায় তা চিরকাল অন্যায়; সত্য—কখনো কোন অবস্থায় তার রূপ পাল্টাতে পারে না। যা অসৎ, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, আপোষ করে, তাকে সৎ প্রতিপাদন করবার চেষ্টাকে মনের সঙ্গে জচ্চুরী করা ছাড়া আর কি বলবো ?"

অতুল ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু, লীলা যে চিরদিন এমনি থাকতে পারবে তার নিশ্চয়তা কি ?"

"নিশ্চয়তা কিছু নেই, তবে অনিশ্চয়তাও তো দেখছি নে। তবু বলে রাখি অতুল, লীলা যদি চিরকাল এমনি থাকতে না পারে, যদি কোন দিন দুর্ব্বলতা এসে তাকে আশ্রয় করে তবে চিরদিন সে তাকে দুর্ব্বলতা ও পাপ বলেই জানবে, বিবাহিত জীবনের মত অন্যায়কে ন্যায় বলে ভেবে তোমাদের মত ধর্ম্ম অর্জ্জন করবার দুর্ব্বুদ্ধি তার কোন দিনই হবে না। আরও বলি—লীলা যদি একবার অন্যায় করে তবে সহস্রবার সে নিজেকে রুখ্বার চেষ্টা করবে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে তার ঐ একবারের আচরণ আজীবন আচরিত হবে; কেন না, ওটা যে অন্যায় —দুটো মন্ত্র পড়ে সে ধারণাটুকুও তোমরা তার মন থেকে চিরকালের জন্যে মুছে দেবে।"

"কিন্তু, স্বাভাবিক—"

অতুলকে বাধা দিয়া সুরেশ বলিল, "হাঁ তোমরা বলবে, স্বভাবের প্রতিকূল আচরণ করা ঠিক নয় ; কিন্তু, চুরি করবার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বাভাবিক। চুরি না করে থাকা যাবে না বলে, আজীবন যে চুরি করে বেড়ায়—সে ভাল কাজ করে, অথবা চুরির প্রলোভনকে দমন করবার জন্যে শতবার চেষ্টা কোরে, নিরনব্বই বার সফল হয়ে যে একবার মাত্র বিফল হয় – সে ভাল কাজ করে,— এটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার ?"

ইহারও কোন সোজা উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া অতুল বলিল, "তুমি আর নতুন কি বল্‌লে ভাই, Roman Catholicদের ভেতর ওরকম experiment ঢের হয়ে গেছে ; অবিবাহিত জীবন যা অনর্থের সৃষ্টি করেছিল তা বাধা দেবার জন্যেই তো Luther বিবাহিত জীবন বাধ্য করে গেছেন ”

সুরেশ হাসিয়া উত্তর করিল, "তা ঠিক, কিন্তু তাঁদের দেশের একজন খ্যাতনামা বিদুষী Ellen Key কি বলেছেন জান ?—Instead of upholding, in the spirit of Catholic Church and of Christ, the indissolubility of marriage and demanding the suppression of sensuality when the peace of the soul required it, Luther, by his insistence on the strength of natural inclinations, was forced into concessions, which—quite in accordance with the teachings of the Bible—went so far as to approve of bigamy."

অতুল বলিল, "তা উনি বলতে পারেন, কিন্তু অবিবাহিত জীবন অপেক্ষা বিবাহিত জীবনে ভাল থাকবার সম্ভবনা আরো বেশী।"

সুরেশ জেদের সহিত উত্তর করিল, "কখনো না—Sexual abstinence in youth, for instance, may strengthen nine out of ten young men. The tenth it may change into a man of bestial impulses, who, although before marriage he has been chaste, may show, when married, a coarseness

or depravity which drags down the wife to his level or opens an abyss between them. Purely sensual unions may in nine cases out of ten deteriorate both the man and the woman."

অতুল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বিবাহের উপর তুমি অযথা দোষারোপ করছ, সুরেশ।"

সুরেশ বলিল, "চোট্‌ছ কেন অতুল? তুমি ভেব না, আমি বিবাহের একেবারে বিরুদ্ধে। তবে, বে করতে যে চায় না, অবশ্য কোন উচ্চ আদর্শের জন্যে—তাকে আমি তার মতেই যেতে দিতে চাই, তেমনি—যে করতে চায় তাকেও জোর করে আমি ধরে রাখতে চাই নে।"

"অর্থাৎ, মেয়েরা যা খুসী তাই করুক,—এই তুমি চাও তো?"

সুরেশ উত্তর করিল, "না—তা নয়, জোর করে মেয়েদের চিরদিন নাবালিকা করে রাখতে আমি চাই নে। আমি চাই, মেয়েরা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিক, নিজেদের ভাল মন্দের জন্যে নিজেরা ভাবুক, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করুক, তা হলে তাদের পক্ষেও মঙ্গল, আমাদেরও নিষ্কৃতি। আমরা—পুরুষরা, মেয়েদের মনের ভাব ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নে—বুঝতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে বসি, এ অবস্থায় তাদের জন্যে বিধান দেওয়া ও সেই বিধান মানবার জন্যে তাদের উপর জোর করা কি ঠিক? মেয়েদের শিক্ষিত করে ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করুক। হয় তো প্রথম প্রথম দু চারটে ভুলও হবে—তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ, এই রকম ভুল করে—অভিজ্ঞতার পথেই তারা ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। মোট কথা অতুল, লীলা বড় হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ সে নিজে ভাবতে শিখেছে, নিজের জীবনের লক্ষ্য সে নিজে স্থির করেছে, এ অবস্থায় জোর করে আমাদের মতলব মত তাকে চালাতে গিয়ে আমি তার অনিষ্ট করতে চাই নে। তবে ভবিষ্যতে লীলার বে করবার ইচ্ছে হয়েছে, একথা যদি জানতে পারি, খুব আনন্দের সহিত আমি তার সকল ব্যবস্থা করবো।"

"যা ভাল বোঝ তাই কর, ভাই"—এই বলিয়া অতুল মুখভার করিয়া চলিয়া গেল। অতুল চলিয়া গেলে সুরেশ যেখানে বসিয়াছিল সেই-খানেই স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—লীলা যদি কখনো কিছু অন্যায় করিয়া ফেলে তবে সে তাহা সহ্য করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে কি-না? কিন্তু বিবাহিত জীবনে একজন যে-কোন-লোকের কামনা পূরাইতে গিয়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজীবন অসংযত হইবার যে দারুণ অশান্তি—তাহা মনে করিয়া সুরেশের অন্তঃকরণ লীলার প্রতি সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময় লীলা আসিয়া বলিল, "মামাবাবু, রমেশদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" সুরেশ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। রমেশ সুরেশের বন্ধু; সে এতদিন বাড়ী ছিল না, তাই সুরেশের জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সে এই প্রথম তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। খানিক কথাবার্ত্তার পর রমেশ বিদায় লইলে তাহার বোন তরঙ্গিণীর কথা হঠাৎ সুরেশের মনে পড়িল। তরঙ্গিণীকে সকলে 'তরু' বলিয়া ডাকিত। তরু বালবিধবা, লীলার বন্ধু। খুব সরল, বুদ্ধিমতী ও নির্ম্মল স্বভাব বলিয়া সুরেশ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। লীলাকে ডাকিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তরু কোথায় রে, তাকে যে একদিনও দেখলুম না?" তরুর নাম শুনিয়া লীলা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সে ভাল আছে তো?" এবারে লীলার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। "আমি জানি নে কিছু"—এই বলিয়া লীলা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ ভাবিল—যদি তরুর কিছু অনিষ্ট হইয়া থাকে, লীলা নিশ্চয়ই এতদিন তাহাকে বলিত; কিন্তু এমন কি হইয়াছে যাহার জন্য সে কিছু বলিতে না পারিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল—সুরেশ তাহা অনুমানও করিতে পারিল না। সে বিষম চিন্তিত হইয়া তাহার দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিল তাহা এই—তরুর নামে একটা দুর্নাম উঠিয়াছিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তাহার কিছুদিন পরে বাড়ীর সকলের সহিত সে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে

যায়। সেখানে ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। শুনিয়া সুরেশের অন্তঃকরণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তরুর মৃত্যু-সংবাদেও বোধ হয় সে এতটা কাতর হইত না।

( ৩ )

কিছুদিন পরে বিষয় কার্য্যোপলক্ষে কমলাকে একবার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। দু তিন সপ্তাহ পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, লীলার সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে। তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। কমলা বলিল, শ্বশুরবাড়ীর সকলে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে, মেয়েব বিবাহে তাহার কিছুমাত্র মত ছিল না। সে সুরেশকে যাইবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিল, শেষে টেলিগ্রামও করিয়াছিল। সুরেশ না আসায় কমলা ভাবিয়াছিল, বুঝি রাগ করিয়াই সে এই বিবাহে যোগ দিল না। কিন্তু এখানে আসিয়া সে যখন শুনিল সুরেশ তাহার চিঠি ও টেলিগ্রাম কিছুই পায় নাই, তখন সে বাস্তবিকই অবাক হইয়া গেল। এই সমস্ত শুনিবার মত প্রবৃত্তি ও কৌতূহল সুরেশের কিছুমাত্র ছিল না, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তায় তাহার সমস্ত মন তখন আচ্ছন্ন। লীলা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সুরেশ লক্ষ্য করিল, তাহার নির্ব্বাক আননে যেন সমগ্র মানব-সমাজের উপর অবিশ্বাস ও ঘৃণার ভাব অঙ্কিত রহিয়াছে। লীলা আর পূর্ব্বের মত যখন তখন আসিয়া, ছেলেমানুষী করিয়া সুরেশকে বিরক্ত করিত না, সুরেশও নূতন জীবনের অনুকূলরূপে মনকে তৈরী করিবার জন্য লীলাকে নিজের আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

* * * *

* * * *

ছ সাত মাস পরে লীলার বর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিল। লীলা ভাবিতে লাগিল—আজ তাহার এতদিনের অনাবিল জীবন ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, পুড়িয়া

ছাই হইয়া যাইবে; যাহার চিন্তা মনে আসিলেও তাহার অন্তঃকরণ ধিক্কারে ভরিয়া উঠিত, আজ তাহাই সত্য হইবার দিন আসিয়াছে। সে বিবাহিতা—অর্থাৎ কি-না, একজন মানুষকে ধরিয়া আনিয়া সকলে জোর করিয়া বলিল—ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার ভাল হইবে; কিন্তু কুমারী-জীবনে যাহা অত্যন্ত গর্হিত ছিল, বিবাহের মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে তাহা যে কি করিয়া মহা কল্যাণে পরিণত হইল, লীলা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। মনের যে প্রবৃত্তিকে সে এত-দিন প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছে, আজ মরিবার জন্যই তাহাকে অবাধে ছাড়িয়া দিতে হইবে; একজন লোক আসিয়া, তাহার সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া, তাহার উপর যা খুসী তাই করিয়া যাইবে এইরূপ চিন্তাতেও তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘৃণায় বিমুখ হইয়া উঠিল। যাহার ইচ্ছা হয় সে করুক, কিন্তু সে যে আজীবন সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে রুখিয়া আসিয়াছে; আজ সমাজ-বিধি তাহার হাত পা বাঁধিয়া, তাহাকে নিতান্ত অসহায় করিয়া তাহার উপর নিপীড়ন করিবে!—ইহা মনে করিয়া লীলার সমস্ত মন-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

সাজিয়া গুজিয়া রাত্রির বিশ্রাম বাসরে যখন লীলা ধীরে ধীরে বিজড়িত পদে যাইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল—জীবনের শেষ সাজ সজ্জা করিয়া সে যেন মরণকে বরমালা দিতে যাইতেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল—তাহার জীবনের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আশা, সমস্ত আদর্শ আজ ধূলায় লুটাইয়া হাহাকার করিতেছে।

আরও কয়েক মাস পরে লীলাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। তথাকার সমস্ত আবহাওয়া তাহার সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কিছুতেই সে আর বাধা দিল না। লীলা ভাবিল—সে যখন সবই খোয়াইয়াছে তখন ইহারা আর বেশী কি ক্ষতি করিবে? তাই সকল অবস্থায় সে নিজেকে নির্ম্মম ভাবে ছাড়িয়া দিল, ভাল মন্দ বিচার করিবার তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না।

* * * *

* * * *

লীলার শ্বশুরবাড়ীতে একটি অল্পবয়স্কা বিধবা ঝি ছিল। সে জাতিতে গোয়ালা। গোয়ালা হইলেও লীলা দেখিল, তাহার এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহা সচরাচর অনেক মেয়েরই দেখা যায় না। কিন্তু যতই গুণ থাক্, তাহার দেহ-মনের উপর যৌবনের যে অবাধ লীলা চলিয়াছে তাহাকে বাধা দিবার সামর্থ্য যে ইহার নিতান্তই অল্প তাহা লীলা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। সে ভাবিল—সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উন্মাদ করিয়া যৌবন একদিন জাগিবেই; তাহার কাছে স্ত্রী পুরুষ নাই, নির্ব্বিচারে সকলকে নাচাইয়া, মাতাইয়া, অঘটন ঘটাইয়া সে আসিবেই। ইহা সকলেই জানে, জানিয়া শুনিয়াও সমাজ বিধবাদের বিবাহে উদাসীন কেন? সমাজের বিধান যখন যৌবনের শক্তিকে বাধা দিতে পারে না বলিয়া কুমারীর বিবাহ দেয় তখন বিধবার উপর জবরদস্তী সংযমের ব্যবস্থা করা হয় কেন? বিবাহেচ্ছু বহু কুমারী নানা অবস্থায় পড়িয়া যে অবিবাহিতা রহিয়াছে সমাজ তাহারই বা কি করিতেছে? যৌবনকে অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস যাহাদের আছে সমাজ জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ দিবে, আর যৌবনকে যাহারা বরণ করিতে চায় সমাজ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবে—সবটাই সমাজের জবরদস্তী। এইরূপ জবরদস্তী করিয়া, সমস্ত গুণ থাকা সত্বেও কত লোককে সে অনাথা করিয়াছে, পতিতা করিয়াছে, হত্যাকারী করিয়াছে। বিবাহের অধিকার পাইলে যাহারা পুত্র কন্যার জননী হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিত, অসীম গুণ-পনায় হয় তো যশস্বিনী হইতে পারিত, আজ তাহাদের সমস্ত কল্যাণ-গুণ নির্ম্মম ভাবে নিষ্পিষ্ট করিয়া অতি ঘৃণিত জীবন যাপন করিবার জন্য সমাজ তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছে।

* * * *

* * * *

লীলার স্বামী লীলাকে খুবই ভালবাসিত। মানুষ কেবল গ্রহণই করিতে পারে না, তাহাকে কিছু দিতেও হয়; তাই অনিচ্ছা সত্বেও লীলার হৃদয়ের কিছু অংশ স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু

সেই সামান্য অধিকার পাইয়া স্বামী যে কখন্ তাহার হৃদয়ের সবখানি দখল করিয়া লইল, লীলা তাহা টেরও পাইল না। তাহার মনের সকল রন্ধ্র পূর্ণ করিয়া, স্বামীর সামীপ্য-সুখ তাহাকে আনন্দের যে অভিনব ভূমিতে লইয়া গেল, সেখানে নিশিদিন থাকিয়া লীলা যেন নিজেকে বাস্তব জগৎ হইতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে যাহা ভাবিলে সে কষ্ট পাইত, স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া দেখিবার তাহার আর ইচ্ছা হইত না; আনন্দ-কৌতুকের অবাধলালস-লীলায় সকলেরই মত সেও নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিল।

* * * *

* * * *

একদিন দুপুরে এক পসলা বৃষ্টির পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কেবল একখণ্ড সাদা মেঘ অকারণ ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করিতেছে, ধানের গুচ্ছ চুলে গুঁজিয়া শরৎ-সুন্দরী অনিমেষ আঁখিতে উদার আকাশের পানে চাহিয়া আছে, তাহার কবরী-বন্ধনে ধানের গন্ধ গুমরিয়া মরিতেছে। জানালা খুলিয়া লীলা দেখিতেছিল, টিফিনের ছুটির পর কতকগুলি ছেলে একটা গাছের তলায় বসিয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া কি খাইতেছে, পুকুরে হাঁস চরিতেছে, কাশের বনে বাতাস মাতামাতি করিতেছে। এমন সময় তাহার স্বামী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, "ওগো শুনেছ, জ্ঞানের স্ত্রী বিষ খেয়েছে; তুমি একবার শীগ্‌গির যাও, আমি ডাক্তার ডাকতে চল্লুম।" ইহা শুনিয়া লীলা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল, জ্ঞান উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিয়া বিষের প্রতিক্রিয়া সাধনে যাহা কিছু ঔষধ তাহার জানা ছিল, তাহাই আনিয়া সুহাসিনীর মুখে গুঁজিয়া দিতেছে। সুহাসিনী তিন বছরের ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া অজস্র কাঁদিতেছে ও মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। লীলাকে দেখিয়া সুহাসিনী আরও কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "দিদি, আমায় বাঁচাও।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খেলে?"

স্বামীকে দেখাইয়া সুহাসিনী বলিল, "ওর জন্যে।" সুহাসিনী ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে কোনরূপ দাম্পত্য-কলহ ছিল তাহা লীলার মোটেই জানা ছিল না. সুতরাং এই অভাবনীয় কাণ্ড কেন হইল তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লীলা নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তবে সে ইহা বেশ বুঝিতে পারিল—বাঁচিয়া উঠিবার জন্য সুহাসিনীর আকুল আগ্রহ ; পুত্র-স্নেহ দুটি কচি হাত বাড়াইয়া মরণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কান্না থামিয়া সুহাসিনীর ওষ্ঠাধর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুটি তন্দ্রার আলসে ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, ডাক্তার আসিবার পর সে একটি বারের জন্যও চোখ মেলিয়া চাহিল না।

সুহাসিনীর শীতল বাহুবেষ্টন খুলিয়া, শিশুটিকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লীলা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

স্ফুটনোন্মুখ কমলের উপর এই যে স্নিগ্ধ শিশির বিন্দুটি আসিয়া পড়িল, তাহাতে লীলার মাতৃ-হৃদয় দলে দলে ফুটিয়া উঠিল। স্বামী দেখিলেন, ভালই হইয়াছে—লীলার অশান্ত মনকে বাঁধিবার ইহাই উপযুক্ত বন্ধনী!

পিতা আসিয়া প্রত্যহই সন্তানকে দেখিয়া যাইত, কোন কোন দিন বসিয়া লীলার সহিত গল্পও করিত। লীলা পূর্ব্বে কোন দিন তাহার কাছে বাহির হইত না, কিন্তু মাতৃ-স্নেহ এখন অবাধে অক্লেশে লজ্জাকে সরাইয়া দিল। কিছুদিন পরে লীলা দেখিল, স্বামী যেন তাহার উপর কিরূপ বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানের পরিধিও যেন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সামান্য কারণে স্বামী রাগিয়া ওঠে, অভদ্র ভাষায় তিরস্কার করে, একবার রাগ করিলে দু তিন দিন কথাই বলে না। লীলা লক্ষ্য করিল, সুহাসিনীর শিশুটির উপরও তাহার যেন বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে। স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোন কারণই লীলা খুঁজিয়া পাইল না। লীলা যাহাকে ভালবাসে তাহাকে প্রাণ দিয়াই ভালবাসে ; সমস্ত হারাইয়াও হৃদয় উজাড় করিয়া যে স্বামীকে সে এতদিন ভালবাসিয়াছে সেই স্বামীর নিকট হইতে অকারণ এই অপব্যবহার পাইয়া

লীলা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইল। সে ভাবিল—কেন? কেন স্বামী তাহার উপর এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করে? অবশেষে লীলা একদিন জোর করিয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল—সে যে দিনরাত কারণে-অকারণে তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করে, তাহার হেতু কি? উত্তরে যাহা শু'নল তাহাতে লীলা কুণ্ঠায়, লজ্জায় লাল হইয়া মাটিতে একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—ঠিকই হইয়াছে, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া স্বামীকে যাহা দান করিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রতিদানই সে ফিরিয়া পাইয়াছে। লীলা বেশ বুঝিতে পারিল, এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও স্বামী তাহার মন বুঝিতে পারে নাই, বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টাও কখনো করে নাই; সে চির দিন তাহার দেহকেই চাহিয়াছে, আর তাহাই পাইয়া সে তৃপ্ত হইয়াছে। দেহের ভিতর যে মানুষটি এতদিন তাহার সেবা করিয়াছে, বিপদে আপদে তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, তাহার দুঃখে কাঁদিয়াছে, আনন্দে হাসিয়াছে—সে বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন অপরিচিত ছিল এখনো ঠিক তেমনিই অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে—যদি পরিচিত হইত, তবে স্বামী এত সহজে তাহাকে এরূপ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। লীলার মনে আজ হঠাৎ সন্দেহ উঠিল, তবে সে কাহাকে তাহার দেহ-মন এতদিন দিয়া আসিয়াছে?—স্বামী কে? স্বামী কোথায়!

যে মুহূর্ত্তে লীলার মনে এই সন্দেহ জাগিল সেই মুহূর্ত্তে স্বামীকে নিতান্ত একটা অপরিচিত লোক বলিয়া তাহার মনে হইল; মনে হইল—সে যেন এখনো কুমারীই রহিয়াছে, একজন লোক স্বামী সাজিয়া আসিয়া তাহাকে নিপীড়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত বাস করাও লীলার অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই দিনই তাহার ছোট দেবরকে সঙ্গে করিয়া, সুহাসিনীর ছেলেটিকে কোলে লইয়া লীলা কলিকাতায় সুরেশের কাছে চলিয়া আসিল।

( ৪ )

গঙ্গার খুব কাছেই সুরেশের বাড়ী। কোন দিন ঝিকে লইয়া, কোন দিন একাই লীলা গঙ্গাস্নানে যাইত। একদিন গঙ্গার ঘাটে একটি তরুণীকে দেখিয়া লীলা অবাক হইয়া গেল; অনেকক্ষণ লক্ষ্য

করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সংশয়াকুল চিত্তে তরুণীর কাছে আসিয়া লীলা তাহার আঁচল ধরিয়া টানিল। মহিলাটি মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়াই একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কোন কথাই বলিতে পারিল না; নিজেকে সামলাইয়া শেষে বলিল, "আমাদের বাড়ী চল্।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়—কত দূর?"

"এই কাছেই।"

পথে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। লীলা আসিয়া দেখিল, একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, টবে নানাবিধ ফুলের গাছ, সামনের ছোট উঠানে ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে।

লীলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার বাড়ী, তরু?"

তরঙ্গিণী একটু হাসিয়া বলিল, "আমার আশ্রয় দাতার।"

"কি করে তুই এখানে এলি?"

তরঙ্গিণী সংক্ষেপে উত্তর দিল. "বাড়ীতে আমার নামে একটা দুর্নাম উঠেছিল তুই নিশ্চয় তা শুনেছিস।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "যা শুনেছিস তা সবই মিথ্যা নয়। আমায় তোর ঘৃণা হতে পারে, আমিও একদিন যাকে বিষম ঘৃণা করে এসেছি, অন্যায় বলে জেনেও আবার বাধ্য হয়ে তাই করেছি। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে, তার বাইরে আর তার কোন হাত নেই, সেই অবস্থায় তাকে দেখে অন্যে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু এতটুকুও সাহায্য করবার তার ক্ষমতা নেই। আমিও সেই অবস্থায় পড়েছিলুম, সমাজ আমায় ঘৃণাও যথেষ্ট করেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটুও সাহায্য তার কাছ থেকে আমি পাই নি। মনের সঙ্গে আমি নিজেই লড়েছি, নিজেই ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, শেষে পরাজয়ের অপমানকেও বরণ করে নিয়েছি। এর যে কি কষ্ট লীলা, তা তোরা বুঝতে পারবি নে, কারণ মনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার তোদের কখনো দরকার হয় নি। অন্যায় করেছি লীলা, কিন্তু অন্যায়কে একদিনের জন্যেও ন্যায় বলে স্বীকার করি নি, বরাবর ই তার সঙ্গে জুঝে গেছি। সমস্ত মন থেকে ঘৃণা

করে, অক্ষম হয়ে, অসহায় হয়ে তখন যা করেছি লীলা, এখন কিন্তু তার জন্যে আমি এতটুকুও দুঃখিত নই; কারণ আমি যা করেছি প্রায় প্রত্যেক ছেলেমেয়েই তো তা করে থাকে, তারা বিবাহিত-জীবনে যা করে আমি তবু তার চেয়ে ঢের কম করেছি। আমি স্বামীকে কখনও দেখি নি, হয় তো দেখে থাকবো, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু আর একজনকে আমি স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলুম।"

লীলা বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় থাকেন?"

"এখন দেশে, আগে আমাদের গ্রামেই থাকতেন, স্কুলে মাষ্টারী করতেন।"

"তারপর?"

"তারপর আমার কথাতেই তিনি বে করলেন, কিন্তু বে হবার পর আমি আর তাঁকে অবিশ্বাসী হতে দিই নি।"

"যদি ভালই বেসেছিলি তবে আবার তাঁকে বে করতে বললি কেন?"

"ভালবেসেছিলুম কারণ, ভালবাসা রুখে রাখা যায় না, কারো-না-কারো ওপর গিয়ে তা পড়বেই, কিন্তু যখন জানলুম আমাদের বে হতে পারে না, হিন্দু-সমাজ তাকে বে বলে কখনো মানবে না। তখন সারা জীবন বন্ধনের মধ্যে আটকে না বেখে, আমার কাছ থেকে তাঁকে মুক্ত করে দিলুম। হিন্দু-সমাজে আমি খারাপ, কিন্তু সমাজ যদি আমাদের মত বিধবাদের বে'র অনুমতি দিত তবে তারা অনেকেই তোদেরই মত সতীলক্ষ্মী হতে পারতো, লীলা।"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর তুই কি করলি?"

"তারপর আমি বাড়ী থেকে চলে এসে এঁদের এখানে আশ্রয় নি; কাজ কর্ম্ম করি, খাটি—খাই। আসবার আগের দিন তোর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলুম, মনে আছে?"

"আছে—কিন্তু, তাঁর সঙ্গে তোর আর দেখা হয় নি?"

"না—চিঠি পত্রও লিখি নি।"

"তাঁর বাড়ী কোথায়?"

তরঙ্গিণী একটু থামিয়া গ্রামের নাম বলিল।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া লীলা পুনবায় জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তাঁর নাম বলতে তোর কি কিছু আপত্তি আছে?"

তরঙ্গিণী একটু হাসিয়া, পরক্ষণেই বিমর্ষ হইয়া, লীলার হাতটা অতি স্নেহে নিজের কোলের উপর রাখিয়া বলিল, "তোর কাছে ভাই, কবে—কি গোপন করেছি। যদি তাই করতুম তবে কি আর আমার নাড়ীর খবর তোকে এমনি করে দিতুম।" তারপর ধীরে ধীরে বিজড়িত কণ্ঠে সে যাহার নাম করিল তাহা শুনিয়াই লীলা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, গল্প করিয়া লীলা সেদিন চলিয়া আসিল। তরুর সম্বন্ধে কোন কথাই মামাবাবুকে বলিল না। তার পরের দিন লীলা পুনবায় তরঙ্গিণীর কাছে গেল এবং তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া আনিয়া সুরেশকে একেবারে অবাক করিয়া দিল।

তরঙ্গিণী সুরেশকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। স্নেহাশীষ-দৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া সুরেশ তাহার গত জীবনকে ধুইয়া মুছিয়া দিল। লীলা তরুকে আর ছাড়িল না।

*        *        *        *

*        *        *        *

কিছুদিন পর শিশু পুত্রটিকে দেখিয়া যাইবার জন্য সুরেশ জ্ঞানকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল। জ্ঞান আসিলে কথায় কথায় লীলা তাহাকে বলিল, "আপনাকে আমার একটি উপকার করতে হবে, জ্ঞান বাবু।"

"কি বলুন"—এই বলিয়া জ্ঞান তাহার মুখের দিকে চাহিল। লীলা হাসিয়া বলিল, "আপনার ছেলের ভার আমি আর বইতে পারছি নে, আপনি দেখে শুনে একটা বে করুন।"

জ্ঞান উপহাস করিয়া উত্তর দিল, "ও—এই কথা, আমি ভেবেছিলুম একটা হাতি ঘোড়া কিছু করতে বলবেন।"

লীলা ভ্রূ তুলিয়া বলিল, "না-না, ঠাট্টা নয়—সত্যি বলছি। আমার

পছন্দমত একটি মেয়ে আছে, তাকে আপনার বে করতে হবে, কেমন—করবেন তো ?"

তাহার বিবাহের জন্য লীলার এতটা অনাবশ্যক উদ্বেগের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জ্ঞান একটু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আচ্ছা তা দেখা যাবে।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তরঙ্গিণী ছাতে বেড়াইতেছিল। ওপারে গাছের মাথায় আঁধার নামিয়াছে, এপারে অবিশ্রাম জন-স্রোত চলিতেছে, গঙ্গার বাতাসে সাগরের গান ভাসিয়া আসিতেছে। লীলা জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া ছাতে উঠিল। এই নবাগত অতিথির উপর চোখ পড়িতেই তরঙ্গিণী যেন হটাৎ কেমন হইয়া গেল, জ্ঞানও আড়ষ্ট হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে জ্ঞান মুখ ফিরাইয়া দেখিল, লীলা কখন্ চলিয়া গিয়াছে।

* * * *

* * * *

আট দশ দিন পরে লীলা আসিয়া সুরেশকে ধরিয়া বসিল, "জ্ঞানবাবু তরুকে বে করতে চান, মামাবাবু আপনাকে অনুমতি দিতেই হবে।"

সুরেশ উত্তর করিল, "বেশ তো, আমার তো কোন অমত নেই লীলা, কিন্তু তরুর কি ইচ্ছে সেটা তো একবার জানা দরকার।"

"তার কোনই অমত হবে না—আমি নিশ্চয় বলছি।"

"না লীলা, এ সব কাজ আন্দাজে হয় না, তাব নিজের মত তার মুখ থেকেই শোনা ভাল।"

"আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আনছি"—এই বলিয়া লীলা খানিক পরেই তরুকে সুরেশের কাছে ডাকিয়া আনিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সুরেশ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তরু, একটা কথা নিঃসঙ্কোচে আমায় বলবি ?"

"কি, দাদা ?"

"কিছু গোপন করবি নে ?"

তরু হাসিয়া বলিল, "তোমায় কোন দিন কিছু গোপন করেছি ?"

"না—তা করিস নি। আচ্ছা, তোর কি বে করবার ইচ্ছে হয়? যদি হয়—বল্, আমি নিজে তার ব্যবস্থা করবো।"

তরু একটু চুপ করিয়া, সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া খুব সহজ গলায় বলিল, "দাদা, বে করা আমার জীবনের আদর্শ নয়। পবিত্রতাই আমি চাই, তবে জীবনে যে অন্যায় করেছি—সে দুর্ব্বলতার বশে; পারি-না-পারি আদর্শকে কোন দিন আমি নীচু করবো না, কোন দিনও না—এই আমার ইচ্ছে। সমস্ত জীবন যদি পরাজয়কেই বরণ করতে হয় সেও ভাল—তবু দুর্ব্বলতার সঙ্গে সন্ধি করতে আমি নারাজ। আদর্শ চিরকাল আমার মাথায় থাক্, আমার দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাক্, তাও স্বীকার তবু দেবতার নৈবেদ্যকে যেন মাটিতে নামাবার মত দুর্ব্বলতা কখনো না আসে, দাদা তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর"—এই বলিয়া তরঙ্গিণী এক হাতে চোখ মুছিয়া, অন্য হাতে সুরেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

সুরেশ উঠিয়া পরম স্নেহে তরুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া, মৃদু হাসিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আজ এই গৃহ, এই গঙ্গা, এই আকাশ, সবই তাহার নিকট যেন অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসুশ্বেতা দেবী।

---

# শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ অপর যাহা বলিতে পারেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আলোচ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সূত্রকার ও ভাষ্যকার বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি হেতু দিয়াছেন, বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়ন—দ্বিজত্বকে হেতু দেওয়া হয় নাই; সুতরাং দ্বিজভিন্ন ব্যক্তি বেদের শ্রবণাদি করিতে পারিলে তাহারও বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—ইহাও তাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ইহার দ্বারাই বলা হইয়াছে যে, দ্বিজেতর ব্যক্তির বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, কারণ এস্থলে সাধ্য হইতেছে—শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানাভাব, তাহার হেতু হইতেছে—বেদের শ্রবণাধ্যয়নাভাব। এখন দ্বিজেরই বেদের শ্রবণাধ্যয়ন হয় বলিয়া বেদের শ্রবণাধ্যয়ন দ্বিজত্বের ব্যাপ্য। যেহেতু যেখানে যেখানে বেদের শ্রবণাধ্যয়ন সেই স্থানেই দ্বিজত্ব থাকে। আর বেদের শ্রবণাধ্যয়ন দ্বিজত্বের ব্যাপ্য হওয়ায় বেদের শ্রবণাধ্যয়নাভাবটি দ্বিজত্বাভাবের ব্যাপক হইবে। যেমন ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কিন্তু ধূমাভাব বহ্ন্যভাবের ব্যাপক হয়। আর ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের অভাব অনিবার্য্য, যেমন মনুষ্যত্ব না থাকিলে তাহার ব্যাপ্য ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বেদের শ্রবণাধ্যয়নাভাবপ্রযুক্ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার নাই বলায় দ্বিজত্বাভাবপ্রযুক্তও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই—ইহাই বলা হইয়াছে। অতএব দ্বিজত্বাভাবকে হেতু না দেওয়ায় শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—ইহা বলা অসঙ্গত।

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানাভাবের প্রতি

শ্রবণাধ্যয়নাভাবকে যখন কারণ বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণ যখন উপনয়নাভাব বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণ যখন দ্বিজত্বাভাব বলা হইয়াছে, তখন দ্বিজত্বাভাব শ্রবণাধ্যয়নাভাবের কারণ বলিয়া দ্বিজত্বাভাব শ্রবণাধ্যয়নাভাবের ব্যাপক হইতেছে। শ্রবণাধ্যয়নাভাবটি দ্বিজত্বাভাবের ব্যাপক হয় না। কারণই কার্য্যের ব্যাপক হয়, কার্য্য কখন কারণের ব্যাপক হয় না। যেমন কার্য্য যে ধূম, তাহা কারণ যে বহ্নি, তাহার ব্যাপ্যই হয়, ব্যাপক হয় না। অতএব উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে।

তাহার পর অন্য পথেও উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হয়। যথা—দ্বিজত্বাভাবটি ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ অনিয়ত কারণ হইয়া যায়। যাহা অনিয়ত কারণ তাহার দ্বারা কার্য্য সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয় না। যেমন ঘটের কারণ কুম্ভকার, কিন্তু কুম্ভকারের পিতা ঘটের পক্ষে কারণ নহে, উহা অন্যথাসিদ্ধ বা অনিয়ত কারণ; অর্থাৎ কুম্ভকারের পিতা থাকিলে বা না থাকিলেও কুম্ভকার ঘট উৎপাদন করিতে পারে। কারণের কারণ অন্যথাসিদ্ধ। অতএব দ্বিজত্বাভাবটি ব্রহ্মজ্ঞানাভাবের কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ হইতেছে। উহার দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানাভাব ঘটিবে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটি সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট হইতেছে, উহার দ্বারা আপত্তিকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, কার্য্যকারণভাবস্থলেই উক্ত অন্যথাসিদ্ধি দোষ দেখাইতে পারা যায়, নচেৎ নহে। আর তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞানাভাবরূপ অত্যন্তাভাবকে জন্য বা অনিত্য বলিতে হয়। উহা কিন্তু নিত্য বলিয়াই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। জন্য অত্যন্তাভাব সকলে স্বীকার করেন না। অতএব এ পথে যাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলে প্রশংসা নাই। তাহা হইলে বলিব—ব্রহ্মজ্ঞানাভাবকে না হয় আমরা ধ্বংসরূপ অভাব স্বীকার করিলাম। ধ্বংসটি সাদি বা জন্য, কিন্তু অনন্ত। ব্রহ্মজ্ঞান নিত্যবস্তু, অজ্ঞাননিবন্ধন তাঁহার আবরণ ঘটে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানাভাব 'জন্য' হইয়া থাকে, সেই আবরণ নষ্ট হইলেই নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকা-

শিত হয়। অবশ্য অজ্ঞানকে অনাদি বলা হয় বটে, কিন্তু ব্যবহার কালে এরূপও বলা হয় যে, কোথা হইতে আমার অজ্ঞান আসিল, ইত্যাদি। বস্তুতঃ অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়তাই অভীষ্ট, অনাদিত্বাদি বালবোধার্থ কল্পনাবিশেষ মনে হয়। অতএব উক্ত অন্যথাসিদ্ধিদোষবশতঃ সাধ্য যে শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানাভাব তাহার অভাব সিদ্ধ হইবে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটি সৎপ্রতিপক্ষদোষ দুষ্ট হওয়ায় অগ্রাহ্য হইবে।

তাহার পর অভাবের দিক্ দিয়া না যাইলেও দ্বিজত্বটি যে ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ তাহাতে কোন বাধাই হইতে পারে না। কারণ, বেদ-পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার কারণ—বেদের শ্রবণাধ্যয়ন, তাহার কারণ—উপনয়ন, তাহার কারণ—দ্বিজকুলে জন্ম। অতএব দ্বিজত্ব কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধই হইল। দ্বিজত্ব ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইলে দ্বিজত্বাভাব নিবন্ধন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব হইতে পারিত। কে বলিতে পারে যে, আচার্য্য ও সূত্রকার ইহা ভাবিয়াই শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানাভাবের প্রতি শ্রবণাধ্যয়নাভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন নাই?

আরও দেখা যায়—শ্রবণাধ্যয়নাভাব ও দ্বিজত্বাভাবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা পুরুষতন্ত্র, তাহা বস্তুতন্ত্র নহে। উহা ধূম ও বহ্নির ন্যায় সম্বন্ধ নহে। ইহা পুরুষ ইচ্ছা করিলে হয়, না করিলে হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে অন্যথা করাও যায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা ত ওরূপ নিয়ম করা যায় না। আর বেদাধ্যয়নাদি বিধিমূলক বলিয়াও বস্তুতন্ত্রের ন্যায় হইতে পারে না। যেহেতু ইহা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ সর্ব্বত্র হয় না। জ্ঞানের জন্য বেদাধ্যয়ন কর্ম্মকাণ্ড নহে। জ্ঞানে সমর্থ ব্যক্তিমাত্রেরই সমান অধিকার। ক্ষুধায় অন্নভোজনের ন্যায় প্রাণীমাত্রেরই ইহাতে সমান অধিকার। ঘট দেখিয়া বা ঘট শব্দ শুনিয়া জ্ঞানীর যেমন ঘটজ্ঞান হয়, অজ্ঞানী মূর্খেরও তদ্রূপ হয়। এইজন্য আচার্য্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বিধির ছায়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য পদ্মপাদাদি আচার্য্য তাহা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা শ্রবণাদিতে নিয়ম বিধি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নিবারণ জন্য শ্রদ্ধার উদ্রেক ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্ঞান হইলে

যখন বেদ অবেদ হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞানে কোন বিধি স্বীকার নিম্নাধিকারীকে সহায়তা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহার "ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে" এই জ্ঞান পুরাণাদি পাঠে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে তিনি অনুপনীত না হইয়াও বেদ অধ্যয়ন করিলে অর্থাৎ শ্রবণাদির বিধি পালন না করিলেও তাঁহার বিধি পালন জন্য যে প্রতিবন্ধক নাশ তাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাঁহার নিশ্চয়ই হইবে।

কেহ কেহ আবার বলেন—আচার্য্য যখন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু বেদের শ্রবণাধ্যয়ন, তাহার হেতু উপনয়ন এবং তাহার হেতু দ্বিজকুলে জন্ম বলিয়াছেন, কেবল বেদের শ্রবণাদিকে হেতু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তখন দ্বিজত্ব ও উপনীতত্ববিশিষ্ট যে বেদের শ্রবণাধ্যয়ন, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু বলা হইয়াছে। সুতরাং দ্বিজত্বের অন্যথাসিদ্ধি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে বলিব যে, জ্ঞানের প্রতি তাহা হইলে কেবল প্রমাণকেই কারণ বলা হইল না, পরন্তু বিধিকেও যে শ্রবণাদির ন্যায় জ্ঞানের জনক ও কারণ বলা হইল। কারণ, বিধির অধীনই উপনয়নাদি হইয়া থাকে। ইহা আচার্য্য সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ। অতএব এরূপ আপত্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না।

যদি বলা হয়—বেদের ব্রহ্মও অলৌকিক, তাহার সাধনও অলৌকিক, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বেদবিধির অনুসারেই করিতে হইবে, তাহা হইলে বলিব যে, ব্রহ্ম অলৌকিক নহে, উহা ভূতবস্তু—ইহা আচার্য্য বহুবার তারস্বরে বলিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় যায় না বলিয়া বেদের প্রামাণিকতা। আর ব্রহ্মজ্ঞান যখন উৎপাদ্য, সংস্কার্য্য বিকার্য্য ও আপ্য কোনরূপই নহে, উহা যখন নিত্য তখন তাহার জন্য বিধি কেবল বুদ্ধির সহায়তা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সমর্থ ও প্রার্থী শূদ্রাদির পক্ষে যে বিধিই আছে, তাহাই এতক্ষণ প্রমাণিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ "অবিধিপূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি" এইরূপ জ্ঞান কখনই জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল নহে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভগবানও বলিয়াছেন—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৬।২৪
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ১৬।২৩

অতএব, সমর্থ ও প্রার্থী স্ত্রী ও শূদ্রেরও বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে আচার্য্য-মতে ইহা সিদ্ধ হইল। সূত্রকার শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার না থাকিবার প্রতি শ্রবণ ও অধ্যয়নাভাবকে হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শূদ্রকুলে জন্মনিবন্ধনই যে ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকার হয়, আর তাহা বলিলেন না। ভাষ্যকারও উহার ব্যাখ্যায় যে জাতি-শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়াছেন, তাহাও সেই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন। প্রত্যুত তিনি "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" এই মহাভারতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক জাতিশূদ্রের অধিকার আছে বলায় যে সূত্রকারের অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য রামানুজ ভাষ্যমধ্যে আচার্য্য শঙ্করের এই শ্লোকটিকে পূর্ব্বপক্ষীয় কথারূপে গ্রহণ করিয়া স্ত্রী-শূদ্রের একেবারেই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই বলিয়াছেন। তিনি যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তদ্রূপ তাঁহার সিদ্ধান্তও তদনুকূল হইয়াছে। আর এই জন্যই রামানুজাচার্য্য এই স্থলেই আচার্য্যের অদ্বৈতবাদখণ্ডনে আর একবার যত্ন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সত্যাসত্য এস্থলে বিচার না করিলেও তিনি যে জীবনে অন্যথাচরণ করিতেন তাহা জানা যায়। যেহেতু তিনি চণ্ডালবংশসম্ভূত শঠকোপ মুনির পাদুকা আজীবনই প্রায় পূজা করিয়াছেন; শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট খাইবার জন্যও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞই ভাবিতেন। এই কারণে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যা এস্থলে আদরণীয় নহে। এস্থলে আচার্য্য শঙ্কর যত সূত্রের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন আচার্য্য রামানুজ তাহা করেন নাই ইহাই বোধ হয়।

যাঁহারা আচার্য্য-মতের অন্যথা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আজ কয়েকজন ব্রাহ্মণ সংস্কারবশতঃ বেদকে নিত্য অপৌরুষেয়

অভ্রান্ত বলিয়া থাকেন। সমগ্র ব্রাহ্মণজাতির তুলনায় কয় জন ব্রাহ্মণ বেদ কি তাহা জানেন, কয় জন ব্রাহ্মণ বেদ গ্রন্থের আকৃতি পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন? আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুকরণ করিয়া কত ব্রাহ্মণসন্তান বেদের মধ্যে প্রাচীন কালের সমাজচিত্র ও ইতিবৃত্ত মাত্র দেখিতেছেন। বেদে প্রাচীন কালের রীতিনীতি আছে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আজ অনেকে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ; উহা নিত্য কর্ত্তব্য, উহা না করিলে পাপ হয় বা পাপক্ষয় হয় না—এ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আজ কয় জন ব্রাহ্মণসন্তান বেদ পড়িতেছেন? ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ত কথাই নাই। এই ভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণও যদি বেদাধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বেদাধ্যয়ন একজন শূদ্রের বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা যে অধিক হইবে, তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না। যদি শূদ্রকুলে জন্মই একজনের পক্ষে বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত হইবার হেতু হয়, যদি বেদমন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহাদের পাপ হয়, আর তজ্জন্য তাহাদের কর্ণে গলিত সীসক ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম হওয়াই কি উচিত নহে যে, বেদে যাহাদের অভ্রান্ত বুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা নাই, বেদকে যাঁহারা নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া জ্ঞান করেন না, এবং তদনুসারে বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ করেন না, তাঁহারাই শূদ্র, আর যাঁহাদের তাহা আছে তাঁহারাই দ্বিজ।

ব্রাহ্মণ বেদহীন হইলে যে শূদ্র হয়, তাহা ত শাস্ত্রকারগণই পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের জন্যই উপনয়ন, বেদের জন্যই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের জন্য বেদ নহে। বেদ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আর যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রাহ্মণ। "ব্রহ্ম জানাতি ইতি" ব্রাহ্মণ একথা ত বালকেও জানে। বেদ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনাই নাই। পুরাণাদি পাঠে যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ জ্ঞান নহে।

অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি এই বঙ্গদেশের কথা ভাবা যায়, যে দেশে বুদ্ধির জন্য সর্ব্বত্র খ্যাতি আছে এবং সেই বুদ্ধির জন্য যাঁহারা গর্ব্ব অনুভবও করেন, তাঁহাদের মধ্যে বেদের

কিরূপ প্রচার, বেদের জন্য কিরূপ আগ্রহ তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই যে কলিকাতা সহরে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় ভিক্ষা করিয়া উপর্য্যুপরি দুইটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, যাহার প্রথমটি "ব্রাহ্মণ সমাজ"-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরে ঘোষিত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে শতাধিক বিদ্যার্থী থাকিলেও উভয়টিতে কয়টি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান বেদ শিক্ষা করিতেছে? বোধ হয় একটি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান এ স্থলে বেদ শিক্ষা করে না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে বঙ্গবাসীর কোন সাহায্যই নাই, সকলই হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীর সাহায্য। অথচ এই নগরীতেই দ্বিজ ভিন্নকে বেদাধ্যয়ন করান হইবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প দেখা যায়। এতদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? জাতিগত অধিকার নির্দ্দেশের যে বিষময় ফল তাহার ইহা-পেক্ষা উত্তম নিদর্শন আর কি হইতে পারে? যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মই বেদাধিকারের জ্ঞাপক হয়, যদি এতাদৃশ ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্নের বেদাধিকার থাকে, তাহা হইলে চীন কাবুলী ও তিব্বতীগণের সন্তানকে উপনয়ন দিয়া বেদদান করিতে কুণ্ঠা কেন? মনুর মতে ইহারা সকলই ত সেই ক্ষত্রিয়সন্তান, ব্রাহ্মণাদর্শন প্রযুক্ত বৃষলত্বপ্রাপ্ত। আমাদের নিকট যাহারা বন্য বর্ব্বর বলিয়া বহুদিন হইতে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা কি খৃষ্টান পাদরীগণের যত্নে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানের সমান আসন গ্রহণ করিতেছে না? ঐ যে মান্দ্রাজে কত অস্পৃশ্যজাতি প্রতিযোগিতাতে কৃতকার্য্য হইয়া হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির আসন অধিকার করিতেছে, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? যদি পাদরীগণের শিক্ষার গুণে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা হইলে কি বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারসমূহের ফলে তাহাদের আরও অধিক উন্নতি হইবার কথা নহে? যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে আদিশূরের প্রাসাদপ্রান্তে পতিত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মুঞ্জরিত হইতে পারে, যাঁহাদের যজ্ঞাগ্নিতে নালন্দার বিরাট বৌদ্ধবিহার সাধারণের শত চেষ্টাসত্ত্বেও ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যতেজের একমাত্র কারণ যে বৈদিক সংস্কার, তাহার

ফলে কি পতিত জাতির পুনরুত্থান হইতে পারে না? বেদ বিশ্বাসী হিন্দুর ইহা ভাবিতেও কি কষ্ট হয় না?

অবশ্য প্রকৃত স্বধর্ম্মপরায়ণ সমাজে ব্রাহ্মণের—অপরের কর্ম্মে এবং অপরের—অন্যের কর্ম্মে জন্মগত প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবারই কথা। যেমন জনকরাজ্যে ধর্ম্ম-ব্যাধের ব্রহ্মজ্ঞানসত্ত্বেও তাঁহার মাংসবিক্রয়ে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে বা সন্ন্যাসে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু সে সমাজ কি বহুকাল বিলুপ্ত হয় নাই? যে সমাজে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সম্যক্ হয় না, যে সমাজে বহু পুরুষ হইতে বেদাচার বিস্মৃত হইয়াছে, সে সমাজে সেরূপ আশা করা কি দুরাশা নহে? সে সমাজে দ্বিজকুলসম্ভূত মাত্রেরই বেদা-ধ্যয়নে অধিকার আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি বেদবিক্রয় ও বেদের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন অবশ্যম্ভাবী হইবে না? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জ্জুনের আশঙ্কিত অধর্ম্মস্রোতরূপ বর্ণসঙ্করপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে সময়োচিত ব্যবস্থার অভাব দেখিয়াই ভগবান্ বুদ্ধদেব আপামরসাধারণে পরম বেদ-জ্ঞান বিতরণ করিলেন, জাতি দেখিয়াই অধিকারনির্ণয়ের প্রথা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। আর ইহার মাত্রা যখন অত্যাচারে পরিণত হয় তখন তাহার সংশোধনার্থ আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব হয়। অথবা যদি সকল কর্ম্মেরই ভাল মন্দ দুইটি দিক্ থাকে, যদি সকল অশুভের মধ্যে শুভের সঞ্চার প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বুদ্ধ-দেবের এই কার্য্যের ফলে ভগবান্ শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছে এবং হয় ত এই বর্ত্তমান ম্লেচ্ছাধিকার, অনন্ত অশুভের সৃষ্টি করিয়াও অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার শাস্ত্রসমূহকে সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়া ভাবী কোন কল্যাণের সূচনা করিতেছে। আজ যখন জাতির অনুরূপ বুদ্ধি নাই, রাজা ও ধনিগণের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহদান-প্রবৃত্তি নাই, তখন আর জাতিকে অধিকারের প্রতি মুখ্যকারণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইতে পারে কি? আজ গুণকর্ম্মকে বা সামর্থ্য ও অর্থিত্বকে মুখ্য করিয়া এবং জাতিকে গৌণ করিয়া সংস্কারাদির প্রবর্ত্তন করিলে কি ভাল হয় না? যেহেতু আজ যে দ্বিজাতি দেখা যাইতেছে, তাঁহারা যথার্থ দ্বিজাতি নহে এবং

যে শূদ্রাদি দেখা যাইতেছে তাহারাও যথার্থ শূদ্র নহে। আজ গুণ-হীন দ্বিজাতিকে দ্বিজাতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াই পঞ্চ-মকারের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহাদের মদ্যপায়ীকে স্পর্শ করিলে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, তাঁহারাই আজ ধর্ম্মের নাম করিয়া গোপনে মদ্যপান করিতেছেন। কিন্তু গুণকর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধিকারের ব্যবস্থা করিলে এ সকল দোষ উত্তরোত্তর অল্পই হইবার কথা, মনে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ক্রমে আবার বর্ণাশ্রমাচার ফিরিয়া আসিতে পারিবে, গুণকর্ম্ম আবার জাতিগত হইয়া পড়িবে, আবার জনক ও রামরাজত্ব ফিরিয়া আসিবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই যখন তাঁহার সময়েই শোণিতগত বর্ণস্থায়িত্বে অসম্ভাবনা ঘোষণা করিয়াছেন, তখন আজ কেবল এজন্যই আগ্রহ করা কি বৃথা নহে? আর এই গুণ ও কর্ম্মকে প্রধান করিয়া এবং জাতিকে গৌণ করিয়া যদি আজ চলিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কি তাহারও ব্যবস্থা অসম্ভব হয়? কখনই নহে। বিবাহাদি কতিপয় জাতি-রক্ষক-সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গুণগত অধিকার দিলে কি সমাজের উন্নতিই হয় না? এই যে বৈদ্য-গণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইতেছেন তাঁহারা কি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতেছেন? কিংবা কখনও তাঁহারা ঐরূপ করিতে সমর্থ হইবেন? যদি হিন্দুধর্ম্ম থাকে তাহা হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় হইতেছেন তাঁহারাও কোন ক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন না। অতএব গুণ কর্ম্মের প্রাধান্য এবং জাতির গৌণতা স্বীকার করিয়া সমাজে বেদ-বিদ্যার বিস্তার করিলে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে কি-না তাহা আজ সুধীগণের ভাবিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

( সমাপ্ত ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

# শ্রীনিম্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষ্যম্

ব্রহ্মসূত্রম্—বাদরায়ণ-ব্যাস-বিরচিতম্

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদঃ।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ম সূত্র ॥

সূত্রার্থ :—অথ = অনন্তরং ; অতঃ = অতএব ; ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা = ব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্বের জিজ্ঞাসা।

শ্রীনিম্বার্ক কৃত বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ ভাষ্যানুবাদ :—ষড়ঙ্গবেদ পড়ার পর লোকের কর্ম্ম-ফলের ক্ষয় আছে, না উহা অক্ষয়, এইরূপ সংশয় উঠিলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত জ্ঞানলাভের জন্য জৈমিনীকৃত ধর্ম্ম মীমাংসা অধ্যয়ন করা উচিত। ইহা দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ, প্রকারভেদ এবং তাহার ফলের জ্ঞান হয়। কিন্তু (অথ অতঃপর যাঁহার, এই ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় যাগযজ্ঞের কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদিতে সান্তত্ব শেষ হইয়া যাওয়া, সাতিশয়ত্ব (কাহার সুখভোগ বেশী কাহারও কম এবং নিরতিশয়ত্ব (স্বর্গাদি সুখভোগ চিরস্থায়ী নয়) দোষ দেখিয়া, ঐ সকল পরিচ্ছিন্ন ভোগে অনাস্থা আসে, তাঁহার (মুমুক্ষু ব্যক্তির (অতঃ) সেই হেতু শ্রীভগবানের প্রসাদ ও দর্শন লাভেচ্ছায় প্রীতির সহিত কোন এক সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া ভক্তির সহিত স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য-স্বরূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয় (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা) ব্রহ্ম শব্দ অভিধেয় (বাচ্য) যে রমাকান্ত পুরুষোত্তম তাঁহার বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

[ ষড়ঙ্গ-বেদ—ষড়ঙ্গকে বেদাঙ্গও বলে। ইহারা (১) শিক্ষা ( the Science of proper articulation and pronunciation ), (২) ছন্দস্ ( the science of Prosody ), (৩) ব্যাকরণ ( Grammar ), (৪) নিরুক্ত ( Etymological explanation of difficult Vedic

words ), ৫ ) জ্যোতিষ Astronomy ) এবং কল্প ( Ritual or Ceremonial )। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগে কি করিয়া যাগ-যজ্ঞ করিতে হয় লেখা আছে। ইহার ফল স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি। যে দর্শন শাস্ত্রে ইহার যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহাকে জৈমিনী-কৃত ধর্ম্ম-মীমাংসা বলে। আর বেদের উপনিষৎ ভাগে জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তি বিষয়ক উপদেশ আছে। ইহাকে বেদান্ত বলে। যে শাস্ত্রে ইহার যুক্তি আছে তাহাকে ব্যাস কৃত ব্রহ্ম-মীমাংসা বলে।

আচার্য্য শঙ্করের মতে—"নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহকাল ও পরকালের ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পৎ অর্থাৎ লৌকিক ব্যাপার হইতে মনের উপরতিরূপ শম, বাহ্য করণ হইতে উপরতিরূপ দম, বিহিত নিত্য কর্ম্মে অনুরাগরূপ উপরতি, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনরূপ তিতিক্ষা, নিদ্রা আলস্য প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া মানসিক স্থিরতারূপ সমাধি, সর্ব্বত্র ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞানরূপ শ্রদ্ধা এবং মোক্ষেচ্ছা এই সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব কারণ। শমাদি সাধন সিদ্ধির পর, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে তাহার পূর্ব্বে নহে। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ নিম্বার্কের মতই বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে বেদোক্ত কর্ম্ম বিষয়ক বিচার কার্য্যের অনন্তর অর্থাৎ জৈমিনী সূত্রোক্ত কর্ম্ম-মীমাংসা জ্ঞাত হইবার পর, ব্রহ্ম বিষয়ের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়।" ]

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২য় সূ ॥

সূত্রার্থ:—অস্য = এই বিশ্বের, জন্মাদি যতঃ = জন্মাদি যাহা হইতে।

ভাষ্যানুবাদ:—এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত তাহা বলা হইতেছে। এই অচিন্ত্য বিচিত্র-সংস্থান সম্পন্ন ( পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত অনন্ত প্রকার বিশিষ্ট ), অসংখ্য নামরূপের আশ্রয় অচিন্ত্যরূপ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞাদি অনন্ত গুণের আশ্রয়, ব্রহ্মা, ঈশ এবং কালেরও যিনি নিয়ন্তা। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের লক্ষণ সূত্র হইতে এইরূপই বোঝা যায়।

[ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয় বল্লী হইতে এই সূত্র ব্যাসদেব সংগ্রহ করিয়াছেন। ভৃগুর্বৈবারুণিঃ। বরুণং পিতরং উপসসার।

অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ একদিন বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু পিতার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন।" বরুণ বলিলেন, "অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন ও বাক্য এ সমস্তই ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে দৃশ্যমান সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহাতে সমস্ত জাত-বস্তু জীবিত রহিয়াছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে সকল জীব প্রবেশ করে; তাঁহাকে তুমি জান, তিনিই ব্রহ্ম।"

আচার্য্য শঙ্করও এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বও উপক্ষিপ্ত হইয়াছে।" "বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তা সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালাদিহেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয়ভূত; মনের দ্বারাও অচিন্ত্য রচনাবিশিষ্ট, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম; ইহাই বাক্যার্থ।" ]

শাস্ত্র যোনিত্বাৎ॥ ৩য় সূ॥

সূত্রার্থ:—শাস্ত্র যোনিত্বাৎ=শাস্ত্র প্রমাণ হইতে।

ভাষ্যানুবাদ:—ব্রহ্ম যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কি? উক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম শব্দাভিধেয় যে বস্তু তাহা জানিবার উপায় শাস্ত্র প্রমাণ।

[ আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, (১) "সর্ব্বজ্ঞ-কল্প প্রদীপবৎ সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক অনেক বিদ্যার আধারভূত বিধায় অতি পুষ্কল ঋগ্বেদাদি মহাশাস্ত্রেরও সেই ব্রহ্মই কারণ বলিয়া জানিবে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য হইতে এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ সমন্বিত ঋগ্বেদাদি মহাশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্ভবে না।" (২) "অথবা ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ পরিগ্রহে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতেই ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

এই সূত্রের শ্রুতি প্রমাণ—"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—উপ-

নিষদের দ্বারা যে পুরুষকে জানা যায় সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি"—সেই এই আত্মাকে ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়নদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। ]

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪র্থ সূ ॥

সূত্রার্থ :—তৎ = সেই ব্রহ্মই যে শ্রুতিবাক্য সকলের প্রতিপাদ্য তাহা কে বলিল ; তু = শব্দ আশঙ্কা নিরাশ করিবার জন্য ; সমন্বয়াৎ = কারণ এক ব্রহ্মেতেই সকল শ্রুতির সমন্বয় হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—তোমরা বলিতেছ শাস্ত্রই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি সমস্ত বেদ ক্রিয়াপরত্ব অর্থাৎ যাগাদিকেই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহা ছাড়া বেদে যাহা কিছু আছে তাহা অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ যাগাদি সম্বন্ধে যে বিধি বাক্য আছে, তাহারই অনুযায়ী সে সকলের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা যজমানের স্তুতি স্বরূপে সেগুলির ব্যবহার হইয়াছে। ইহাদের নিজেদের কোনও স্বতন্ত্র অর্থ নাই, বিধিবাক্যের সহিত একযোগে ইহাদের অর্থ করিতে হইবে। বেদের ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য সকল, ( যেমন তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি ) ক্রতুর ( যজ্ঞের ) অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার স্তুতিমাত্র, ( যেমন রাজাকে স্তাবকেরা সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া থাকে )।

এইরূপ প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিব, ব্রহ্মই বিশ্বকারণ এবং শাস্ত্র তাঁহাকে প্রতিপাদন করে, কারণ প্রধান জ্ঞাতব্যরূপে ব্রহ্মেতেই সমস্ত বেদবাক্যের অন্বয় হইয়াছে। অথবা সংক্ষেপে সূত্রের অর্থ এইরূপ—বেদ-বাক্য সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয়। কর্ম্মে ( যাগাদিতে ) বেদের সমন্বয় ( তাৎপর্য্য ) বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা মাত্র উৎপন্ন হইলে কর্ম্মের শক্তিক্ষয় হয়। অতএব ক্রতুর অঙ্গ ব্রহ্ম ইহা বালভাষিত। শ্রুতি বলিতেছেন, কর্ম্ম, কর্ত্তা সবই ব্রহ্মের নিয়স্তৃ-ত্বের অধীন এবং তিনিই কর্ম্ম-ফল দাতা। ( যেমন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং", "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং )।" কাজেকাজেই তিনি ঐ সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্ম বিবিদিষা ( মোক্ষেচ্ছা ) উৎপাদন করে ; কাজেকাজেই

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনীভূত যে জ্ঞান, যাহা মোক্ষেচ্ছা না হইলে হয় না, তাহার দূর কারণ এবং উপকারক।—এই ভাবে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমন্বয় করিতে হইবে। বিবিদিষা শ্রুতি সকল ইহাই নিশ্চয় করে। "তমেতমাত্মানং বেদান্ত-বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা" —সেই এই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন শাস্ত্র ব্রহ্মকে যেমন প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণের অগম্য বলিয়াছেন তেমনি তিনি শাস্ত্র-প্রমাণেরও অগম্য বলিয়াছেন। (যেমন "অবাঙ্মনসগোচরম্", "অশব্দমস্পর্শং", "যতো বাচা-নিবর্ত্তন্তে)।" এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্র প্রমাণগম্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নহেন। কারণ সাক্ষাৎ (Direct) অথবা পরম্পরা (Indirect) কারণ সম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতির সমন্বয় ব্রহ্মেতেই। বিশেষতঃ যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের লক্ষণ এবং প্রমাণ আছে তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মে সমন্বিত। (যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। শাণ্ডিল্য বিদ্যা, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, মধুবিদ্যা প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকোপাসনা আছে তাহারা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মে সমন্বিত। ভিন্নার্থবোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মতেই সমন্বয় হয়। কারণ সেই সেই ব্যাক্যের যে বিষয় তাহা সমভাবে ব্রহ্মাত্মকরূপেই শ্রুতিতে মুখ্যবাচ্যত্ব হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মকে শ্রুতি প্রমাণগম্য বলিলে, যে সকল শ্রুতি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম শব্দের অবিষয়, তাহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। না, এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, কারণ "অশব্দম" প্রভৃতি শ্রুতির সহিত "সর্ব্বং খল্বিদং" প্রভৃতি শ্রুতির প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নাই। কারণ যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণসকলের ইয়ত্তা নিষেধপর মাত্র (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—ব্রহ্মের ইতি করতে নেই)।

আচ্ছা, "শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম"—এই যে বাক্য ইহার বাচ্য (প্রতিপাদ্য বা বিষয়) কে? যদি বল ব্রহ্ম, তাহা হইলে তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

হইল ; ব্রহ্ম, শব্দের বাচ্য হইয়া পড়িলেন। আর যদি বল "না", তাহা হইলেও কার্য্যতঃ ব্রহ্ম শব্দ-জন্য হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য যে বস্তু তাহা তিনি ঐ শব্দের দ্বারা নিশ্চয়ই বোঝেন, না বুঝিলে "না" বলিতে পারিতেন না।

অতএব বুঝিতে হইবে, সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্য-শক্তি বিশ্বের জন্মাদির হেতু, বেদ-প্রমাণগম্য, সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ভগবান বাসুদেবই সমস্ত শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার বিষয় এবং সমন্বয় স্থান।

[ এই সূত্রের শঙ্কার উৎপত্তি স্থল জৈমিনী-সূত্র, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থ-ত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্",—বেদ সকলই ক্রিয়ার্থ, বেদে ক্রিয়া ভিন্ন অন্য বিষয়ের আনর্থক্য।

আচার্য্য শঙ্করও একই উপদেশ করিতেছেন, "সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে, তাহা আপত্তি-ভঞ্জন-বোধক। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা বেদান্ত বাক্যে জানা যায়। যেহেতু সকল বেদান্ত বাক্যই তাৎপর্য্য বশতঃ ব্রহ্মার্থের প্রতিপাদক বিধায় অনুগত রহিয়াছে।" ]

ঈক্ষাতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ম সূ ॥

সূত্রার্থ :—ঈক্ষতে ( জগৎ-কারণ ঈক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন ) ; ন = এই জগতের কারণ জড় নহে ; অশব্দম্ = উহা অবৈদিক।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্য শাস্ত্র প্রতিপাদিত অচেতন প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা শ্রুতিপ্রমাণ বর্জ্জিত। কারণ, শ্রুতি জগৎ-কারণকে 'ঈক্ষণ' শব্দের দ্বারা চেতনধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিতেছেন।

[ শ্রুতি প্রমাণ "সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত"—হে সোম্য! এই জগৎ অগ্রে ভেদ রহিত অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ছিল। সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন। ( ছা, উ ৬।২ )

"আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স

ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত”—এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত ছিল, অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না, সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, ‘লোক সকলকে সৃষ্টি করিব কি’? তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন।

আচার্য্য রামানুজ বলেন, “জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা) প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে সূত্রকার কর্তৃক উক্ত শ্রুতি সমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্কর মত) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কেন না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদে ঈশ্বরের সাক্ষিত্ব ধর্ম্মও অপারমার্থিক বা অসত্য; (সুতরাং গৌণ)। বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য রূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। চেতনত্ব অর্থই চৈতন্য গুণের যোগ বা সম্বন্ধ; অতএব, ঈক্ষণগুণহীন পদার্থও (ব্রহ্ম) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান।

রামানুজ শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম বা নিত্য ঈশ্বরও স্বীকার করিয়াছেন। “ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানবান্ ও নিত্যক্রিয়াশ্রয় বলিয়া কি কারণে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব হানি হইতে পারে? যিনি সকল বিষয়কে প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্ব বিষয় প্রকাশনে সক্ষম নিত্যজ্ঞান আছে; তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা অতি বিপ্রসিদ্ধ মত।” (শঙ্কর ভাষ্য) তাহা হইলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতের প্রভেদ কোথায়? নিম্বার্ক ব্রহ্মের যথার্থ পরিণাম স্বীকার করেন কিন্তু শঙ্কর তাহার বিবর্ত্ত পরিণাম স্বীকার করেন—ইহাই পার্থক্য। ]

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ সূ ॥

**সূত্রার্থ:**—গৌণ চেৎ=যদি বলি ঈক্ষণ শব্দটি গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে; ন=না; আত্মশব্দাৎ=কারণ তাহার পর “আত্ম” শব্দ আছে।

**ভাষ্যানুবাদ:**—ঐ ঈক্ষণ শব্দকে গৌণ প্রয়োগ বলা যায় না। —কেন? আত্ম শব্দ হেতু।

[ শ্রুতি প্রমাণ :—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, এই জগৎ তদাত্মক; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মা।

কিন্তু আত্মা শব্দও চেতন ও অচেতন উভয় স্থলেই প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন পুষ্পের আত্মা গন্ধ। সেই জন্য পরবর্ত্তী সূত্র লিখিত হইতেছে। ]

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—তৎ নিষ্ঠস্য=সেই জগৎ-কারণে নিষ্ঠাসম্পন্ন পুরুষের; মোক্ষ উপদেশাৎ=মোক্ষলাভ করেন এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—সৎ এবং আত্মা শব্দ সাংখ্যের প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, 'সৎ', 'আত্মা' ও ঈক্ষণকর্ত্তার বাচ্য যে আদি-কারণ তাঁহাতে নিষ্ঠাসম্পন্ন পুরুষের তদ্ভাবাপত্তি ধ্যেয় স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ) মোক্ষের উপদেশ আছে বলিয়া।

[ শ্রুতি-প্রমাণ :—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে"—সেই পুরুষের ততকালই বিলম্ব যে পর্য্যন্ত না দেহপাত হয়, এবং তদনন্তর তাঁহার সেই উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

চেতন জীব কখনও অচেতন প্রধানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই হেতু পরবর্ত্তী সূত্র লিখিত হইতেছে ]।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—হেয়ত্ব=সেই সৎকে শ্রুতি হেয় বা পরিত্যজ্য; অবচনাৎ চ=বলেন নাই বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—'সৎ' যদি জড় প্রধান হইত তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ হিতৈষী শাস্ত্র কখন মোক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ করিতেন না বরং তাহা হেয় এবং অপ্রয়োজন বলিয়া উপদেশ করিতেন। তাহা যখন বলেন নাই তখন জগৎকারণ 'সৎ' এবং "আত্ম' শব্দ সাংখ্যের জড় প্রধান নহে।

প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ ৯ সূ ॥

( এই সূত্রটি শাঙ্কর দর্শনে দেখা যায় না )

সূত্রার্থ :—প্রতিজ্ঞা = শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; বিরোধাৎ = সৎ শব্দকে জড় বলিলে তাহার বিরোধ হয়, এই হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয় শ্রুতি তাহার উপদেশ করিবেন বলিয়া "সদেব সোম্য" মন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের বিষয় যদি অচেতন প্রধান হয়, তাহা হইলে যাহা বলিবেন বলিয়াছিলেন তাহা আর বলা হয় না, কারণ তাহার পর আর কোনও চৈতন্য বস্তুর উপদেশ করা হয় নাই, কাজেকাজেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা হানি দোষ হয়। ( অচেতন প্রধানের জ্ঞান হইলে কখন চেতন পরমাত্মার জ্ঞান হয় না। ইহা সাংখ্য শাস্ত্রেরও অভিমত। ) সেই হেতু অচেতন-কারণবাদ সাধু নহে।

স্বাপ্যয়াৎ ॥ সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ :—স্ব = নিজেতেই ; অপ্যয়াৎ = লীন হয় বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—'সৎ' যে প্রধান নহে তাহার আর একটি কারণ এই, শ্রুতি জগৎ-কারণকে সৎ বলিয়া, তাহার পর বলিয়াছেন সুষুপ্তি কালে জীব এই সদাত্মাতে লীন হন। "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা, সোম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতো ভবতি"—হে সোম্য! সুপ্তি কালে এই পুরুষের স্বপিতি নাম হয়, তখন তিনি সৎ সম্পন্ন হয়েন, "স্ব" তে ( আত্মাতে ) অপীত ( লীন ) হয়েন, অতএব ইঁহাকে স্বপিতি নামে আখ্যাত করা যায় ; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন।

এই সকল অর্থ হেতু অচেতন জগৎ কারণ অসম্ভব। ব্রহ্মই জগৎ-কারণ।

গতিসামান্যাৎ ॥ ১১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—গতি সামান্যাৎ = সমস্ত শ্রুতিরই চেতন জগৎ কারণ সম্বন্ধে সাধারণ গতি।

ভাষ্যানুবাদ :—কেবল ছান্দোগ্য উপনিষৎ নহে, অপরাপর শ্রুতিও

চেতন জগৎ-কারণের সমান ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব অচেতন প্রধান জগৎ-কারণ যুক্ত নহে।

[ শ্রুতি প্রমাণ—"আত্মন এবেদং সর্ব্বম্"—আত্মা হইতেই এতৎ সমস্ত জাত হইয়াছে। "স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"—সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপ জীবেরও তিনিই অধিপতি। তাঁহার জনক কেহ নাই। এবং অধিপতিও নাই। ( শ্বেতাশ্বতর )।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম যে জগৎ-কারণ তাহা শ্রুতির অর্থ নাও হইতে পারে। প্রলয় কালে প্রকৃতিলীন কোনও চেতন পুরুষ পরবর্ত্তী কল্পের সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন। ইহা খণ্ডনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্র লিখিত হইতেছে। ]

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতত্বাৎ চ = জগৎ-কারণ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শ্রুতি আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে যিনি জগৎ কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর এবং চেতন স্বভাব; সেই জন্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিলীন পুরুষ জগৎ-কারণ হইতে পারেন না।

[ কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতি "আনন্দময়" জীবকেই জগৎ কারণ বলিতেছেন, সেই হেতু শ্বেতাশ্বতরের "স কারণং" কে ( আনন্দময় জীবকেই ) ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পর সূত্রে এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর দেওয়া হইতেছে। ]

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—আনন্দময়ঃ = জগৎকারণ সম্বন্ধে আনন্দময় শব্দটির ব্যবহার, অভ্যাসাৎ = পুনঃ পুনঃ হওয়ায়।

ভাষ্যানুবাদ :—তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দময় আত্মা-শব্দের বিষয় পরমাত্মা, জীব নহে। কারণ ঐ শ্রুতি পরমাত্ম বিষয়ক আনন্দময় শব্দের বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন।

( ক্রমশঃ ) —বাসুদেবানন্দ।

# কথাপ্রসঙ্গে

আজ যে হিন্দু মুসলমান-দ্বন্দ্ব বাঙ্গলার রাজধানী হইতে পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার মূল কারণ বলিতে গিয়া যখন নানা মুনি নানা মত এবং নানা মোল্লা নানা ফতোয়া প্রচার করিয়াছেন তখন সে সম্বন্ধে কোন মতামত না দিয়া যাহাতে এই গৃহবিবাদ প্রশমিত হইতে পারে তাহার একটা ব্যবস্থা দেখাই এখন বিধেয়। কি করিলে মুসলমানগণ উন্নতমনা হইতে পারেন এবং কি করিলেই বা হিন্দুগণ ভীরুতা বর্জ্জন ও ভবিষ্যতে আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দু-সংগঠনের সহস্র সহস্র শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইলেও ভীরুতা বর্জ্জন সম্ভব হইবে না, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুগণ সংযত হইয়া শক্তির সাধনা না করিবেন। সংযত হইয়া কাজ না করিলে, 'বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়' নীতি প্রবল হইয়া হিন্দুগণকে মুসলমানগণের ন্যায় পরমত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিবে। এখন না হয় হিন্দুগণ উৎপীড়িত হইতেছেন—তখন কিন্তু মুসলমানগণ উৎপীড়িত হইবেন; কিন্তু তাহাতে দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না—শুধু চক্রটা একটু ঘুরিয়া যাইবে মাত্র। এইজন্য হিন্দুগণকে শক্তির সাধনা করিতে হইবে—'জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।'

মুসলমান-সমাজেও তদ্রূপ তাঞ্জিমের খেলাফতের যতই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন তাহার সভ্য (member) হইবার একমাত্র যোগ্যতা (qualification) যদি সুন্নত হয়—তাহা হইলে মুসলমানেরও এই তিরিক্ষি মেজাজ কখন দূর হইবে না। এই সকল দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন—যে সকল মুসলমান নেতা এবম্প্রকার মুসলমান-সমাজের দ্বারা হিন্দুর নির্য্যাতন সমর্থন না করেন, তাঁহারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া এমন এক শ্রেণীর মুসলমান লইয়া দল গঠন করুন,

যাহাদের মূলমন্ত্র হইবে—"পরের বেদনা বোঝে আপনার প্রাণে।" আজও দেশে সৎ-সাহসী বহু মুসলমান আছেন, যাঁহারা সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুষ্টিয়ার মধু সেখের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হিন্দু-সমাজ হিন্দুসংগঠন আরম্ভ করিয়াছেন, মুসলমান-সমাজ তাঞ্জিমের প্রসারতায় মন দিয়াছেন; কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এইরূপ সন্ধিক্ষণে যে দল গঠন হইতেছে, তাহাদের সভ্য হইবার বিশেষ যোগ্যতা থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন, তাহা সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা যদুবংশ ধ্বংসের ন্যায় নিজ নিজ সমাজ ধ্বংশ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবে। এখন, কঠোর শৃঙ্খলার সহিত অদ্ভুত সংযমের সমাবেশ করিতে হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকদিগকে 'নাগরিক' বিধি-নিয়ম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া স্ব স্ব সমাজ-সংগঠনের সভ্য করিয়া লইতে হইবে। সংগঠন ও শিক্ষা পাশাপাশি চালাইতে হইবে, নতুবা উভয় সমাজের গুণ্ডা-প্রকৃতি লোকেরা সমাজের শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক অনাদৃত এবং উত্যক্ত হইয়া পরস্পরে মিলিত ( alliance ) হইবেই; তখন গুণ্ডা দমন অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক নেতাগণের ভাবিয়া দেখা উচিত আজ তাঁহারা যে শিক্ষা দীক্ষায় আপনাপন সমাজ সংগঠন করিবেন, তাহার ফল বহু বর্ষ এবং বহু দেশ ব্যাপী হইবে। আজ মন্দির এবং মসজিদ ধ্বংসে উৎসাহ দেখাইলে, কালে ভারত মন্দির ও মসজিদ শূন্য হইয়া যাইবে; আজ তাঁহারা লুণ্ঠনে ঘৃণা প্রকাশ না করিলে, কালে বলসেভিক দলের ন্যায় ভারতেও "কুকুরে চিবাবে যত 'নাইটের' ( Knight ) এর মাথা।" সাহসে সাহস আনয়ন করে—ভীরুতা নীচতা প্রসব করে। ইহা মনে না রাখিলে হিন্দুরও 'Nation of Cowards' ( ভীরুর জাত ) অপবাদ দূর হইবে না, পক্ষান্তরে মুসলমানকেও শুনিতে হইবে—There is no difference between a Moslem Goonda and a Moslem Gentleman.

# সমালোচনা

**যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—**
মূল্য ১৷৷• টাকা, প্রণেতা—শ্রীমতিলাল রায়, প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ; ২৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

গ্রন্থকার বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার ভাষায় বিশেষত্ব আছে, মাধুর্য্য আছে, মাদকতা আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের, ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধ কি ; স্বামিজীর সাধনা কোন্ পথে কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ; কাহার শক্তি দিয়া, কোন্ সম্পদে বিভূষিত করিয়া তিনি জাতিকে গড়িতে ও সাজাইতে চাহিয়াছিলেন ; কোথায় দাঁড়াইয়া, কি চক্ষুতে দেখিয়া স্বামিজী দেশের মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথরকে নিজের রক্ত নিজের ভাই বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থকার নিজ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকার, স্বামী বিবেকানন্দকে সমগ্র জগতের বলিয়া মনে করেন, আমাদেরও বিশ্বাস—তাঁহার জীবন ও শিক্ষাকে কোন সম্প্রদায়, কোন দেশ বা কোন জাতি গণ্ডি দিয়া কোন দিন আবদ্ধ রাখিতে পারে না, তাই গ্রন্থকার যেখানে বলিতেছেন, "আলমবাজারে যে নবগৃহ রচনার সূচনা—যে চিতাভস্মকে সম্পদ করিয়া নূতন নগর পত্তনের সূত্রপাত, নব জাতি গঠনের সে অপার্থিব উপাদান শুধু কি বেলুড়ের শঙ্খ ঘণ্টানিনাদিত দেবালয়-দুর্গে রুদ্ধ থাকিবে, তাহা কি কেবল ত্যাগ বৈরাগ্যের গৈরিক লক্ষণ যুক্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা কি সহস্র শীর্ষে সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সর্ব্বত্র বিচিত্ররূপে, বিচিত্র বর্ণে, ভাবে, রসে জাতিকে সম্পৎ-শালী করিবে না ?"—এই উক্তির আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে কোন কোন স্থলে গ্রন্থকারের সহিত পাঠক-পাঠিকার ভাবের পার্থক্য

ঘটিতে পারে, তাহার কারণ, স্বামিজীকে শ্রীযুক্ত মতিবাবু নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন ঠিক সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর স্বামিজীকে আত্মদান করিয়া লীলা সংবরণ করেন।" উহা ১৮৮৫ না হইয়া ১৮৮৬ হইবে।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও চিত্র-সম্পদে বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

## কার্য্য-বিবরণী

**বেলুড় (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিল্প-বিদ্যালয়ের** ১৯২৪-২৫ সনের কার্য্য-বিবরণী। ইহা পাঠ করিলেই সহৃদয় দেশবাসী দেখিতে পাইবেন—দেশে এই প্রকারের শিল্প বিদ্যালয়ের উপকারিতা অনুভূত হইলেও অর্থাভাবে (১) বিদ্যালয় গৃহ এবং বিদ্যার্থী ভবন Boarding House নির্ম্মাণ, (২) যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, এবং (৩) বিদ্যার্থীদের জন্য (তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহে অক্ষম বলিয়া) একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এ যাবৎ হইয়া উঠে নাই। ধীরে ধীরে এই শিল্প-বিদ্যালয় যে ভাবে কর্ম্ম দ্বারা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে বিশ্বাস হয়, অনতিকাল মধ্যে এই সকল অভাব পূর্ণ হইয়া এই বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ কল্যাণ হইবে। এই শিল্প-বিদ্যালয় মাত্র ৬টি বিদ্যার্থীকে লইয়া খোলা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ৫২টি বিদ্যার্থী এই বিদ্যালয়ের অধীনে আসিয়া, ৪৩ জন শিক্ষা সমাপনান্তে জীবিকা সংস্থানের জন্য শিল্প-কর্ম্ম করিতেছে। তন্মধ্যে ২৩টি বিদ্যার্থীর কার্য্যাবলী বিবরণীতে উল্লেখ আছে। এই শিল্প-বিদ্যালয়ে মোটামুটি লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎসঙ্গে রুচি ও সামর্থ্যানুসারে বিদ্যার্থীদের সূতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁতে কাপড় বোনা, কাপড়ে রং দেওয়া, মোজা বোনা এবং দর্জ্জী, সূত্রধর ও দপ্তরীর কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্যবর্ষে ১১টি বিদ্যার্থী মিশনের সাহায্যে বিদ্যার্থী ভবনে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্তসহ—

১৯২৪ সালের মোট আয় ৭২৯৸৶৫—খরচ ৮৩২৲৫

১৯২৫ " " " ১৪৮৩৸৶— " ১৩৫৮৸৶১০

উদ্বৃত্ততহবিল ১৪০৷৴১০

আমরা দেশবাসীকে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্য-বিবরণী পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি এবং যাঁহারা এই প্রকার দেশ ও সমাজ হিতকর গঠনমূলক কাজ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্ম পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। সেবকগণের একনিষ্ঠ সাধনা ক্ষুদ্র কার্য্যকে কালে অতি বৃহৎ আকার প্রদান করে—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। পাঠক এখানেও দেখিবেন, সামান্য জিনিষপত্র এবং মাত্র দুইটি বিদ্যার্থী লইয়া যে কাজের আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আজ ধীরে অথচ কিরূপ দৃঢ়ভাবে সহিত অগ্রসর হইতেছে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই শিল্প বিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়াছেন, মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহোদয় তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

চট্টগ্রাম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৩৩২ সনের কার্য্য বিবরণী। আলোচ্য বর্ষে— ক) সেবা (খ) শিক্ষা ও (গ) প্রচার বিভাগের কাজ জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দেশ ও দশের জন্য হইয়াছে। ১৯২৫ এপ্রিল হইতে ১৯২৬—১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত গত বৎসরে উদ্বৃত্ত জমাসহ আয় ১.৬৩৸৴৭॥ এবং ব্যয়—৫৩৭৷৴৫।

আশ্রমের কর্ম্মিগণ যে মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি—শ্রীভগবান তাঁহাদের সেই আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবার সামর্থ্য দিন। বাদ বাকী বাড়ী-ঘর-হাসপাতাল-পুল প্রভৃতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

---

## সংঘ-বার্ত্তা

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, বৃন্দাবন—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, অক্লান্তকর্ম্মা ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ (নাড়ু মহারাজ) গত ২৬শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতে বৃন্দাবনধামে শরীর-ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদ-পদ্মে মিলিত হইয়াছেন।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা-কার্য্য

বিগত কয়েকমাস যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া এবং মেদিনীপুর জেলার পাইকমাঝিটা কেন্দ্রে দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য করিয়াছে, তাহা ছাড়া আরাকান প্রদেশের ঝটিকাবিধ্বস্ত লোকদিগকেও সাহায্য করা হইয়াছে। জামতাড়া কেন্দ্রে সেবকগণ জুন ও জুলাই মাসে প্রায় নয় সপ্তাহ ধরিয়া চাউল, বীজধান, ঘর মেরামত, কূপ খনন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার পাইকমাঝিটা কেন্দ্রেও ঐরূপ এক মাস যাবৎ চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল। বর্ষা আরম্ভ হইবার পর সাঁওতাল পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় চাষের জমীতে মজুরেরা কাজ পাওয়ায় সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে, আরাকানে এখনও কাজ চলিতেছে। উপরোক্ত জেলাদ্বয়ের কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে সাধারণের নিকট এই সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই মেদিনীপুর জেলায় সবঙ্গ ও পিংলা থানার ভীষণ বন্যার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, স্থানীয় লোকেরাও আমাদের নিকট উপরোক্ত স্থান সমূহ হইতে সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৬৫ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া ১১১ খানি গ্রাম জলমগ্ন এবং প্রায় ৪০০০০ হাজার লোক বিপন্ন হইয়াছে। আমাদের কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্ম্মী বন্যাপীড়িত স্থান সমূহে চারিটি কেন্দ্র খুলিয়া সেবাকার্য্য করিতেছেন। সহৃদয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়াই, মিশন বরাবর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছে। এবারও এই ভীষণ বন্যাবিধ্বস্ত সহস্র সহস্র নরনারীর পক্ষ হইতে আমরা দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি। আশা করি, আমাদের আবেদন বিফলে যাইবে না।

যিনি যাহা দান করিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

১। অধ্যক্ষ—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, পোঃ বেলুড় জেলা হাওড়া।

২। সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

( স্বাক্ষর ) সারদানন্দ, সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

# সূর্য্যের প্রতি পৃথিবী

মাঝে যদি রাখ ব্যবধান
কেন তবে কর আকর্ষণ ?
ছুটে যাই পাগল পরাণ ;
মিলনের কোথা আলিঙ্গন ?

ভরি মহা ব্যোমের শ্রবণ
সিন্ধু-কণ্ঠে নিশিদিনমান,
উঠে মম আকুল ক্রন্দন,
পরশিতে পারে না পরাণ।

ঘূর্ণমান চক্রে যাতনার
পিশিতেছে পাষাণ হৃদয়,
মাঝে মাঝে অনল উদ্গার,
স্মৃতি তবু ভুলিবার নয়।

এস তুমি প্রলয়ের রথে
অট্ট হাসে ভরিয়া অম্বর,
হোক্ মহা মরণের পথে
অগ্নি-কুণ্ডে মিলন সুন্দর।

আকাঙ্ক্ষার হোক্ অবসান,
থেমে যাক্ চির ছুটাছুটি,
আমিত্বের যটুক্ নির্ব্বাণ,
ব্যবধান দেহ নাথ! টুটি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

# শক্তিপূজা

শক্তিপূজা, জগতের অধ্যাত্ম-জ্ঞান-ভাণ্ডারের ভাবতায় ঋষিকুল আবিষ্কৃত নিরূপম কৌস্তুভমণি। সুদূর বৈদিক যুগের মহিমময় প্রভাতে ভারতীয় তপোবনের নিভৃত নিকুঞ্জে অম্ভৃণ নামক ঋষির দুহিতা বাঙ্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মাকে জগতের যাবতীয় শক্তির মূল কেন্দ্ররূপে উপলব্ধি করিয়া দেবীসূক্তে তাহা প্রকাশ করিতেছেন—'আমিই রুদ্র বসু, আদিত্য ও বিশ্বেদেব রূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবশত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ-দেবকে আমিই স্বীয় শক্তিতে ধারণ করিতেছি, আমিই কর্ম্মফলদাতা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, উপাস্য ও উপাসক, যে কেহ যে কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তদ্দ্বারা আমারই উপাসনা হয়, আমিই সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় প্রাণ ও ক্রিয়া-শক্তির একমাত্র প্রেরয়িত্রী, দর্শন, শ্রবণ, প্রাণন প্রভৃতি সকল ক্রিয়া আমার শক্তিতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমার এই দিব্য শক্তি-তত্ত্ব যাহারা অবগত নহে তাহারাই হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মত্ব, ঋষিত্ব, এমন কি তত্ত্বজ্ঞানও প্রদান করিতে পারি, ব্রহ্মদ্বেষী অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত রুদ্রের ধনুতে আমিই জ্যা আরোপন করি, জগতের শত্রু হননকারী যাবতীয় তেজ আমা হইতেই উদ্ভূত, অধিক কি আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্রী অথচ স্বাধীনা নিত্যমুক্তা।' ঋগ্বেদোক্ত এই দেবীসূক্তেই শক্তিতত্ত্বের প্রথম প্রকাশ, তার পর পুরাণেতিহাসে উহার বিস্তার এবং তন্ত্রশাস্ত্রে উহার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় পদার্থ, সকল গুণ, সকল প্রকার ক্রিয়া ও সমগ্র জ্ঞান এক কথায়—প্রকাশমান যাহা কিছু, সকলই সেই অদ্বয়া ব্রহ্ম শক্তিরই বিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ জগদুপাদান নির্গুণ পরব্রহ্ম ও ত্রিগুণাত্মিকা অদ্বয়া ব্রহ্মশক্তি অভেদ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির মত

পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত অগ্নির প্রকাশকত্ব ও দাহকত্ব রূপ শক্তিদ্বয়কে ছাড়িয়া অগ্নিকে যেমন ধরা, ছোঁয়া, বোঝা বা চিন্তা করাই চলে না, উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে তাহা অনির্ব্বচনীয় সত্তা মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্ম-শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে ধরা, ছোঁয়া, ধ্যান, চিন্তা বা উপাসনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাতি, ক্রিয়া, গুণ বা দ্রব্য এই প্রকাশধর্ম্মচতুষ্টয়ের যে কোনও একটি বা ততোধিক কোনও বস্তুতে থাকিলে তবে তাহা ব্যক্ত হয়, যাহাতে এই চারিটিরই অভাব তাহা অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় সত্তামাত্র। প্রকাশ পাইতে হইলেই এই চারিটির সহায়তা লইতে হয়, এমন কি পরব্রহ্মকেও ধ্যান, চিন্তা বা উপাসনার বিষয়ীভূত করিতে হইলে, উক্ত চারিটির এক বা ততোধিক তাঁহাতে আরোপ করা প্রয়োজন। এই চারিটি প্রকাশ-ধর্ম্ম শক্তির বিকাশ মাত্র সুতরাং শক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কোনও প্রকার ঈশ্বর উপাসনা, পূজা, ধ্যান, চিন্তা, স্মরণ, মনন সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুতঃ জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-মার্গ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে ও হইবে সকলেরই মূল শক্তিপূজা। মানুষের সাধ্য কি এই শক্তিকে ছাড়িয়া কোনও দিকে বিন্দু মাত্রও অগ্রসর হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী পরমেশ্বর, ব্রহ্মা ও অবতারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষী, তৃণ, কীট পর্য্যন্ত সমুদয় এবং তন্নিহিত যাবতীয় ক্রিয়া বা গুণ এবং সদসৎ প্রবৃত্তি সকলই এই ব্রহ্ম-শক্তিরই প্রকাশ মাত্র, সুতরাং শক্তি-পূজা আধ্যাত্মিক বা লৌকিক সকল প্রকার প্রচেষ্টার এক মাত্র মূল ভিত্তি। এই শক্তির সাধনায় উদাসীন হইলেই জীবের সর্ব্বপ্রকার অধোগতি হয়—"অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি।" আবার এই শক্তির প্রসন্নতায়-ই মানব সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এমন কি মুক্তির অধিকারী পর্য্যন্ত হয়—"সৈষা প্রসন্না বরদা নণাং ভবতি মুক্তয়ে।" এই শক্তিই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই শক্তি। যেমন কুণ্ডলিকৃত-তনু-সর্পও সর্প, আবার তির্যগ্ গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান সর্পও সর্প, অথবা সমুদ্র এবং জল, তরঙ্গ, ফেনও বুদ্বুদ যেমন অভেদ সেইরূপ।

এই শক্তিই জগতের গর্ভধারিণী জননী—"মম যোনির্মহৎব্রহ্ম

তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং"; তাই ভারত আদিমন্ত্র 'মাতৃ' শব্দে এই মহাশক্তির আরাধনা করিতে শিখিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র বিভূতি, সকল বৈচিত্র্য প্রেমের ছাঁচে ঢালিয়া ভারত গড়িয়াছিল এক অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি। এমনি করিয়া সে সেই মহাশক্তিকে আপনার হইতেও আপনার, নিকট হইতেও নিকটতম করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তার পর কঠোর পারিপার্শ্বিক অবস্থার নির্ম্মম নিষ্পেষণে যখন দিন দিন ভারত হৃত বীর্য্য-পরাক্রম হইতেছিল, যখন চতুর্দ্দিক হইতে বিভীষিকারাশির প্রবল আক্রমণে সে ভীত, ত্রস্ত ও চকিত তখন সেই অপূর্ব্ব মাতৃ-সম্বোধন কাপুরুষের সভয় আর্ত্তনাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। 'মা'-কে 'মা' বলিয়া তাঁহার সমগ্র ভাবরাশিকে সপ্রেমে উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার ক্রমশঃ লোপ পাইয়া, রহিল কেবল ভীরুতাব্যঞ্জক স্বার্থমাত্র অন্বেষণকারী পূজার ভাণ। ঘোর অমাবস্যা রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারের পশ্চাতে যে স্থির গম্ভীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান পিশাচ-ভয়ে কম্পমান কাপুরুষের তাহা উপভোগ করিবার সামর্থ্য কোথায়? নিবিড় জলদাবৃত নভোমণ্ডলে সঘন বিদ্যুদ্দাম চমক, প্রলয়ান্তনাদকারী ভীষণ অশনিসম্পাত ও ভীমভৈরব ঝঞ্ঝাবাতের অদ্ভুত তাণ্ডব সৌন্দর্য্য, প্রাণ ভয়ে ভীত গৃহহীন পথিক কখনই উপভোগ করিতে পারে না; সেই প্রকার বল, বীর্য্য ও শ্রীহীন ভারত শক্তির রুদ্র কঠোর অভি-ব্যক্তির পানে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু আবৃত করিল; রোগ, শোক, মহামারী, অথবা রক্তবন্যা প্রবাহনকারী তুমুল রণ-কোলাহলের মধ্যে মহাশক্তির তাণ্ডবলীলা দর্শন করিয়া মহোৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতা আর তাহার রহিল না। শুধু মলয়পবনসেবিত মনোহর পুষ্পোদ্যানের সুরভি গন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতান, বাঁশরীর মৃদু মধুর ঝঙ্কার, চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ, প্রণয়ের অস্ফুট মৃদু আলাপন ও প্রমোদের চটুল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি কোমল ভাবের ভিতরেই জগৎ-প্রসবিনী শক্তির অনুসন্ধানে সে প্রবৃত্ত হইল। ফলে তাহার ব্যক্তিগত ও জাতীয়, লৌকিক ও অধ্যাত্ম-জীবনে নানা দুর্দ্দশা, দৈন্য, সঙ্কীর্ণতা ও কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতা আসিয়া সেই অপূর্ব্ব বৈদিক

সত্যের সার্থকতা সর্ব্বত্র মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিল—"অমস্তবো মাস্ত উপক্ষিয়ন্তি।"

জাতীয় শক্তির উদ্বোধনের জন্য চাই বীরত্ব, চাই পৌরুষ, চাই অমিত বীর্য্য ও প্রবল শক্তির কঠোর সাধনা। শক্তির বরপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া ভারত-শক্তির পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রচার করিয়াছিলেন—এই মহাশক্তিরই সর্ব্বাঙ্গীণ সাধনা। ললনাসুলভ মৃদুতা ও কাপুরুষোচিত কাতরতার ভিতর দিয়া প্রবল প্রচণ্ড শক্তিকে মূর্ত্ত ও উদ্বুদ্ধ করা চলে না, তাহার জন্য চাই—রুদ্র কঠোর ভীষণতার পূজা। প্রচণ্ড রুদ্র ভাবের ভিতর শক্তির সমধিক প্রকাশ সকলেরই প্রত্যক্ষ। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা যখন গৃহ সম্পত্তি ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হয়, সাহায্য প্রদানকারী বীর সেবকের শরীর-মনে তখন যে শক্তির প্রবল প্রবাহ উত্থিত হয় সাধারণ অবস্থায় তাহা হয় না। মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবর্ষণকারী প্রবল তোপের সম্মুখে, নিশ্চিত মৃত্যুর সহিত উন্মাদ সংগ্রামে বীর সৈনিকের হৃদয়ে যে বিপুল উৎসাহ ও তাহার প্রতি ধমনীতে শক্তির যে উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ প্রধাবিত হয়, প্রমোদের মুগ্ধ অলসতায় তাহা কোথায়? অতএব চাই—কঠোর ভাবের ভিতর তীব্র শক্তির সাধনা, ধ্বংসের ভিতর সৃষ্টির প্রবল উচ্ছ্বাস। তাই বুঝি, শক্তি সাধনার স্থান—ভীষণ বিভীষিকাময় শ্মশান, উপকরণ—উষ্ণ রুধির। আচার্য্য বিবেকানন্দ তাঁহার 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক কবিতায় কোমল ও কঠোর উভয় ভাবের ভিতরে শক্তি-সাধনার এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একদিকে ভাষার মৃদুতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কোমল ভাবের মন্দ মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি কঠোর গম্ভীর ভাষায় রুদ্র ভাবের ভীম অনল উদ্গার যেন পাঠকের হৃদয়কে তেজে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে :—

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥

মৃদুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥

আবার পরক্ষণেই রুদ্র ভাবের দৃপ্ত সিংহনাদ :—

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী জ্বালা।
ফেনময় গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বত চূড়া॥

ভীম রণভূমির তাণ্ডব অট্টহাস্যে, প্রলয়ান্তকারী তোপশ্রেণীর ভৈরব গর্জ্জনে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর করাল মুখব্যাদানের বিভীষিকাময় চিত্রে মহাশক্তির কি দৃপ্ত মহিমময় ভীম গম্ভীর চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন :—

পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর—পৃষ্ঠে বীর—ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্য্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

কিন্তু মানব হৃদয় এতই দুর্ব্বল যে এই কঠোর ভাবের অন্তরালে শক্তির বিচিত্র লীলা সে মোটেই উপভোগ করিতে পারে না। তাহার মন চায় কোমল মধুর বিলাস। সুখকে সকলেই ভালবাসে দুঃখকে বরণ করিতে কেহই প্রস্তুত নহে, কিন্তু সকল সুখের পশ্চাতেই রহিয়াছে দুঃখ; সকল সংযোগের পশ্চাতেই রহিয়াছে বিয়োগ, জগতের সকল অমৃতই গরলে ঢাকা; তথাপি মানুষ সুখের জন্যই পাগল কিন্তু মৃত্যু, মহামারী, রোগ, শোক, সংগ্রাম এগুলিও যে জীবনেরই অপর একটা দিক তাহা মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। ফলে জীবনটা মহা অসামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।

রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥

* * * *

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥

* * * *

ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্মকথা বলি কাকে?

বস্তুতঃ এই কপট কাপুরুষতায় মহাশক্তির পূজা হয় না। যেখানে পূজার উদ্দেশ্য—উপাস্যের ভাবে আত্মসমর্পণ না করিয়া স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পূজার ভাণ মাত্র, যেখানে ভীষণ কাপুরুষতাকে দয়া বা মহাপ্রাণতার আবরণে আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা এবং যেখানে ভালবাসার ছলে কেবল মাত্র নিজের ভোগসুখের সুবিধা করিয়া লইবার ইচ্ছা বিদ্যমান সেখানে শক্তির আরাধনা না হইয়া কেবল দুর্ব্বলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নিজের স্বার্থ, সুবিধা, পুষ্টি, মান, যশ প্রভৃতির ষোল আনা হিসাব করিয়া ভয়ে ভয়ে ভালবাসিতে অগ্রসর হওয়া কখনই ভালবাসা নহে উহা কপটতা মাত্র। ভালবাসার পাত্রকে সকল সময়ে, সকল অবস্থায় দুঃখ, দৈন্য, ভীতি, বিভীষিকার ভিতরেও অবলম্বন করিতে পারাই যথার্থ ভালবাসা ও প্রকৃত পূজা, উহাই বীরত্বের উদ্দীপক ও যথার্থ শক্তির উদ্বোধক।

সুতরাং কেবল মাত্র কোমল ভাবের ভিতর দিয়া জগৎ-কারণকে বুঝিতে অগ্রসর হওয়া কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। স্বার্থই সকল প্রকার ভীতিজনিত দুর্ব্বলতার জনক। হৃদয় হইতে সকল প্রকার স্বার্থমলিনতা নির্ম্মম ভাবে উৎপাটিত করাই শক্তিপূজার প্রথম সোপান। শক্তিপূজার শব-সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে চাই—যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বিভীষিকাময় ও পূতিগন্ধযুক্ত তাহাকেও সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করা, মানুষ ভয়ে যাহার নামমাত্র স্মরণ করিতেও কুণ্ঠিত এমন শ্মশানরূপী অবস্থা সকলের ভিতরে নিজের সাধনার বজ্রাসনে স্থাপন করা—তবেই তোমার অন্তরে অবস্থিতা মহাশক্তি উদ্‌বুদ্ধা হইবেন, তখন সমগ্র জগতে মহাশক্তির বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়া তোমার প্রাণ মন পুলকিত হইবে, তখনই একাধারে কৃপা ও সমন্ন-

নিষ্ঠুরা জগজ্জননীকে যথার্থ ভাবের সহিত 'মা' বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিবার সামর্থ্য তোমার হইবে। এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে তোমার কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন, ভীতের আর্ত্তনাদ ও পীড়িতের কাতরোক্তি মাত্র—তাহার শ্রবণে হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করে না, ধমনীতে বিদ্যুতপ্রবাহ স্ফুরিত হয় না। মহাশক্তির একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধ বিবেকানন্দ জগৎকে ভীমা শক্তির কঠোর সাধনায় আহ্বান করিতেছেন :—

ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া ॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমারে সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

—জ্ঞানেশ্বরানন্দ।

# পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ

উদ্ভিদেরা আকাশ থেকে তাদের পাতার সাহায্যে আলো ও অঙ্গারাম্ল বায়ু ( Carbonic Acid gas ) সংগ্রহ করে থাকে। সেই পাতার মধ্যস্থ রাসায়নিকযন্ত্রাগারে ঐ আলো জঙ্গমাত্মক পদার্থে ( Organic materials ) পরিণত হয়; আর অঙ্গার ( Carbon ) পরিণত হয় চিনি, শ্বেতসার ( Starch ) এবং ঐরূপ উদ্ভিদ জীবনীর বৃদ্ধির উপযোগী নানা পদার্থে। এই রকমে উদ্ভিদেরা জড় ( dead ), স্থাবর ( inorganic ) পদার্থ থেকে জীবন্ত শক্তি-প্রবাহী শরীরের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সংঘটিত হয় তা যদিও

এখনও আমরা নির্ণয় করতে পারিনি তথাপি এটুকু বেশ বোঝা গ্যাছে যে ঐ সবুজ রঙের কণাপুঞ্জ ( granules ), যার জন্য পাতাগুলোকে সবুজ দেখায়, উদ্ভিদ-দেহ নির্ম্মাণের একটা নিশ্চিত কারণ। দেখা যায় গাছ যদি আলো জল বাতাস পায় তা হলে তার দেহ গঠনো-পযোগী শক্তির আধার খাদ্য সে তৈরী করে নিতে পারে; কিন্তু পশু ( animal তা পাবে না। তাকে তার প্রত্যেক দেহের অংশ এবং গতির জন্য অন্য কোনও প্রাণীর দেহের ওপর নির্ভর করতে হয়। গাছ হচ্ছে পশু-দেহের একটা মস্ত উপকরণ। শুধু পশু নয়, গাছ নিজের দেহ দিয়ে অপর গাছেরও দেহের উপকরণ যুগিয়ে দেয়।

যদিও জড় পদার্থ থেকে গ্যাছের খাদ্য তৈরীর ক্ষমতা আছে তবুও এমন কতকগুলো গাছ আছে যাদের দেহোপকরণ উপযোগী যথেষ্ট সোরা ( nitrates ) এবং অপরাপর খনিজ পদার্থ ( Mineral substances ) জল থেকে না পাওয়ায় তাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়, এই অভাবের পুরণের জন্য তাদের কৌশল করে কীট পতঙ্গ ধরে খেতে হয় এবং তা থেকে তারা, এইরূপ, যা মাটি থেকে পায়নি, তাদের শরীরের কলা tissue ) নির্ম্মাণের সাহায্য পায়।

যাঁরা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন না তাঁরা একথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁরা যদি যে কোনও বিলের ধারে গিয়ে সেখানকার যে কোনও গাছের গতিবিধি পরীক্ষা করেন তা হলেই বুঝতে পারবেন যে শত শত ঐরূপ গাছ তাদের শীকার ধরবার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা সাধারণতঃ বিলের ধারে বিশেষতঃ ডোবার ধারে জন্মায়। এই সব খানা ডোবার শেওলা ( moss ) গুলোর সর্ব্বাঙ্গ এতো স্যাঁত সেঁতে হয়ে থাকে যে তাদের বাতাস থেকে অম্লযান পাওয়া অসম্ভব এবং বীজাণুনাশী বহু অম্লরসের ( antiseptic acid ) সৃষ্টি হওয়ায় অতি ক্ষুদ্র জীবেরও সেখানে দেহ ধারণ অসম্ভব এবং যে সকল উদ্ভিদের অতি মাত্রায় নাইট্রোজেন এবং খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, তাদের অন্য উপায় ব্যতিরেকে সেখানে জন্মান অসম্ভব।

এই সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, সূর্য্য-শিশিরের ( Sun-dew ) মত কতকগুলো গাছ বড় অদ্ভুত উপায়ে শ্যাওলার সঙ্গে বিল, ডোবা ও জোলে জন্মায়। যেখানে আর সব উদ্ভিদের জন্মান অসম্ভব, সেখানে ঐ গাছ গুলো কি করে বৃদ্ধি পায় এ বিষয়টা কৌতুকপ্রদ বটে। আমরা দেখতে পাই এই জাতীয় গাছের ( Saxifrages ) সর্ব্বাঙ্গে, কাণ্ডে, পাতায়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমে আচ্ছাদিত। ঐ রোমগুলোর মাথায় একটা করে বলের মত এবং তাতে আটার ন্যায় একটা জিনিষ আছে ( glandular hairs )। খুব ছোট ছোট পোকা মাকড় মাছি এই আটায় জড়িয়ে প্রাণ ত্যাগ করে, আর সূর্য্য-শিশির তাদের অঙ্গ থেকে নিজেদের অঙ্গের উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে। দেখতে পাওয়া যায় এই জাতীয় গাছের মধ্যে যারা ঐ রোমের মাথার বলের মধ্য দিয়ে বেশী হজম করবার রস ( Digestive fluid ) বের করতে পারে ( Secreting ) ঐ যন্ত্র যার যত জটিল, বেদনশীল ( Sensitive ), গতিশীল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ( Natural Selection ) তারা তত বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে থাকে।

একটা পকেট লেন্স দিয়ে যদি সূর্য্য-শিশিরের একটা পাতা আমরা পরীক্ষা করে দেখি তা হলেই বুঝতে পারি কি করে তারা আহারের চেষ্টা করে থাকে। পাতার সমস্ত সবুজ উপরিভাগ লাল রঙের রোমে উৎকীর্ণ। আর ঐ রোমের মাথার ওপর যে বল ( gland ) গুলো বসান আছে, সেগুলো সূর্য্য কিরণে শিশির সিক্তের মত চক্‌চক্ করে বলে নাম দেওয়া হয়েছে সূর্য্য-শিশির। লেনস্ দিয়ে যদি সূর্য্য শিশিরের সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় তা হলে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু এত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও চার্লস ডারবিন ( Charles Darwin ) আবিষ্কার করলেন যে ঐ শুঁয়াগুলো সূর্য্য-শিশিরের রক্ত শোষণের যন্ত্র মাত্র। তিনি নিশ্চিত রূপে দেখিয়েছেন যে ঐ কোষগুলো একটা জটিল যন্ত্রাগার। যখন কোন পদার্থ ঐ শুঁয়োর সংস্পর্শে আসে তখন ঐ-গুলো বেঁকতে থাকে। ধর একটা মাছি শুঁয়োর সংস্পর্শে এসেছে,

তখন ঐ শুঁয়োগুলো বেঁকে বেঁকে ঐ মাছিটাকে ঠিক পাতার মাঝখানে উঁচু করে ধরে; এবং যেই মাঝখানে আসে অমনি অপরাপর বাইরের শুঁয়োগুলো বেঁকে বেকে ঠিক মাছিটাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং পাতার মাঝখানটা বাটির মত গর্ত্ত হয়ে যায়। তখন সেই কারাগারে বদ্ধ হয়ে মাছির প্রাণ যায় এবং সেই কোষ-গুলোর মধ্যদিয়ে আটার মত লালা নিঃসৃত হতে থাকে। যে শীকার পালাবার জন্য যত বেশী চেষ্টা করে তার বিপদ তত ঘনীভূত হয়ে আসে। কারণ ঐ কোষগুলিকে যত বেশী উত্তেজিত করা যায় তা থেকে তত বেশী লালা নিঃসৃত হয়ে শীকারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, একেবারে অচল করে দেয়। ডারবিন আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন যে যখন ঐ শুঁয়োগুলো বেকতে থাকে তখন ঐ লালা একটা অম্ল রসে ( Acid ) পরিণত হয়। এখন এটা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে মানুষের খাদ্য জীর্ণ করবার জন্য যে পাচ্য রসের ( Gastric Juice এর দরকার হয় তাতে দুটো জিনিষ দেখা যায়, একটা হল অম্ল ( Acid ) আর একটা হল কিণ্ব বা খমীর (Ferment)। ডারবিন এর পর অনুসন্ধান করতে লাগলেন যে বাস্তবিক সূর্য্য-শিশির তার শীকারগুলো যথার্থই খায় কিনা? অনেক পরীক্ষার পর তিনি নির্দ্দেশ করলেন যে সূর্য্য-শিশিরের রোমাগ্রবর্ত্তী কোষ নিঃসৃত লালা পাচ্য রস ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ রসও ঠিক অম্ল ও খমীরে তৈরী; প্রত্যেক প্রাণীর মত সেও তার শীকারকে খাদ্যের মত জীর্ণ কোরে ঐ কোষের মধ্য দিয়ে শরীরের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটা একটা নূতন আবিষ্কার হল যে উদ্ভিদেরও অপরাপর প্রাণীর মত পরিপাক-শক্তি আছে।

ডারবিন আরও দেখিয়েছেন যে, সমস্ত রোম বিশিষ্ট ( Saxi frages ), এবং প্রিম্ রোজ ( Prim-rose ) জাতীয় গোলাপের এই শক্তি আছে। তাদের কোষ-নিঃসৃত লালা কোন সোরক ( Nitrates ) পদার্থের সংস্পর্শে এলেই অম্লরসে ( Acid ) পরিণত হয়। উত্তর আমেরিকার পার্ব্বত্য জলাভূমিতে বাটারওয়ার্ট ( Butterwort ) বলে আর এক রকমের উদ্ভিদ আছে যাদের রোম

গতিশক্তি বিশিষ্ট নয় পরন্তু তারা তাদের শীকার পাতা দিয়ে কোষের ওপর ধরে রাখে। আরও একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার, এরা শুধু মাংসাশী নয় নিরামিষভোজীও বটে। এরা ছোট ছোট পাতা, রেণু প্রভৃতিও হজম করে থাকে। ঐ দেশে আর এক রকম মাছিধরা উদ্ভিদ আছে ( Venus' fly-trap )! এদের শীকার প্রণালী অন্য রকমের। এদের পাতা পুস্তকের দুখানা পাতার মত আধা-আধি খোলা থাকে। আর ঐ দুই পাতার সমস্ত ধারগুলোতে চিরুণীর মত ফাঁক ফাঁক লম্বা লম্বা দাঁত সাজান আছে। যখন কোন পোকা মাকড় ঐ দুখানা কাণের মত পাতার মধ্যে ঢোকে তখন হঠাৎ ঐ দুটো জুড়ে বন্ধ হয়ে যায় ( interlocked ); ঠিক যেমন হাত জোড় করে আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জোর করে ধরলে হয়। একটা মজা দেখা যায় যে ঐ পাতার মধ্যে কিছু গেলেই যে পাতাদুটো জুড়ে যাবে তা নয়। তিনটে বিশেষ জায়গা আছে যেখানে একটু স্পর্শ লাগলেই ঝট করে জাঁতি-কলের মত দুটো পাতা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ পাতার মধ্যে তিনটি কিঞ্জল্ক বা শির ( filaments ) আছে যারা অতি সূক্ষ্ম স্পর্শেও সঙ্কুচিত হয়। ঐ পাতার মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে নাড় কিছু হবে না কিন্তু একটা কেশাগ্র দিয়ে ঐ শির স্পর্শ কর তখনি ঠিক স্প্রিং এর মত পাতা দুটো ঝট করে বন্ধ হয়ে যাবে।

এই রকম পিচার-প্লান্ট, সাইড-স্যাড্‌ল ( Sarracenius ), ডারলিংটনিয়া প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদ আছে যারা তাদের শীকারগুলোকে রূপের মোহে ও মধুর লোভে ভুলিয়ে নিয়ে এসে হয় ডুবিয়ে মারে, না হয় কারাগারে আবদ্ধ করে।

—বাসুদেবানন্দ।

# কথাপ্রসঙ্গে

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মুসলমান সহযোগী লিখিয়াছিলেন, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলে আমরা সহস্র সহস্র নিম্নবর্ণীয় হিন্দুকে ও শত শত হিন্দু-বিধবাকে কোনরূপ প্রলোভিত না করিয়াই মুসলমান করিতে সক্ষম' ইহা শুনিয়া মুসলমানদের উপর হিন্দু-জনসাধারণের খুব রাগ হইতে পারে—হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু অন্যের উপর দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরও কোন ত্রুটি আছে কি-না তাহা দেখা বিধেয়।

ইহা সত্য যে, হিন্দুধর্ম্মের মত হিন্দুসমাজ উদার নহে। হিন্দুধর্ম্ম যেমন দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য, সনাতনী, আর্য্যসমাজী ও দেবসমাজী, জৈন, শিখ ও ব্রাহ্ম, ধার্ম্মিক, পাপী ও পতিতকে অকাতরে স্থান দিতে পারে, হিন্দুসমাজ তাহা পারে কি? হিন্দুধর্ম্ম—উদারতম মত প্রচার করিয়া সকলকে একত্র করিতে চায়, আর হিন্দুসমাজ—ভেদনীতি চালাইয়া সকলকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্যের পরিণাম কি, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। একজন লোক সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, আর একজন পরমুহূর্ত্তে আসিয়া তাহা তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ চলিলে প্রথম ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রম যেরূপ নিরর্থক হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মহাপুরুষগণ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' 'যত মত তত পথ' রূপ সর্ব্বভাবসামঞ্জস্য মত প্রচারে জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে এক বিরাট মিলনমঞ্চে দাঁড় করাইতে চান, আর হিন্দুসমাজ—তাহাদের হাতে খাইলে, এমন কি তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও দেহ-মন দূষিত হইবে এইরূপ নীতি ( Policy ) চালাইয়া তাঁহাদের সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেয়! মোট কথা—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ এই উভয়ের

মধ্যে নীতির একতানতা ( Harmony of policy ) নাই। নাই বলিয়াই এত বড় উদার ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও আজ হিন্দুসমাজের ভিতর এত সংঘর্ষ, এত হানাহানি। ধর্ম্ম সকলকে একত্র করিতেছে কিন্তু সমাজের অনুদারতায় টিকিতে না পারিয়া শত সহস্র লোক ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

আমরা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে চাই না; কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। নিপীড়িতা হিন্দুনারী শুধু গঙ্গাজল পান ও গঙ্গাস্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে—ব্রাহ্মণসমাজ সম্প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন; —এইরূপ ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে শত সহস্র হিন্দুমহিলাকে মুসলমানী হইয়া আজ মুসলমান-পুত্র-কন্যার জননীরূপে হিন্দুসমাজের অসংখ্য শত্রু প্রসব করিতে হইত না। অস্পৃশ্যগণের জন্যও ঐরূপ কোন উদার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে কোটী কোটী হিন্দুবীরকে হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের দেহরক্ষী রূপে হিন্দুগণ পাইতে পারেন; নচেৎ ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয়ে যাইয়া তাহাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে তাহারা কিছুমাত্র ত্রুটি করিবে না। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ একদিন প্রতিমা গড়িয়াছিল আজ তাহাদের বংশধরগণ প্রতিমা ভাঙ্গিতেছে, দেশলুণ্ঠন করিতেছে। হয় ত ধর্ম্মরক্ষার জন্যই হিন্দুসমাজকে একদিন অনুদার হইতে হইয়াছিল, আজ উহারই জন্য আবার তাহাকে উদার হইতে হইবে কি-না তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ-সমাজকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি।

# অশরীরী

কার যেন পদধ্বনি মায়ার বিচরি
কাঁপাইছে নিঃশব্দের তরুর মর্ম্মর
জ্ঞান নাই—দুরু দুরু কাঁপে তবু স্বর।
দূরে দূরে পাশে পাশে রাশি অন্ধকার
ঢালিয়া দিয়াছে কে গো বিশ্ববালিকার
তনুর মায়ায়—ওরে না পারি বুঝিতে
আঁখি মোর বদ্ধ কি-না আঁখির তারাতে।
কিংবা ওই ঘনবুক তিমির অতলে
জ্ঞান সুর ভেঙে পড়ে প্রাণপণ বলে
দরশনে পরশি' আঁকড়ি—; ধীরে ধীরে
পরাণের লোলবসে পরশি শোণিত
চপল পবন সনে সোহাগ-সম্ভারে
ঘুম পাড়াইছে আজ রজনী আমারে।

তরুশাখা পল্লবের বিজন বাসর,
তটিনীর তটগাতি নিরব মুখর,
আকাশের রঙ্গমঞ্চে নব নব সুর,
বাতাসের বুকফাটা আকুতি আতুর,
কোথা হেথা কোথা ওরে খুঁজিয়া না পাই
বিশ্বজোড়া শুধু ওঠে 'যাই! যাই! যাই!
আঁধারের অনিমিখ রেণুর আড়ালে,
সুদূরে গোপন ছায়া নিতল পাতালে,
শুধু যাই—যাই আমি মিশে মুছে যাই
উতল ঘুমের মত। আয়—ধীরে ধীরে

মোরা সব মরম-কণিকা

দূর হতে আরো দূরে হয়ে মিলাই।’
কুহেলী শিশুর মত আমি নিরজনে
আঁধার-প্রাচীর পাশে শুধু আনমনে
বসে আছি পাষাণের বিগ্রহের মত,
নিরব সমাধি-সুর উঠিছে সতত।
দূরে ফেরে এ ধরার দীপের কঙ্কাল
আপনার ধসরিত বচন-জঞ্জাল
বার বার ফুৎকারিয়া উৎসারি’ হরষে;
সে আগুন-অভিশাপ, উতল আক্রোশে
অনির্ব্বাণ আঁধারের শুদ্ধ জাগরণে
প্রেতের মতন নাচে হীন স্বার্থার্চ্চনে।
হেরি দূরে চমকিছে বিজুরীর রূপ
মোর আঁখিদল বুঝি উল্লসে অরূপ
আঁধারের অপিধানে ঢাকিবারে পথ
শুধু আয়, আয় চলে অলক্ষ্য জগৎ।

শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী।

# মত ও পথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিতেন, গল্পটি এই :—

একটি ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘিনীর একটি ছানা প্রসব হয়ে গেল। বাঘিনী মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে বড় হতে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, সেও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটিকে দেখে অবাক। দৌড়ে এসে তাকে ধরলো। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগল। তাকে টেনে হিচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল। বল্লে—ত্মাখ, জলের ভিতর তোর মুখ ত্মাখ্ ঠিক আমারই মত। আর এই নে খানিকটা মাংস এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না, ভ্যা ভ্যা করছিল। তার পর রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নতুন বাঘটা বল্লে—এখন বুঝেছিস্ আমিও যা তুইও তা ; এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।

একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই ক্ষুদ্র গল্পটির মধ্যে বেদান্তের গভীর তত্ত্বগুলি নিহিত আছে।

(১) ব্যাঘ্র শাবকের মেষত্ব প্রাপ্ত হওয়া কি-না কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় জীবের তন্মধ্যস্থ ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকা।

(২) ঘাস খাওয়া কি-না সচ্চিদানন্দ ত্যাগ করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মগ্ন হইয়া থাকা।

(৩) মেষের পালে ব্যাঘ্রের আগমন কি-না বদ্ধ জীবের প্রতি মহাপুরুষের কৃপা প্রদর্শন।

(৪) ব্যাঘ্র শাবকের জলের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন কি-না জীবের স্বস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার।

(৫) ব্যাঘ্র শাবকের রক্তাস্বাদন অর্থাৎ অমৃতের আস্বাদন।

(৬) ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র-শাবককে বলিতেছে, "আমিও যা, তুইও তা"—অর্থাৎ বেদান্ত প্রতিপাদ্য "তত্ত্বমসি" বাক্যের অনুভূতি।

(৭) ব্যাঘ্র-শাবকের ব্যাঘ্রের সহিত বনে গমন অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত সম্মিলন।

এই ক্ষুদ্র গল্প হইতে প্রতীয়মান হয় বিশ্বচরাচরস্থ যাবতীয় জীব জন্তু সকলের ভিতর এক চৈতন্য বর্ত্তমান। মোটামুটি প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের ভিতর হইতে এক চৈতন্য বাদ দিলে সকলেই সমাবস্থাপন্ন—কোনও ভেদ নাই অর্থাৎ সকলেই জড় পদার্থ শব।

এই চৈতন্য সকলের ভিতর আছেন বলিয়া সকল ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল, সকলে চলিতেছে ফিরিতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১১

অদ্বিতীয় পরমাত্মা (চৈতন্য) সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপক ও সকলের অন্তরাত্মা, কর্ম্ম প্রবাহের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী মাত্র, চৈতন্য স্বরূপ, বিশুদ্ধ (মায়াতীত) প্রাকৃতিক গুণ সম্বন্ধ শূন্য।

আত্মা এই দেহে সাক্ষী স্বরূপ নির্লিপ্ত। সাক্ষী কিরূপ, যেমন দুই দলে দ্বন্দ্ব হইতেছে, কেহ দণ্ডায়মান সাক্ষী আছেন, তাঁহার উভয় পক্ষের জয় পরাজয়ে কোন সুখ দুঃখ নাই। তিনি দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু আত্মাকে কেবল সাক্ষী বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। বিভুরূপে তিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। তাঁহারই প্রভায় সকলই দীপ্ত; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) ও পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আত্মারই প্রভাবে ক্রিয়াশীল, নতুবা ইহারা ক্রিয়াহীন জড়।

নিম্নলিখিত তুলনা দ্বারা আত্মার সামান্য একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। একটি গতিশীল বাষ্পযান ( Locomotive Engine ) মধ্যস্থ বাষ্পই উহার মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ উহারই প্রভাবে ইঞ্জিন খানি চলিতেছে। উহার মধ্যস্থ চালকের সহিত ( driver ) দেহমন্দিরস্থ অহংকারের তুলনা করা যাইতে পারে। আর ইঞ্জিনের সমস্ত কল কব্জার সহিত দেহ-মন্দিরস্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের তুলনা করা যাইতে পারে। ইঞ্জিনখানি ভাল ভাবে চালাইতে পারিলে চালকের বাহাদুরী, আর মন্দভাবে চালাইয়া যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য চালক দোষী ও দায়ী। কিন্তু ইহাতে বাষ্পের কিছু আসিয়া যায় না। অথচ বাষ্পের অভাবে চালক ক্ষমতাহীন ও ক্রিয়াহীন। তেমনি আমাদের দেহ-মন্দিরস্থ আত্মা। উঁহারই প্রভাবে সকলেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল, অথচ তিনি নিজে নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত।

এ বিষয়ে আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই ঃ—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

কঠোপনিষৎ )

সর্ব্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি এক মাত্র সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা জাগতিক দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কেন-না তিনি জগতের অতীত।

আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বভূতে এক আত্মা বর্ত্তমান সত্ত্বেও বিভিন্ন আধারে রূপের ভিন্নতা। এতদুপলক্ষে আমরা উপনিষদুক্তি উদ্ধৃত করিব।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

( কঠোপনিষৎ )

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তু ভেদে তদ্রূপ হইয়াছে, তেমনি সেই এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে সেই সেই রূপ ধরিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

পুনরায় দেখিতে পাই সর্ব্বভূতে এক আত্মা বর্ত্তমান সত্ত্বেও আধার ভেদে ব্যবহারের ভিন্নতা শাস্ত্র বলিতেছেন—"প্রকাশের তারতম্যানুসারে ব্যবহারের ভিন্নতা" হইয়া থাকে। মনে করুন, কতকগুলি দেবালয় আছে। কোনটিতে তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ—চারটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান, কোনটি আটটি প্রকোষ্ঠ, কোনটি বা ততোধিক ইত্যাদি। সেইরূপ দেহ-মন্দিরস্থ আত্মা ; যাঁহার মায়ার আবরণ যত কমিয়া আসিয়াছে তিনি তাঁহার তত নিকটবর্ত্তী, এবং তাঁহার মহিমা তত উপলব্ধি করিয়াছেন। পরিশেষে তরঙ্গ যেমন জলে লয় হয়, তদ্রূপ সে অবস্থা অবাঙ্মনসোগোচরম্, যোগীরা বোধে বোধ করেন, "ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো।"

'সর্ব্বভূতে নারায়ণ বর্ত্তমান' এই ভাব 'তত্ত্বতঃ' উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত, এ বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব একটি গল্প বলিতেন :—

কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময় একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জানে যে, হাতী নারায়ণ তবে কেন পালাব—এই বলে দাঁড়িয়ে রইলো, নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও, পালাও।' শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে ফেলে

দিয়ে চলে গেল। শিষ্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলো। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে গেল, আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি হাতী আসছে শুনেও কেন চলে গেলে না?' সে বল্লে, 'গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন যে নারায়ণই জীব জন্তু সব হয়েছেন' তাই আমি হাতী-নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বল্লেন, 'বাবা, হাতী-নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু মাহুত-নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।' এই গল্প হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে বন্য জন্তুর শাসনকর্ত্তা তার মাহুত। বন্য জন্তুর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে মাহুতের কথা শোনা দরকার। সেইরূপ আমাদের মধ্যে বন্য ভাবাপন্ন যে সমস্ত মনুষ্য আছে, অথবা আমাদের মধ্যে যে সমস্ত বন্য ভাব বিদ্যমান তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে শাস্ত্রকার যে সমস্ত বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা মানিয়া চলা উচিত। তাহা না হইলে আমরা শিষ্যের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব।

এস্থলে ইহা একটু বিচার করা প্রয়োজন যে, কি উপায়ে আমরা সেই চরম অবস্থা লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ইহা মনোবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। আমরা সংক্ষেপতঃ ইহা চার ভাগে বিভক্ত করিতে পারি যথা।—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে যোগের উপদেশ করিবার সময় কে কোন যোগের অধিকারী তাহা বেশ স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

"যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু ।
তেম্বনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্ব্বিন্নো নাতি সক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥”

মনুষ্যের কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া আমি জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই তিন প্রকার যোগ উপদেশ করিয়াছি। যাহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হয়। আর যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ প্রয়োজন। আর যাহারা বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত নহে, অথচ ভগবৎ কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা আছে বলিয়া বিষয়ে অতিশয় আসক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে।

কর্ম্মযোগ :—কর্ম্ম বলিতে শ্রীভগবান গীতায় যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে আমরা ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্ম বুঝিব।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥”

গীতা ৯।২৭

“ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥”

গীতা ৫।১০

যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জলে পদ্ম পত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

আমরা কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সেই কর্ম্মফল যদি আমরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারি তবে আমরা কেন না জন্ম-মৃত্যু-রাহিত্য প্রাপ্ত হইব? যেমন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যদি সঞ্চয় করেন, তবে তিনি কখনও উহা ভোগ করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তিনি তাহা সঞ্চয় না করিয়া

কেবল পরহিতার্থে দান করেন, তবে উহা ভোগ করিবার তাহার পক্ষে সম্ভাবনা কোথায়? সেইরূপ কর্ম্মফল যদি আমাদের সঞ্চিত না হয়, তবে প্রাক্তন ভোগান্তে আমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

গীতা ৪।৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকারক আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যগণ কালসহকারে আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ উভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

৫ম অধ্যায় ৪।৫

অজ্ঞরাই জ্ঞান ও কর্ম্মকে পৃথক বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নহে। জ্ঞানীরা জানেন আপাততঃ পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও চরমে উভয়ে এক লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভক্তিযোগ:—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই ভক্তিযোগ নামে বিহিত। পৃথিবীর অধিকাংশ উপাসকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিন্দুগণ—তাঁহাকে কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা ইত্যাদি বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, ব্রাহ্মগণ—হে প্রভু দয়া কর, ক্রিশ্চিয়ানগণ—যীশু প্রভু, মুসলমানগণ—'আল্লা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সম্বোধন করিতেছেন। নামরূপ ইত্যাদি রূপের সাধনা ভক্তিযোগের অন্তর্গত।

ঈশ্বরে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগ। যেমন 'অছি' নাবালকের ভার লইয়া তাহার বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি ভগবান আশ্রিতজনের ভার লইয়া প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে

হাতে ধরিয়া চালান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—মাঠের উঁচু নীচু আল দিয়া চলিবার কালে পিতা যদি ছোট ছেলের হাত ধরেন, তাহা হইলে তাহার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বর সমীপে যিনি আত্মসমর্পণ করেন তাঁহার বেচালে পা পড়ে না। গীতায় আমরা দেখিতে পাই—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ১৮।৬৬

আবার এই শ্লোকটি বলিবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।"

সমস্ত উপদেশ দিবার পরে ভক্তবৎসল ভগবান গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—খইল মাখান জাব গরুর যেমন প্রিয় খাদ্য, ভক্তিও তেমনি ভগবানের প্রিয় জিনিষ।

রাজযোগ :—মহর্ষি পতঞ্জলি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরোধের নাম যোগ। এই সূত্রের লক্ষ্যার্থ সাধন জন্য—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যোগাঙ্গ সাধনে শরীর সংযম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ও মনের একান্ত অভিনিবেশ আদি দুঃসাধ্য সাধন আবশ্যক।

জ্ঞানযোগ :—'নেতি' 'নেতি' বিচার করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞানযোগ। 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায়। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' করতে হয়, তিনি পঞ্চভূত নন, ইন্দ্রিয় নন, মন বুদ্ধি অহঙ্কার নন্। তিনি সকল তত্ত্বের অতীত।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ১৩৩ পৃঃ)

সর্ব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে এই জ্ঞানমার্গের অধিকারী কেহ হইতে পারেন না। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥" ২—৫৫

জ্ঞানীর লক্ষণ :—জ্ঞানী কারো অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মত হয়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ান হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না। দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখে মনে হয় যেন ঠিক এক গাছি দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ১১৩ পৃঃ )

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরংজ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥"

যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিভেদ জানিতে পারেন, ( অর্থাৎ আত্মা দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ), এবং যিনি আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা দ্বারা ভূত প্রকৃতি অবিদ্যামায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সকলেরই চরম লক্ষ্য এক, কেবল বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন ব্যবস্থা।

এক্ষণে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনা করা যাউক।

শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এস্থানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

কোন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ঋষি-মুনি-সেবিত সভা মধ্যে হনুমানকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার সকল প্রকার ভক্তদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন, "হনুমান তুমি আমাকে কি ভাবে অবলোকন করিয়া থাক?" 'বুদ্ধিমতাং' বরিষ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, প্রভু সর্ব্বান্তর্য্যামী, সমস্ত অবগত হইয়াও যখন এরূপ প্রশ্ন

করিলেন তখন অবশ্যই তাঁহার কোন মহদুদ্দেশ্য আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান বলিলেন—

"দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥"

ইহা দ্বারা হনুমান সকল উপাসকদিগের ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'অহং বুদ্ধি' যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ দাসভাব—তুমি প্রভু আমি দাস। যাঁহারা আপনাদিগকে জীবভাবে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ দেহভাব হইতে উদ্ধে উঠিয়াছেন অথচ পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই তাঁহাদের জন্য অংশাংশী ভাব অর্থাৎ তুমি পূর্ণ, আমি অংশ যেমন সমুদ্র ও তাহার উর্ম্মিমালা। আর যাঁহারা বেদান্তোক্ত 'তত্ত্বমসি' উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অভেদভাব—ত্বমেবাহং—তুমি আর আমি এক, সেখানে আর ভিন্নতা নাই। এই হচ্ছে তিন ভাব—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত।

এই শেষোক্ত অদ্বৈত ভূমিতে আরোহণ করিলে জীবের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

তখন তিনি দেখেন—"কেয়া মুলায়েক কেয়া ইনসান্,
কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
যৈসা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।"

আমরা দেখিতে পাই, জগতের বৃহত্তম আচার্য্যগণ এই অদ্বৈত ভূমিতে আরোহণ করিয়া লোককল্যাণেচ্ছু হইয়া জগদ্ধিতায় কার্য্য করিয়াছেন। দয়াবতার শ্রীবুদ্ধদেব বধ্যভূমিতে আনীত পশুর জীবন বিনিময়ে স্বীয় মস্তক অর্পণ করিয়াছিলেন।

মনের সম্পূর্ণ লয় হইলে পুরুষ, 'অহং' জ্ঞানের অতীত প্রদেশে তুরীয় ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া 'বোধে মাত্র বোধ' করে; এই অবস্থাকে বুদ্ধদেব অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ন্যায় 'ঈশ' জ্ঞাপক কোন নাম প্রদান না করিয়া এবং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া এই বাক্যমনাতীত

অতীন্দ্রিয় চতুর্থ ভূমিকে 'মহানির্ব্বাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চতুর্থ ভূমিতে পৌছিলে আত্ম-চৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালে হরিপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন।

কোন স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমিক রামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন :—

"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়,
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম,
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণ স্ফূরণ।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান, জ্ঞান-সূর্য্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তি-চন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুই-ই ছিল।"

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৯২ পৃঃ )

মহাপুরুষদের কর্ম্মে যথার্থই ভেদনীতির স্থান নাই, জীব কল্যাণ তাঁহাদের ব্রত। যেমন সুচিকিৎসক রোগ ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন, তেমনি অবতারকল্প পুরুষেরা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যথোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন। একই রাজা ভিন্ন বেশে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন সময়ে যদি বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই নৃপতির নৃপতিত্ব যেমন পরিবর্ত্তন হয় না, অবতার পুরুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ; তাঁহারা প্রয়োজনোপযোগী শক্তির বিকাশ করেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, এমন কি নাজরথীয় যীশুখৃষ্ট ও মক্কা নগরীর মহম্মদ, ইঁহাদের সকলের ভিতর একই শক্তি বিদ্যমান; কেবল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা দান করেন মাত্র।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

# স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম্ম

ভারতবর্ষে মানবের মূল্য তাহার ভাগবত জীবন লইয়া। যাহার মধ্যে যতখানি ঐশী শক্তির স্ফূর্তি হইয়াছে, সে ততখানি বড়, তেমনি পূজ্য—তাহার গরিমা ততখানি অধিক। এখানে ঐহিকতার তেমন আদর নাই; তাই কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, যোদ্ধার, আসন তেমন উচ্চে নহে, প্রতিভার এখানে তেমন সম্মান নাই।

ভারত, রাজাকে সম্মান করিয়াছে, মনীষীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, শক্তিমানকে সম্ভ্রম করিয়াছে, কিন্তু অন্তরের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে তাঁহাকে যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, যিনি ত্যাগী, যাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির অধিক বিকাশ।

বর্ণভেদ ও কর্ম্মভেদের ভারতবর্ষে—কেবল এইখানেই ভেদবিষমতার সমাপ্তি। আত্মস্থ ভারতের অতীত ইতিহাসও যেমন, বর্ত্তমানের পতিত ভারতও তেমনি, নর-দেবতার পূজা সেই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, বংশ কুল কিছুরই বিচার নাই, যিনিই ভগবদ্‌ভক্ত তিনিই পূজ্য। অতীত ভারতে নারদ, বেদব্যাস ছিলেন গরিষ্ঠ পুরুষ, আর আজিও দাদু, কবির প্রভৃতি সাধু সন্ত সম্পূজিত হইতেছেন। ইঁহাদের ধর্ম্মবলকে আশ্রয় করিয়া আমরা জীবন যাত্রায় অগ্রসর হই। ইহা মানব-পূজা নহে, শক্তের কাছে অবনমিত হওয়া নহে, ইহা নর-নারায়ণের পূজা—মানবীয় আধারে ভগবানের আরাধনা।

জীবন-ধর্ম্মের সাধারণ নিয়মে যিনি পরিচালিত, তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, কিন্তু যিনি সমাজ-সংহতির কল্যাণের নিমিত্ত "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি অবতার—নিরঞ্জন সৃষ্টি কর্ত্তার মূর্ত্ত বিভূতি।

### বিবেকানন্দ বর্ত্তমান ভারতের অবতার

ইংরাজ অধিকারের পর বাঙ্গালায় তথা ভারতে একটা মারাত্মক

জাড্যভাব আসিয়াছিল। দেশ যে রাষ্ট্রেই পরতন্ত্র হইয়াছিল তাহা নহে, জাতির চিত্তও পশ্চিমের জড় সভ্যতার কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। ভারতের সনাতন ধর্ম্মপ্রণেতা, তাহার আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগের মাহাত্ম্য সকলই ইহসর্ব্বস্বতার মায়াজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে ধর্ম্ম নাই, শক্তি নাই, নীতি—তাহাও নাই, আছে মাত্র দাসত্বের মোহ মালিন্য। এই দুর্দ্দিনেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

বিবেকানন্দকে বুঝিতে হইলে আর একজনকে চিনিতে হইবে—তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামিজীর জীবন-ব্রতের একটা বিশেষ সাধনা ছিল—ভারতকে আত্মস্থ করা, তাহার সনাতন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, তাহার ত্যাগপন্থী সভ্যতার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা। এই সত্যকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্যই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-লীলা।

ভারতের সনাতন ব্রহ্মবিজ্ঞান জাতির জীবন-ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল শাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এবং তাহা কেবল পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াই ছিল, অথবা—ছিল পণ্ডিতের মানসিক বিলাসের উপকরণ হইয়া। আর জাতি চলিতেছিল স্বতন্ত্র পন্থায়। ইউরোপের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান ভারতীয় হিন্দুজাতিকে আকর্ষণ করিতেছিল—তাহার ভোগলালসার মোহাবর্ত্তে। সেই জন্য একদিকে যেমন প্রবৃত্তি-পরায়ণতা বাড়িয়াছিল, তেমনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠাও জাতিচিত্ত হইতে মুছিয়া যাইতেছিল। আর সে সময় ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা যে কেবল অনাচরণীয়ই ছিল তাহা নহে, উহা ছিল অবজ্ঞার বস্তু। জড় বিজ্ঞান অধ্যাত্মবাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব খুঁজিয়া পাইত না বলিয়া উহা হইয়াছিল 'বুজরুকি'।

বহুদিন হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা চলিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এ অধীনতা নামেমাত্র অধীনতা ছিল, ইহা রাজশক্তির একটা পরিবর্ত্তন মাত্র। জাতি প্রকৃতভাবে দাস হইয়া পড়িল, যখন স্ব-কে—স্ব-ধর্ম্মকে—স্ব-ভাবকে পরিবর্জ্জন করিল। স্বাধীনতা পরাধীনতা—বাহিরের একটা কোন

অবস্থার উপর নির্ভর করে না। স্ব-স্থ ভাবটিই মুক্তির অবস্থা। আমার সর্ব্বস্ব লইয়াই আমি; মহৎ হউক, তুচ্ছ হউক আমি—আমি, অন্য কিছু নহি। এই আত্মমহিমাই স্বাধীনতা। "স্বে মহিম্নি রাজতে"—মুক্তি, আত্মমহিমায় বিরাজিত থাকা। অন্য কিছু বিশাল হইতে পারে, তাই বলিয়া আমার আমিত্বও ক্ষুদ্র নহে, ইহাও মহিমান্বিত।

জাতির ও ব্যক্তির এই আত্মবোধের বিলুপ্তিই ধ্বংসের কারণ। রাষ্ট্রীয় অধীনতার ক্রম আছে, স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতি প্রবলের নিষ্পেষণে একেবারে লোপ পাইয়া যায়।

ভারতের এই বৈনাশিক বিমূঢ়তার দিনেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু পরমহংস সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহার জীবন-ধর্ম্মের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যদিও সাধু সন্তের প্রভাব মানবকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবুও কোথাও তাহা বিশেষ বিকাশ পায়, কোথাও বা তেমন স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ বিকাশিত অবস্থাই অবতার, ইহার একটা বিধি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। ইহা কখনো "পরিত্রাণায় সাধূনাং", কখনো "বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্", কোথাও "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়"।

ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের লুপ্ত প্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়। ত্যাগ যে কালে দুর্ব্বলতা হইয়াছিল, ভক্তি যখন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে পরিণত হইয়াছিল, ঐশ্বরিকতা যখন কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যখন মানুষের অন্তর্য্যামী মানব-অন্তর হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন, প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই যখন একমাত্র সাধ্য হইয়াছিল, মানুষ যখন সুখের আশায় গরল কুণ্ডে ঝাঁপ দিতেছিল, যখন জড় বুদ্ধি জড় চিন্তা মানব বুদ্ধিকে বিকৃত করিতেছিল, তখনই ভগবান রামকৃষ্ণদেবের উদয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পথভ্রষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল, পাশ্চাত্য মোহ-মোহিত যুবকগণের ভিতর একটা পরিবর্ত্তনের প্রবাহ বহাইয়াছিল। যে সব শিক্ষিত যুবক প্রতীকোপাসনাকে পুত্তলিকা পূজা বলিয়া তুচ্ছ করিত, নিষ্ঠা সদাচারকে কুসংস্কার বলিত, গুরুবাদকে যাহারা অবহেলা

করিত, তাহারাই দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে রামকৃষ্ণদেবের পদচ্ছায়ে বসিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতে লাগিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যাঁহারা ইউরোপের পন্থাকেই আদর্শ করিয়া ধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন, তাঁহারাও এই প্রতিমা-পূজক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় বর্ণজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের কাছে ভক্তি ও ত্যাগের আদর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ইংরাজি শিক্ষার পূর্ব্বাবস্থায় যেমনই থাকুক, উহার প্রচলনের পর জনসাধারণ ব্যতীত শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায় ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধু-ভক্তিকে বড়ই অবজ্ঞা ও অবহেলা করিত। সাধু সন্ন্যাসী অধিকাংশ স্থলেই লোকসাধারণ দ্বারা পূজিত হইতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে ঘটনাটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গ ও শিষ্যবৃন্দ অধিকাংশই প্রায় শিক্ষিত, ঐশ্বর্য্যবান, অভিজাত সম্প্রদায়; রামকৃষ্ণের ধর্ম্মমত সর্ব্বাগ্রে এই ক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার একটু বিশেষ কারণ আছে। পরাধীন যুগে দেশের যে আত্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইতেছিল, তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারাই। কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ যেমন বৈদেশিক রাজশক্তিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তেমনই পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহারাই জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইলেন। ইঁহারাই দেশের আচার ব্যবহার—যাহা কিছু আপনার সবকেই তুচ্ছতার চক্ষে দেখিয়া পশ্চিমের দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

যেখান হইতে ভাঙ্গন ধরে, সেইখান হইতেই গঠন আবশ্যক। ভারতের জনপ্রকৃতি চিরদিন সাধু সন্তের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে; রামকৃষ্ণদেব যদি কেবল তাহাদের দ্বারাই সম্পূজিত হইতেন, তবে বিশেষ যে কিছু হইত তাহা নহে; জনসাধারণ যাহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত, যাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহারা আচার, আচরণ, শিক্ষা, সভ্যতা শিক্ষা করে তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। আর সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশই সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য ভাবে মোহিত হইয়া জাতির সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিল।

যে যুগ-প্রবর্ত্তনের জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাহার উপযুক্ত পাত্রই সেই সময়ের শিক্ষিত সাধারণ। এই জন্যই দেখা যায় পুরোহিত মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের চরণতলে বসিয়া দেশের গরিষ্ঠ অংশই ধর্ম্মদীক্ষা লইতেছে।

। ক্রমশঃ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ।

---

# রূপচাঁদ

১

তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে খুব নাম। সামান্য ভাবে সাধনা আরম্ভ করিয়া আরাধনার একাগ্রতায় ও উদ্দেশ্যের একতানতায় বীণাপাণির বরলাভ করিয়া তিনি আজ কুলতিলক। জাতির মাথার মণি। যে যুগে তাঁরা সাহিত্যের আসরে নবকুমাররূপে কলমের কসরতী আয়ত্ত করতে আত্মনিয়োগ করেন তখন নিবন্ধ লিখে এদেশে বড় কেউ দুপয়সা কামাতে পারতেন না। মূল্য ধরিয়া দিবার রেওয়াজ তখনও গা-সওয়া হয় নাই। সকলেরই পেশা অন্য কিছু ছিল; উপরন্তু যাঁর প্রাণে সৃষ্টির সখ গজাইত তিনি রসশাস্ত্রের সুচারুশিল্পে অবসর সময়টুকু মনপ্রাণ আনন্দে ভরপূর করিয়া ভোলার মত ডুবিয়া থাকিতেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যবসাদারী তখনও রপ্ত হয় নাই। যাঁর ললাটে পুস্তক রচনার রেখা দেখা দিত তিনি কেতাব ছাপাইতেন, বিক্রয় করিতেন, পরিশেষে আয়ব্যয় খতাইয়া কিছু হয় ত ঘরে তুলিতেন। একই পাণ্ডুলিপি একদফা মাসিকপত্রের সত্ত্বাধিকারী এবং দ্বিতীয় দফা পুস্তক প্রকাশক—দুইজনকে বেচিয়া অর্থের সুগমতা সুপ্রশস্ত হয় নাই। প্রবন্ধ পিছু, কবিতার ছত্র বা হরফ পিছু দস্তুরী পাওয়া যাইত না। পারিশ্রমিকরূপে শ্রীমান রূপচাঁদের মুখ দেখিতে পাইলে বেশ হয়—ইহা সকল সেবকেরই মনে মনে হইত।

বিনি পয়সায় কে গতর বা মগজ খাটাইতে চায়। 'সম্‌থিং' কিছু ট্যাঁকে আসিলে মন্দ হয় না—এই ভাব। আবার এদিকে অভাববোধ বেশ চাগাইয়া উঠিলেই নৈসর্গিক নিয়মে প্রকৃতি কাম্যবস্তু প্রসব করিয়া আকাঙ্ক্ষা অচিরে নিবৃত্তি করেন। কখন কখন মনের দুঃখে কেউ কেউ সেই দেশের সেই সোণার সময়ের গোলাপী নেশার স্বপন দেখতেন যখন পারস্য বা আরবের নবাবে খোসমেজাজে কবি ফিরদৌসী বা অপর কোন সাহিত্যসেবীর লাগা সুপ্রসন্ন হোরে প্রতি হরফ পিছু মোহরে মোহরে থলি ভরে অর্থ দিতেন। তারিফ তাঁরাই জানতেন। সাহিত্যিকরা সেই কাহিনী কহিয়া বলতেন, সব জিনিষেরই আদর চাই। আর অর্থের মাপকাটীতেই তার পরিচয়। সে দিন কি আমাদের বরাতে আসবে?—হে বিধি! কই কোথা—সমঝদার, পৃষ্ঠপোষক, রাজারাজড়া, জমীদার অভাবে অন্ততঃ ছাপাখানার লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসাদার—একটা কাহাকেও 'দেলায়ে' দাও।

২

তার পর কতকাল কেটে গেল। যেটা অলীক বা আজব কল্পনার সামিল ছিলো তাই আজ প্রত্যক্ষ, বাস্তব হলো। নবযুগ। নব সভ্যতা। নব পদ্ধতিধারার কায়েমী অনুপ্রবর্ত্তন। পাশ্চাত্যের ঢেউ ভারতের তটভূমি তোলপাড় কোরে দিল। এখন সাহিত্যে পুরোপুরি দেনা পাওনার খেলা আরম্ভ। যাঁরা পুরাতন, নামকরা তাঁদের হাত দিয়ে যা কিছু বেরোয় নির্বিচারে বাজারে, সাহিত্যের আড়তদারদের 'সেলএ' তা নীলামে ওঠে। বড় বড় বনিয়াদী পত্রিকাধ্যক্ষ আসিয়া 'অফার' করেন, টাকা হাঁকেন—'এত না রূপেয়া মিলে গা বাবুজী'। বাবু নানান্ জহুরীর ঘরে হীরে যাচিয়ে শেষে তাগ মাফিক্ ঝেড়ে দেন। 'নামজাদা' নামে কিছু না বেরুলে আর কাগজ বিক্রী হওয়া ভার। তাই আজকের নামকরা লেখকের কলমের খোঁচায় প্রথমচোটে যা কিছু ঝরে থাকে তাই তিনি 'স্বভাব সুলভ' বোলে লিপিবদ্ধ কোরে যান অম্লানবদনে। তাহার উপর কিছু কালাভিপাত করিয়া সংশোধন কাট ছাঁট তো কল্পনার অতীত—বাজারে মাল নামাতে না নামাতেই সব উড়ে যায়। সাহিত্য-

রসিকরা পরমপ্রীত হইয়া পবিতোষের সহিত সেই সুধা আকণ্ঠপান করেন। যখন যেখানটা বুঝতে পারেন না, বলেন- এর কোন গূঢ় অর্থ আছে এখন ধরতে পারা যাচ্ছে না। প্রাণে লাগলো না, ভালো লাগলো না—বলবার জো নেই। তা ছাড়া জীবন্তভাষা -শক্তিমানেরা যেমন ইচ্ছে নূতন গড়ন দেবার অধিকারী, এ দাবীও আছে।

একবার বাজারে নাম বেজে গেলেই হলো। তারপর মরসুম। কষ্ট টষ্ট যা কিছু, তা তার পূর্ব্বক্ষণ পর্যান্ত। তবে নামজাদা হওয়াটা যে অতীতের একাগ্র পরিশ্রমের ফল, সেটা নিঃসন্দেহ। এখন কষ্টের দিন নষ্ট হয়েছে। সময়ের মূল্য এত বেশী না যদি হতো তাহলে অনেকক্ষেত্রে আশা করা যায় যে নিজের অন্যায় জিদ্ বজায় না রেখে শিল্পী আপনিই বহুজায়গায় রঙ বদলে, অশুদ্ধকে শুদ্ধ কোরে মানসলক্ষ্মীকে পাঁচজনের সামনে ধরতে সাহসী হতেন। এরূপ বেপরোয়া 'বিদধিত' করতে তার বুক কেঁপে উঠ্‌তো। বেহায়া দুঃসাহসী হওয়া তাঁর তখনকার ধাতে সহিত না। আজ আর তা হবার জো নেই। কারবার বহুবিস্তৃত। রূপচাঁদ বড় প্রেমিক। একাগ্র মনে ডাকিলে একহাটে বা অন্যহাটে ভক্তকে দেখা দেবেন-ই সুনিশ্চিত।

সেই নেশায় তাই এঁরা আজ সবাই বিভোর। সেজন্য অনেক সময় অনেক মজার অবস্থা লক্ষ্যপথে আসে। ঘোর যুক্তিবাদী এক সাহিত্যসেবী। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সাগরেদ। ক্রমাগত এতদিন এই প্রচার কোরেচেন যে এটা মহাঅন্যায়,—একজন মানুষকে সবাই মিলে দেবতা বোলে পূজা করা। আমি ইহার ঘোরতর বিরোধী। মানুষকে (তা তিনি হাজার বড় সাধকই হন, ভগবান বোলে যে তোমরা সময় সময় খাড়া করো—ওর মত হীন বুদ্ধি আর নেই।

দিন যায়। চক্রী রূপচাঁদের অমোঘচক্রে সবই সম্ভবপর। এখন দেখি সেই সুধী আসর বুঝে, প্যালার পরিমাণমত ওজন কোরে পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত হোয়েছেন। যেখানে যেমন, ঝোপ বুঝে কোপ দেন। সময় সময় আত্মহারা হয়ে মজে যান। একেবারে তখন বেহুঁস। তাই একদিন সকালে দেখি মানুষরূপী-ভগবানের ভক্ত, জনৈক ধনকুবের

প্রচারিত সাময়িকপত্রে চাঁদীরলোভে কর্ত্তা আপনার সাহিত্যপ্রতিভা বিনাকুণ্ঠায় বেচিয়াছেন। নিজের পৈতৃক জমিজমা যথেষ্ট। তথাপি বলেন—দেশের উন্নতির জন্য যে পশুশালা ফেঁদেছি তাইতে আমার সব জলাঞ্জলি গেল। টাকার খাঁক্তি এখন প্রচণ্ড। আমার নিজের আর কি? ন্যায় অন্যায় যে উপায়েই হোক্ 'রূপো'র দেখা চাই। যে ফুটপাথে সাধারণ রঙ্গালয় ছিল তার উল্টো পথ একক্যালে তিনি ভ্রমণ করতেন। কারণ তিনি এধারে আবার তখন এক প্রকাণ্ড রুচিবাগীশ ধর্ম্মাচার্য্য। অশ্লীলকথা মোটেই মুখে আনেন না। চাঁদার জন্য সেই পুঙ্গব আজ রঙ্গালয়ের সহিত মাখামাখি করছেন। বলেন, পশুগুলোর জন্যে হায়, হায়! সব খোয়ালেম দেশের কাজ কি করি। ছেলেরা মারা যাচ্ছে দুধের অভাবে গোচারণের সুবিস্তৃত সুশ্যামল প্রান্তরের ব্যবস্থা চাই। নিত্য রাতপোহালে প্রতিষ্ঠানে আড়াইশো কোরে টাকা গুণতে হয়। দৈনিক খরচ। ভ্যালা বিপদে বিধি ফেলেচেন।

৩

আর একজন সমব্যবসায়ী বলেন,—মশাই গো, আমি এই কোরেই খাই। আপনার দিক নিয়ে এই ছ-ছটা মাস কাগজে লড়েছি। অতঃপর মাফ করবেন। আর পেরে উঠ্‌বো না। রায়েদের 'নন্তু' বাবু দশটাকা বেশী দিচ্ছেন, এইবার তাঁদের দলের হোয়েই লিখ্‌বো। কি করি, একঘর ছেলেপুলে।—মুখখানি একেবারে 'কাঁচুমাচু'।

—আরে, সে কি মশাই! যে ভাবে এতদিন আলোচনা কচ্ছিলেন সকলেই পড়ে বলতেন, কি প্রাণের ভাষা!—আমাদের দিকটার এমন পাকা ওকালতী আর কেউ কি পারবে? আশ্চয্যি করলেন দেখ্‌ছি যে!

সাহিত্যিক নিঝুম হইয়া বিদায় নিলেন। মনে মনে বল্লেন,—আমাদের প্রাণ যে কোথা তা আমরাই বুঝিনে, তোমরা কি বুঝবে বাপধন! নাঃ—বড় মুস্কিল, এর আগে কতকাল দর্শন বিজ্ঞান কত গুরুগম্ভীর উচ্চতত্ত্বের আলোচনা করে কালক্ষেপ করেছি, এখন দেখ্‌ছি—আর চলে না, বাজারচলন চর্ম্মতন্ত্রের মন্ত্রপূত চটকদার গপ্‌পো না লিখলে আর পেটচলা ভার!

—এই প্রকার নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া রসিক বাটী ফিরিলেন। দ্বিপ্রহর। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। তারপর দেখিলেন বৈটকখানায় একদল প্রার্থী অপেক্ষা করচেন। একজন নয়। দুইজন নয়। চার—চারজন। তাদের মনের কথা যেন মুখেই লেখা। চকিতে চোখ বুলাইয়া রসিক প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লইলেন। যেহেতু অনেককাল তিনি লোক চরাইয়া অন্নের জোগাড়ে ব্যাপৃত।

—আজ্ঞে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনার পরম আরাধ্য গুরুদেব বিগত বীরাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে দেহরক্ষা করেচেন। তিনি ধর্ম্মগুরু। লোক নায়ক। লোককল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালী জনসমাজে তিনি চিরযশস্বী। পরম পুণ্যশ্লোক। আমরা আমাদের মাসিকপত্র 'নবজাতির' তদুদ্দেশ্যে একখানি বিশেষ স্মৃতিসংখ্যা আগামী অগ্রহায়ণে বাহির করিতে চাই। এরজন্য কাহাকেও কিছু দিচ্ছি না। আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। সকলেই প্রেমের সহিত যেটুকু লিখবেন তাই পরম আদরে গ্রহণ করবো। আশা আছে, আপনি ব্যর্থ করবেন না। আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পদ যাঁ হতে পেয়েছেন তাঁর স্মৃতির জন্য, কয়েকছত্র থেকে আশা করি আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

তিনি একবার শ্যেনদৃষ্টিতে সকলের আগাপাস্তলা তাকাইলেন। —তা খবর আগেই এসেছে। অতবড় সংবাদ। দেশময় রাষ্ট্র হোয়েছে। মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু। তবে কি জানেন, আমার শরীরে আজকাল মোটেই যুত্‌ নেই। আর তা ছাড়া গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া তাঁর সন্তানের পক্ষে ধৃষ্টতা। বাবার পরিচয় 'বাবা'। আর যা-কিছু সব বাহুল্য। আমি তাঁর কোলের ছেলে। তাঁর কথা আধ-আধ জড়ান কণ্ঠে কি বলবো। বাক্য রোধ হোয়ে যায়। সমগ্র সাগরসলিল যদি মসী হয় আর জ্ঞানগুরু শ্রীগণপতি যদি স্বয়ং রচয়িতা হন তা হোলেও সে দেবচরিত লিখে শেষ করতে পারেন না। তাঁর বহুধাবিভক্ত চরিত্রের কোনটা লিখবো। কিছু থই পাই না। আমি ভাববিহ্বল। অকৃতী আমি। অধম আমি। ভাগ্যহীন আমি। শেষে শিবগড়তে বাঁদরগড়ে বসবো। গুরু-অপরাধ।—বাপ্‌রে, বড় মারাত্মক। সামান্য একটু চুক্

হোলে সবংশে মারা যাবো। কি দুর্ভাগ্য আমার—জ্যান্তে তিলমাত্র ধরা দিলেন না।

—তিনি স্বপ্রকাশ সূর্য্যস্বরূপ। কাহারও প্রকাশের অপেক্ষা করেন না। স্বয়ংজ্যোতি। আত্মারাম। আর আমার এখন এরূপ অভিভূত অবস্থা যে কলম ধরাই অসম্ভব।

গদগদবাক্যচ্ছটায় প্রার্থীরা প্রথমটা ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় কোরে উঠতে পারলেন না। স্তম্ভব সাধ্য কসরত। বুঝলেন, ডাল গলবে না। বড় শক্ত খেলোয়াড়। তথাপি বেপরোয়া হোয়ে বুক বেঁধে বল্লেন, তাতো—সবই বুঝছি। আপনার প্রাণে যে বড় আঘাত লেগেছে সে ব্যথার চিহ্ন চোখেমুখে মাখানো দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে বেশী কিছু বলাই বাহুল্য। এ কাজের ভার তো ঠিক্ ঠিক্ বলতে গেলে—আপনারই। যা বলেন তাই দুছত্র লিখে দিলেই স্মৃতিপূজা সুসম্পন্ন হবে। আমরা আজ আসি। তা হোলে—আগামী সপ্তাহে দেখা করবো।

লম্বাদাড়ী ও গোঁফের প্রাচুর্য্য আবরণে প্রকৃতি রসিকের বদন-মণ্ডল প্রায় মুখসে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। একটু দেঁতোর হাসি হেসে তিনি তাঁদের শেষ জবাব দানে কৃতার্থ করলেন—অন্য পাঁচজনের কাছে তো আবার আপনাদের আনাগোনা করতে হবে। মাফ করবেন আমায়। আমি এবার পেরে উঠ্‌বো না। ইচ্ছে হয় লিখি। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বুঝি, নারায়ণের ইচ্ছা অন্যরূপ। ইচ্ছাময় আজ নিজেই বিরূপ। অতিবড় বাচাল আজ তাঁর বিধানে বোবা। তা না-হোলে আপনাদের আজ এত বাহুল্য কোরে বলতে হোত না। জানেন তো, চিরকালটাই কাগজে কলমে—এই কোরেই কেটেগেছে। তবে এ আকস্মিক বিপদ বজ্রপাতে আমি আত্মহারা হোয়েছি। ভিতরের ভাবের স্রোত কে যেন সহসা চেপে দিয়েছে। হাঁফ ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়তো হালকা হতে পারতেম। আজও তাঁর দগ্ধচিতা আমার বুকের মাঝে জলছে। কি বলবো আপনাদের! ভাষা পাইনে। আমায় মাফ করবেন।

বেগতিক দেখিয়া যুবকগণ রাজপথে উধাও হইলেন।

—একটা পয়সার মুরোদ নেই। অমনি লিখলেই হলো। আর আমি হেজিপেঁজি নই। হাত পেকে উঠেছে। তোমাদের কাগজে বিনি পয়সায় লিখলে আর রক্ষে আছে,—পাঁচজনে এসে আমার মাস ছিঁড়ে খাবে।—অমুক কাগজে বিনামূল্যে লিখেচেন, আমাদেরও কিছু দিন। এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় ওঁরা গুরুপূজো শেখাচ্চেন,—'পুষ্পং ফলং তোয়ং' যা ইচ্ছে ভক্তি-ভরে গঙ্গার তীরে গিয়ে তিলে জলে গুরুর তর্পণ করার চেয়ে হিঁদুর আর কি পুণ্য—শ্রেষ্ঠপূজা হোতে পারে? ওসব বুজরুকী মুখ্যুদের কাছেই শানায়।

তার পর সে কারবার চুকিয়া গেল। পট পরিবর্ত্তন হইল। বৈকালে একখানি সুন্দর সাজান গোজান ফিট্‌ফাট হাওয়াগাড়ী আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। ভিতরে ছোট বিজলীপাখার বাতাস খাইয়া মালিক মস্‌গুল। অতিকষ্টে আরাম ভাঙ্গিয়া হাই তুলিতে তুলিতে মাটিতে পা ফেলিলেন। মসীবর্ণ সুসজ্জিত মাঝবয়সী স্থূলকায় নাতিদীর্ঘ বাঙ্গালী বাবু! সর্ব্বশরীরে বিলাস মাখান। লেখাপড়ায় প্রায় প্রহ্লাদ। মাথায় দশআনা ছআনা ছাঁটের চক্‌চকে সুবাসিত সুবিন্যস্ত কেশরাশি। মুখমণ্ডলের পরম শোভা 'চার্লিচ্যাপলিন' গোঁফ। পরণে মিহি ফরাস-ডাঙ্গার কালাপেড়ে দেশী ফিন্‌ফিনে ধুতি। পাতলা পাঞ্জাবীর আস্তেন গিলেকরা। মুখে বরমা চুরোট। মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত আল্‌তো আল্‌তো শিস্ দিতেছেন। হাতে আবলুসের ফিন্‌ফিনে হাল্‌কা সোলার মত ষ্টিক। একখানি বাজারচলন মাসিক পত্রের সত্ত্বাধিকারী। পত্রের খুবই কাট্‌তি।

বাড়ীর নফর আসিয়া তাঁহাকে বৈটকখানা কামরার কোমল শোফায় বসাইল। গড়গড়ার উপর অম্বুরী তামাক চড়াইয়া নলটী হাতে দিয়া খাতির দেখাইল। বাবু উপরের পলগুলি দিয়া মিটি মিটি তাকাইয়া বুক দরাজ করিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভাগ্য ফিরিল। চারে রুই কাতলা ধরা পড়িল। নবাগত তাড়াতাড়ি একখানি চক্‌চকে সোকার্ড দিয়া বলিলেন,—চাটার্জ্জিসাবকো সেলাম দেও।

সমাগত সজ্জনের বড়দাদা হটাৎ কলেরায় মাসাবধি মারা গেছেন। তিনি ছোট আদালতের উকীল ছিলেন। পানদোষে জর্জ্জরিত—স্বভাব বড় দুঁদে। পাড়াপড়শী সকলেই তাঁর অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত। এ হেন লোকের স্মৃতিসভায় বড় বড় সাহিত্যিকদের লম্বা লম্বা বাকাবন্যার পালা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। পিছনে অবশ্য রূপচাঁদ ছিলেন। ছোটভায়েব এখন বড় ঝোঁক, ঘরেব কাগজে দাদাব স্মৃতি ছাপাতে হবে। ছবি দিতে হবে, তাঁকে অক্ষয় অমব কোরে রাখতে হবে। তাই সেই নামকরা সাহিত্যিককে উপযুক্ত দর্শনী নিয়ে একটি ফরমাসী প্রশস্তি লিখিয়ে নিতে এসেছেন।

সাহিত্যিক আসিতেই লিফাফায় মোড়া একখানি একশো টাকার চেক্ হাতে দিয়া তিনি সসম্ভ্রমে কুশল প্রশ্ন করিলেন।—অনেক দিন কাজের ফেরে দেখা করতে পারিনি। বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। আমাদের কাগজের 'পলিসির' বিরুদ্ধে ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সেদিন অবিনাশ বাবুর সম্বন্ধে কিছু বার করতে হলো। তিনি বিরুদ্ধ মতের হলেও দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অনেকে তাঁকে পূজা করেন। শ্রদ্ধা করেন। কাগজের সেই 'কপি'র অসম্ভব রকমের 'সেল' হলো। প্রথমটা আমার এক অংশীদার একটু 'চটিত' হয়েছিলেন। তার পর যখন আঁক কষে বুঝিয়ে দিলুম রূপচাঁদের কি অপরিসীম করুণা আমাদের ওপর, তখন কতকটা শান্ত হন। আমি বল্লুম, মতামত নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন, এই রকম কিছু প্রশংসা বের করলেই ঘরে বসে লাভের গুড় ভোগে লাগবে। আমাদের যা প্রকৃত মত তা তো অন্তরে অন্তরে আপনিও জানেন আমিও জানি। আপনি অবুঝ হবেন না।

—আবার তার ওপর এই বিপদপাত। বড়দাদা সেদিন হটাৎ আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেছেন। নানান্ ব্যাপারে আমি একান্ত উদ্‌ব্যস্ত। আমাদের কাগজের জন্য আপনাকে অনুগ্রহ কোরে এখুনি কিছু লিখে দিতে হবে।

সাহিত্যিক বড়দাদাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না। চর্ম্মচক্ষে

কখন দেখিবার সৌভাগ্য পান নাই। ব্যাপার বুঝিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু ক্ষণেক একটু ভাব চাপিতে হইল। মৃত্যু সংবাদ—লোকলজ্জা! হাসি সাজিবে না। ইংরাজী অলঙ্কারে কহে, ভাব গোপনের জন্যই ভাষা। একটি লম্বা প্রতিনমস্কার ঠুকিয়া আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—সে কি কথা, সে কি কথা, আপনি তামাক খান। আমি এখুনি লিখে আপনার হাতে দিচ্ছি। তাতে কোন অসুবিধেই হবে না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিতে লাগিল! সাহিত্যিকের কলম কলের গাড়ীর মত দ্রুত চলিল। সম্পূর্ণ জন্মবৃত্তান্ত—মাস তারিখ তিথি ক্ষণ, পিতৃপরিচয় স্কুলকলেজের পাশের তালিকা জানিয়া লইয়া এক পাতা বেশ পুরা হইয়া যাইবার পর, সাহিত্যিক দেখিলেন, চরম হোয়েছে—বাস্, আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এ বড় আলুনি আলুনি ঠেকছে। জমলো না।

লেখক,—পরম্পরায় উকীলের কুকীর্ত্তির কথা যথেষ্টই শুনেছিলেন। হটাৎ কলম তুলিয়া কিছুক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

সত্বাধিকারী ব্যাপারখানা প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিলেন। দাদার সম্বন্ধে নানারকমের প্রশ্নের ঝুড়ি তখন সব শেষ। সাহিত্যিক অতীব চিন্তিতকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তিনি কি কখনও কোন অনাথালয়ে, কোন ক্ষয়রোগী চিকিৎসায়তনে, ছেলেদের 'ফিবি'পাঠশালে বা অন্য কোথা কিছু দান,—বুঝেচেন তো 'পব্লিক চ্যারিটী',—বুঝেচেন তো—এমন কিছু কখন করেচেন কি? একটা কিছু ওরকম নজীর পেলে সেটি অবলম্বন কোরে বদান্যতার ওপর কিছু ফলাও কোরে লেখা চলে। নইলে সরস হবে না। পড়ে কেউ সুখ পাবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাবু কথা কহিলেন।—তা তিনি সাক্ষাৎভাবে না করলেও আমাদের বাড়ীর ঐ রকম দান যথেষ্টই আছে—যে সে যখন তখন প্রায়ই এসে অমন দুচার আনা নিয়ে যায়। হাঁ—( কিয়ৎক্ষণ বাগানের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ) দেখুন চাটার্জীসাহেব, মনে পড়েছে। ঠিক্ কথা। আমার স্মৃতিশক্তি বড় অল্প। নিশ্চয়ই

ওরূপ কিছু তিনি কোরে থাকবেন। এটা মনে হচ্ছে যেন একবার বাগমারীতে একটা দাতব্য চিকিৎসাগার ছিলো। সেটা এখন সম্ভব উঠে গেছে )—তাতে বড়দাদা একবার দশটাকা দিয়েছিলেন।

—'দেয়ার ইউ আর।'—আমি ঐরূপ কিছু চাচ্ছিলুম। ব্যস্। বাকি দুপাতার 'ম্যাটার' শেষ।

—লেখা নিয়ে হাওয়াগাড়ী চকিতে উড়িয়া চলিল। সাহিত্যিক ও পৃষ্ঠপোষক উভয়েই অলক্ষিতে শয়তানের হাসি হাসিলেন।

৪

রাজনীতি আইন ব্যবসা-বাণিজ্য এসকল কারবারে রূপচাঁদ কি অঘটন ঘটায়, তার অপার ক্ষমতার পরিচয়ে সবাইকে চমকিত করে, দিবাকে ঘোর নিশায় পরিণত করে, চাঁদীর জুতোর চোটে কি না হয়—তা প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে জানেন। সাহিত্য-কথা শেষ হলো। উঠবো উঠবে করচি। বন্ধু বল্লেন—আরে যাও কোথা। বোসো। লণ্ঠন আর একদিকে এইবার ঘোরাও। আরে ভাই, আমরা না হয় কাঞ্চনসেবী। আমাদের এই অবস্থা। আর তুমি কি সেই ছোকরাকে দেখেছ যে দেশের কাজের জন্য সর্ব্বত্যাগ করে বেহালার আতুরালয়ে যোগ দিয়েছে। রূপচাঁদের মোহ কি ভাই, তাদেরও স্পর্শ করে নি?

—একদিন তাকে কথায় কথায় বল্লুম—বুকে হাত দিয়ে কথা বলো। শুনেছি, তোমাদের এক পূর্ব্বতন পুরুষ,—একটু খোঁচ ছিল বলে কোন ধনীর মোটা টাকা অম্লানবদনে ত্যাগ করেছিলেন। কেন,—তিনি তো আতুরালয় স্থাপনে লোকের কল্যাণের জন্য সেই টাকা জমা রাখতে পারতেন। তোমাদের সে তেজ কোথা? চেপে ধরলেই বলো,—ভাই একলা একলা ভগবানের নাম নিয়ে দোর দোর ঘুরে ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করলে বেশী প্রতিগ্রহ করতে হয় না বটে। কিন্তু আশ্রমের জন্য সৎকাজের সুরাহার নিমিত্ত ধনীর উপাসনা কিছু কিছু অবশ্যম্ভাবী। আর রূপচাঁদ বড় অভিমানী।

তার মাথায় আমাদেরও ছাতা ধরতে হয়। অনেক অন্যায় আব্দার বিনা বাক্যব্যয়ে তামিল করি।

—বুঝলে ভাই, এরা কই সকলের প্রতি সদ্বিচার ও ন্যায় আচরণ করে? বল্লেই, কত কথা বলে। শাস্ত্র আওড়ায়।—মনকে আঁখি ঠেরে বলে, সকলে কি সমান? যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন। যারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাদের পূর্ব্বজন্মের কত সুকৃতী। তারা শ্রীমান্ শক্তিমান। যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট সহ্য করতে হয়। একটা ধনী দলে এলে লক্ষ গরীব প্রতিপালন হবে। দলের সুনাম হবে।

—নগ্ন সত্যের জন্য তিল তিল আত্মসমর্পণ সাঁচ্চা করিবার সামর্থ্য—সবচেয়ে কঠিন, দাদা। বিভূতি বিহীন নিরাড়ম্বর সত্যকে কয়জন ধরিতে পারে? সে ঝাঁজ, সে তেজ, সে জোর, চরিত্রের সে সরল সৌন্দর্য্যসুষমা খুব কম কলিজাতেই ফুটিয়া উঠে। সেটা সংসারে দুষ্প্রাপ্য রত্ন।

—আর ঐ এক সানায়ের পোঁ—পরের জন্যে।

—সত্যই কি পরের জন্য?—মনে মুখে এক করে বলো, পরের জন্য এমন সব লোকের কাছে বিনাসঙ্কোচে অর্থ চাহিয়া লয় যাহা দাতা অতিহীন নির্লজ্জ বৃত্তিতে অর্জ্জন করেন। অসতের নিকট থেকে টাকা নিয়ে বড় রকমের ফায়লা কাজকে কি সৎকাজ বলা যায়?—যখন পাপপুণ্য লইয়াই ঘর, তখন ইহাতে কিসের সমর্থন বুঝায়, বল? উহার পারে হইলে—স্বতন্ত্র। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয় বা সংকুচিত হয় ভাব্বার কথা, ভেবে দেখো।

—আবার এও দেখতে পাই। তাদের ভেতর রূপচাঁদকে পরের জন্য ঘরে আনবার কুমন্ত্রে যিনি যত পারদর্শী সুচতুর ও ফিকির-পরায়ণ, তৎকৃত অন্যায়-অবিচার অপরে বিনা বাক্যব্যয়ে অথবা দুর্ব্বল কাপুরুষের মত মাথা পেতে সয়ে নেয়। কিল খেয়ে কিল চুরি। আর মুখে সেই এক বুলি,—প্রতিষ্ঠানের জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য, যে গরু বেশী দুধ দ্যায় ইত্যাদি।

—সত্যি বলতে কি, যে যাই করি প্রত্যেকেরই বুকে হাত দিয়ে একটু রঙ রেখে চলা উচিত।

—বলো—সংসারে কয়টা লোক খাঁটি নগ্ন সত্যের জন্য বিনা আপোষে যুদ্ধ করতে পারে? অধিকাংশের—আমাদের মত জীবনের মানেই গোঁজামিল বা আপোষ। ইতর আর বিশেষ।

—শুনেছি, এক সাধু গুজরাতের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে একদল ডাকাতদের হাতে পড়েন। দেশ তখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। লোকে বুভুক্ষায় অধীর। কাণ্ডজ্ঞানহীন পিশাচে পরিণত। ফকিরের কাছে এক কপর্দ্দকও ছিল না (তিনি রূপচাঁদের সহিত ধর্ম্মঘটব্রত ধারণ করে ফিরছিলেন) বলিয়া প্রাণে মারিল না। বলিল, একটা পয়সাও তোমার ট্যাঁকে পেলে জোর করে কেড়ে নিতুম আর সঙ্গে সঙ্গে তোমায় জ্যান্তে কবর দিতুম। ইহাই আমাদের এখনকার প্রথা। বেঁচে গেলে, বাবাজী।

—বড় ভীষণ অবস্থা। রূপচাঁদের সান্নিধ্যে তখন অবার্থ মৃত্যুযোগ। বাস্তবিক এ সংসার মায়াময়ীর ছায়াবাজী আর এ'রূপের'—নাই তুলনা ত্রিভুবনে।

ব্রহ্মচারী কুমারচৈতন্য।

---

# দেশ-সেবায় সাহিত্য *

সাহিত্য জাতির দর্পণ। নিশ্চল বারিধিবক্ষে প্রতিবিম্বিত অনন্ত নীলাকাশের মত যুগে যুগে প্রতি জাতির আদর্শ ও ভাবপুঞ্জ তাহার সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের প্রথম উদ্বোধনের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, ঘাত প্রতিঘাতে কর্ণধার বিহীন পোতের ন্যায় বঙ্গসাহিত্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এত দিনের কঠোর সাধনার ফল ব্যর্থ হইবার নয়। অতীতের পুঞ্জীভূত সাধনার

* মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে (১৬ই জুন) পঠিত।

ফলসম্ভার লইয়াই বর্ত্তমানের বিরাট সাহিত্য-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ বিংশ শতাব্দীর উপকণ্ঠে বসিয়া অতীতের মনীষিবর্গের মহতী সাধনার ফল উপভোগ করিতেছি। আমরাও জগৎকে যাহা দান করিয়া যাইব উহা যত তুচ্ছ হউক না কেন, অতি সাদরে সে পূত অর্ঘ্য মায়ের রাতুল চরণে অবশ্য স্থান পাইবে।

আজ আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়—আমরা সাহিত্য-সাধনায় কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সাহিত্য-চর্চ্চা ও দেশ-সেবা চিরদিনই অভিন্ন, এই দুইটিকে কখনও পৃথক করিয়া ভাবিতে পারা যায় না। চিরতুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রির বক্ষ চিরিয়া পতিতপাবনী জাহ্নবী যেমন তাহার পূত ধারায় ভারতকে শস্যসম্পদে ভূষিত করিয়া অনাদিকাল হইতে নৃত্য করিয়া ছুটিয়াছে, কত নদ নদী, কত হ্রদ সে ধারায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, মানবের সর্ব্বতোভিসারিণী সনাতনী ভাবধারাও তেমনি করিয়া অনাদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রণালী পরিপুষ্ট করিয়া, সাহিত্যকে নানা ফুলফলে সুশোভিত করিয়া অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রত্যেক জাতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের সাহিত্য ও দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলই পরিপুষ্ট হইয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আদি নিকেতন প্রাচীন গ্রীসের Pericles ও বিশ্ববিশ্রুত রোমের Augustas যুগের ইতিহাস, ইংলণ্ডের রাণী Elizabeth ও মহারাণী Victoriaর গৌরবময় রাজত্ব-কাল, ফরাসীর পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের শাসনকাল ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ভারতের ইতিহাসেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গুপ্তরাজবংশাবতংস ভারতগৌরব বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায়, জ্যোতিষ, শিল্প, কলা প্রভৃতির প্রত্যেকটি জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছে। প্রাচীন পারস্য ও মিশর, মুর-শাসিত স্পেন ও ইস্‌লামগৌরব আল্‌মামুনের বোগদাদ সেই একই কাহিনী জগতের নিকট প্রচার করিয়া আসিয়াছে। বর্ষার প্লাবনে নদ-নদী, খাল বিল যেমন কূলে কূলে ভরিয়া উঠে, আজ ভারতের নব জাগরণের

দিনে বিভিন্ন মানব-চিন্তাধারাও তেমনি করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রঙ্গলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে স্বাধীনতার বাণী যেরূপ জলদ মন্দ্রে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, হেমচন্দ্রের যে মহতী বাণী "শিখরে শিখরে, জলধির জলে" ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, "গোলামের জাতিকে" শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য যে তীব্র অঙ্কুশাঘাত করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, নবীনচন্দ্রের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের যে মর্ম্মবেদনা বাঙ্গলা তথা ভারতগৌরব মোহন-লালের ভিতর দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, সে বাণী, সে মন্ত্র, সে অকপট স্বদেশপ্রীতির গভীর উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের লেখনীমুখে তেমনি ভাবে আর ফুটিয়া উঠে না। এক দিকে যেমন সাহিত্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মানব জীবনের চরম আদর্শের মধুর ছবি সর্ব্ব-সমক্ষে ধরিয়া সকলকে অসীমের দিকে টানিয়া লইবে, তেমনি প্রতি জাতির বৈশিষ্ট্যকে লেখনীমুখে প্রকট করিয়া, জাতির শিল্প, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির ভিতর দিয়া কিরূপে জাতীয় জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেশকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া গড়িয়া তোলাও সাহিত্যের সাধনা।

আমরা জীবন-মরণের এমন এক মৌন সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, যখন শুধু কারুণ্য-রসের লীলাবৈচিত্র্যে বা কলকণ্ঠ পিকবধূর মধুর কাকলিধ্বনিতে এ মঞ্জুল সাহিত্য-কুঞ্জ সুশোভিত বা মুখরিত করিলে চলিবে না। যে কবি বা সাহিত্যিক দেশাত্মবোধের তথাকথিত ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মহীয়সী কল্পনার প্রসাদে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন, যিনি বহুত্বে একত্বের সন্ধান পাইয়া, সার্ব্বজনীন প্রেমে বিভোর হইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহার স্বদেশপ্রেম যত গভীরই হউক না কেন, আমাদের ন্যায় ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন মানবের পক্ষে উহা সম্যক্ উপলব্ধি করা অতীব কঠিন। তাঁহার লেখনীমুখে যে তত্ত্ব-বাণী ফুটিয়া উঠে তাহা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে চিরদিন আদরে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার স্বদেশের ঘোর শোচনীয় অবস্থাকে—বাস্তব জগতের কঠোর সত্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সম্মুখে নিপীড়িত ভারতসন্তান পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া

সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া আছে, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে; অমাবস্যার বিরাট অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞতা-আঁধার এ ভারতবর্ষের উপর জমাট হইয়া আসিতেছে। এ হেন গভীর দুর্দ্দিনে মহামানব-সাগরের বিস্তৃত সৈকতভূমে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার উন্মত্ত বীচিভঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না। চাহিয়া দেখ—সম্মুখে তোমার মুমূর্ষু ভারতবাসী তোমারই মুখে দুটো আশা ও উৎসাহের কথা, অতীতের স্বাধীনতাদীপ্ত ভারতের অত্যুজ্জ্বল আদর্শের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে সাশ্রুনয়নে তোমার পানে তাকাইয়া আছে।

হে সাহিত্যিক, আজ কঠোর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। এই মৃতপ্রায় জাতির অবসন্ন প্রাণে আবার সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া জাতীয় জীবনে আত্মবিশ্বাস জাগাইতে হইবে। সাহিত্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে আবার ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—রুদ্ররসের সেই প্রবল উচ্ছ্বাস, প্রলয়কর্ত্রী রুদ্রাণীর সেই ভৈরব হুঙ্কার। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু খোলকরতালের মৃদুমন্দ ঢিমে তেতালায়, যুগযুগান্তের মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন বাঙ্গলা আপন জড়তা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য মোহের কবল হইতে এই জাতিকে মুক্ত করিতে হইলে, সুপ্ত বাঙ্গালীর জীবনের পরতে পরতে যে বীর্য্য লুক্কায়িত আছে, সে বীর্য্য ও শৌর্য্যের কথা সাহিত্যিককে তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া, শিল্পীকে তাহার অতুল শিল্পনৈপুণ্যের ভিতর দিয়া জাতির সম্মুখে ধরিতে হইবে। স্বামিজী সাহিত্যে যে তেজ, যে উৎসাহ, যে সাহস ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়া দুর্ব্বলতাকে যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পুস্তকাবলি বা সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করিলেই উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি জীবন-নাট্যের শেষ অভিনয় দিন পর্য্যন্ত দেশবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

বাস্তবিকই দেশের এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন সাহিত্য-চর্চ্চা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন জাতির

সম্মুখে ধরিতে পারি—তাহার বৈশিষ্ট্য ও গরিমাময় আদর্শের ছবি। বর্ত্তমান সাহিত্যের আসরে যে সমস্ত প্রথিতনামা সাহিত্যিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা তথা ভারতের গৌরব, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। দুই চারিজন সাহিত্যিক ব্যতীত অধিকাংশের লেখনী সাহিত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা আজ সাহিত্যের আসরে কুরুচিপূর্ণ আদর্শকে সজোরে টানিয়া আনিয়া তাহার লীলাবৈচিত্র্যে সমাজকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াসী, সীতা সাবিত্রী, খনা লীলাবতী, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর পবিত্র নাম আজ অতীতের কিংবদন্তীতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, বর্ত্তমানের সাহিত্য-মন্দির হইতে তাঁহাদিগকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রাচীন কবিগণের রুদ্রতাল আজ প্রেমিক প্রেমিকার শিঞ্জিনীধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, বিলাসমঞ্চই এখন প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। সাহিত্যিকের হস্তে জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলার গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে অথচ সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠায় অশ্লীল ছবি, নগ্ন সৌন্দর্য্যের অবাধ লীলা, প্রতি ছত্রে ছত্রে বিকৃত রুচিপ্রসূত কুৎসিত ভাবের প্রাচুর্য্য দর্শন করিলে যুগপৎ দুঃখ, ক্ষোভ ও ঘৃণায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। জাতীয় শিল্পের এমন শোচনীয় পরিণাম বাঙ্গালার তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে কি-না সন্দেহ!

অবশ্য বঙ্গসাহিত্যমঞ্চে এমন লোকও দুই একজন আছেন যাঁহাদের লেখার ভঙ্গিতে ও রচনাচাতুর্য্যে সাহিত্য পুষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের গুণে সমাজের কুৎসিত চিত্রগুলিও সুন্দরভাবে সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অনুকরণপ্রয়াসী সাহিত্যিক-যশঃপ্রার্থী কতিপয় লেখকের অপক্ক হস্তে সেই দৃশ্য, সেই ছবি এমন বীভৎসরসের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে সাহিত্য দিন দিন আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আপাতরমণীয় পাপপঙ্কিলপথে অজ্ঞাতসারে ছুটিয়া চলিয়াছে। সাহিত্যের নামে এমন ভণ্ডামি, সমাজসংস্কারের নামে এমন ব্যভিচার নিতান্তই অমার্জ্জনীয়। যে সাহিত্যিক দেশকে প্রকৃত

পন্থা প্রদর্শন করিয়া উজ্জ্বল আদর্শের দিকে টানিয়া লইতে সমর্থ নয়, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চা পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার ন্যায় সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

হে সাহিত্যিক, আজ আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার দেশের মেরুদণ্ড যাহারা, যাহাদের অযত্নবর্দ্ধিত দেহখানি আজ অসাড় হইয়া তোমারই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সরলহৃদয় কৃষকের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীতের মধুর স্বর বাজিয়া উঠে কি? যুগযুগান্তের সঞ্চিত পল্লিব্যথা, কৃষককুলের অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা তোমার লেখনীমুখে তেমনি করিয়া ধ্বনিয়া উঠে কি? এ আঁধার যবনিকার অন্তরালে যে পুঞ্জীভূত শক্তি লুক্কায়িত আছে তোমার লেখনীবলে সে সুপ্তশক্তি আবার জাগাইয়া তোল, জ্ঞানালোক-বর্ত্তিকাহস্তে এ জাতিকে তাহার সনাতন আদর্শের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, তবেই তোমার সাহিত্য-সেবা সার্থক হইবে।

এস হে সাহিত্যরসপিপাসু সুধীবৃন্দ, আজ শুভদিনে শুভলগ্নে ভারতীর পূতমন্দিরে এ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদের জীবন সাফল্যে মণ্ডিত করিয়া তুলি—আবার আমরা "মানুষ" হইতে চেষ্টা করি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম-এ।

---

# শ্রীনিম্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষ্যম্

( পূর্ব্বানুবৃত্তি—প্রথম অধ্যায় )

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—বিকার শব্দাৎ=বিকার শব্দ হেতু; ন=ঐ রূপ অর্থ হইতে পারে না; ইতি চেৎ=যদি এইরূপ বলি; ন=না ঐ রূপ বলিতে পার না; প্রাচুর্য্যাৎ=ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্যেও ব্যবহার হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে ব্যবহার হয়, কাজেকাজেই

আনন্দময় শব্দ অধিকারী পরমাত্মা সম্বন্ধে হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে।

এখানে আনন্দময় অর্থ আনন্দের বিকার নহে, অপরিসীম আনন্দ বুঝিতে হইবে।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—তৎ হেতু = সেই হেতু ; ব্যপদেশাৎ চ = উপদেশের জন্য।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ শ্রুতি ( তৈত্তিরীয় উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন, জীবের আনন্দের হেতু ব্রহ্ম, অতএব পরমাত্মা ব্রহ্মই আনন্দময় পদ বাচ্য।

[ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মনং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি ॥"

"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কাঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥"

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥"

—এই জগৎ প্রথমে অসৎ ( অজগৎ বা অপ্রকাশ রূপ ) ছিল, সেই অসৎ ( অদৃশ্য ) হইতে সৎ ( দৃশ্যমান ) জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই "অসৎ" আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অতএব ইনি স্বয়ং কৃত ( স্বয়ম্ভূ )। যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হন। যদি হৃদয়াকাশে সেই আনন্দময় পুরুষ না থাকিতেন, তবে কেই বা শ্বাস ক্রিয়া, কেই বা প্রশ্বাস ক্রিয়া করিত, ইনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। যখন জীব সেই অদৃশ্য অশরীরী বাক্যাতীত সুপ্রতিষ্ঠ বস্তুতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্ববিধ ভয় বিরহিত হইয়া অমৃতস্বরূপ হয়েন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেও তাঁহার ভেদ দর্শন থাকে, সেই

পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ও বর্ত্তমান থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তিও অমননশীল হইলে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভয় থাকে। তৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে।

—ইঁহারই ভয়ে বায়ু পবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহারই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু স্বায় স্বায় কর্ম্মে নিয়োজিত হয়। ]

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৬ সূ ॥

**সূত্রার্থ:**—মান্ত্রবর্ণিকম্ এব চ গীয়তে=মান্ত্রবর্ণিকেও আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

**ভাষ্যানুবাদ:**—তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয় বল্লীর প্রথমেই যে ঋক্ মন্ত্র আছে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" সে মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময় বাক্যে গীত হইয়াছেন।

[ "ওঁ ব্রহ্ম বিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥"—ওঁ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তৎ সম্বন্ধে এই ঋক-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং অনন্ত। যিনি গুহা মধ্যে লুক্কায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে স্থিত সেই ব্রহ্মকে জানাইয়াছেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। ]

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৭ সূ ॥

**সূত্রার্থ:**—ন ইতরঃ=জীব নহে; অনুপপত্তেঃ=জীবের বিষয়ে ঐ সকল গুণ খাটে না।

**ভাষ্যানুবাদ:**—আনন্দময় শব্দকে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যে অসাধারণ ধর্ম্ম সকল বলিয়াছেন তাহা জীবে উপপন্ন হয় না। সেই হেতু জীব আনন্দময় নহে, ব্রহ্ম।

[ ঐ শ্রুতি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি," "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—সেই আনন্দময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক, তিনি ধ্যান

করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়া এতৎ সমস্ত যাহা কিছু আছে, তাহা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ]

ভেদব্যপদেশাচ্চ। ১৮ সূ।

সূত্রার্থ :—ভেদ-ব্যপদেশাৎ চ -আনন্দময়ের সহিত জীবের ভেদ উপদেশ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—তিনি রসস্বরূপ, জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হয়েন—এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা লব্ধব্য ব্রহ্ম এবং লব্ধা জীবের ভেদ শ্রুতি দেখাইতেছেন। অতএব জীব আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহেন।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥ ১৯ সূ॥

সূত্রার্থ :—কামাৎ চ="কাম" শব্দের ব্যবহার হেতুও, ন অনুমান অপেক্ষা=অনুমিত প্রধানের অপেক্ষা করে না।

ভাষ্যানুবাদ :—আনন্দময় সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি বলিতেছেন, "সো'কাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"—ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে আনন্দময় নিজেই নিজের ইচ্ছা হইতে অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা না রাখিয়া সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু আনন্দময় শব্দের অর্থ যদি জীব হয় তাহা হইলে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মক প্রধানের উপাদান ব্যতিরেকে তিনি নিজের ইচ্ছায় নিজকেই বহুরূপে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। যেমন কুম্ভকার কখন মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতীত ঘট রচনা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আনন্দময় জীব নহে, অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম আনন্দময় শব্দের বাচ্য।

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি॥ ২০ সূ॥

সূত্রার্থ :—অস্মিন্=শ্রুতি বাক্যে, অস্য চ=জীবের; তদ্‌যোগং=ব্রহ্মের সহিত যোগ; শাস্তি=উপদেশ আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ," "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন···প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহ্নন্দীভবতি।" ইহাতে জীব রসস্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দী হন এইরূপ উপদেশ থাকায় আনন্দময় জীব হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ।

* * *

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অন্তঃ = আদিত্য ও চক্ষুর অন্তস্থ পুরুষ ব্রহ্ম। তৎ ধর্ম্মোপদেশাৎ = কারণ তাহাতে ব্রহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—আদিত্য ও চক্ষুর অন্তঃস্থিত পুরুষ যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন তিনি পরমাত্মাই। জীব বিশেষ নহেন। কারণ জীব হইলে তাহাতে অপহত-পাপত্ব সর্ব্বাত্মত্বাদি ধর্ম্মের উপদেশ কিরূপে হইতে পারে?

[ ছান্দগ্য উপনিষদে উদ্গীথ-উপাসনায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃপুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।"—আদিত্য মণ্ডলে যে হিরণ্ময় ( জ্যোতির্ম্ময় ) পুরুষ, ঐ আদিত্য মণ্ডলের অভ্যন্তরে ( সমাহিত নির্ম্মল চিত্ত উপাসক কর্ত্তৃক-দৃষ্ট হয়েন, সেই হিরণ্ময় পুরুষের শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই হিরণ্ময়। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় কপির পশ্চাৎ ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক সদৃশ। তাঁহার নাম "উৎ" কারণ তিনি সকল পাপ হইতে উদিত ( মুক্ত )। যে উপাসক ইহা জানেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ]

* * *

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ভেদব্যপদেশাৎ = ভেদের উপদেশ আছে বলিয়া ; চ অন্যঃ = জীব হইতে ব্রহ্ম অন্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—আদিত্য প্রভৃতিতে দেহাভিমানী জীব সকল হইতে পরমাত্মা অন্য।—কেন? শ্রুতি বলিতেছেন, "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ, ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ( বৃ, আ, উ ৩।৭ )—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাঁহাকে আদিত্যও জানেন না, যাঁহার

শরীর আদিত্য, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্য্যামী ও অমৃত।

* * *

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—আকাশঃ = আকাশ পরমাত্মবাচী শব্দ।—কেন? তৎ লিঙ্গাৎ = ব্রহ্মলিঙ্গ যুক্ত বলিয়া!

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবমখণ্ডে আছে, "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ"—এই লোকের গতি কোথায়?—আকাশে। এখানে আকাশ শব্দ পরমাত্মবাচী।—কেন? শ্রুতি তাহার পরে বলিতেছেন, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেবোৎপদ্যন্তে"—এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। এই সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু আকাশ পরমাত্মবাচী।

[ "অস্য লোকস্য বা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বানি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যস্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্। ( ছা, ৬, ১, ৯ )।

* * *

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অতএব = ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু; প্রাণঃ = প্রাণও ব্রহ্মবাচী।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য শ্রুতির উদ্গীথ উপাসনায় ( ১।১১ ) আছে, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে"—এই সমস্ত ভূত প্রাণেতেই প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ হইতেই বহির্গত হয়। এই প্রবেশ ও বহিরাগমন স্থানরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ হইতে প্রাণ পরমাত্মবাচী শব্দ।

[ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা—( ছা ১ম প্রঃ, ১১শ )। ]

* * *

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—জ্যোতিঃ = জ্যোতিঃ শব্দও ব্রহ্মবাচী; চরণ অভিধানাৎ = চরণ শব্দ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে আছে "দিবোজ্যোতিঃ। এই "জ্যোতিঃ" ব্রহ্মই।—কেন? "পাদহস্য সর্ব্বাভূতানি" —ইঁহার একপাদ সর্ব্বভূত ব্যাপ্ত—এই ব্রহ্মলিঙ্গ যুক্ত চরণ শব্দ হেতু।

[ "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেম্বিদং বাব তদ্ যদিদমাস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ"—( ছা, ৩।১৩।৭ )—এই স্বর্গলোক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে, ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে ( অতীত ), সংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে; এই জ্যোতিঃ উত্তমাধম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই পুরুষের ( জীবের ) মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ, ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয়।

"তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"—এতাবৎ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করা হইয়াছে। পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই ইঁহার পাদস্বরূপ; ইনি ত্রিপাদ, এই ত্রিপাদাখ্য পুরুষ গায়ত্র্যাত্মক ব্রহ্মের অমৃত, স্বীয় দ্যোতনাত্মক স্বরূপে এই ত্রিপাদ অবস্থিত। ]

* * *

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ছন্দঃ=পূর্ব্বে ছন্দ শব্দ থাকায় উহা ব্রহ্ম নহে; ইতি চেৎ=যদি এইরূপ বলি; ন=না এইরূপ বলিতে পার না; চেতঃ অর্পণ নিগদাৎ=গায়ত্রী শব্দে চিত্ত সমাধানের কথা আছে বলিয়া; তথা হি দর্শনম্=এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্র্যাখ্য ছন্দের উল্লেখ থাকায় তৎপরা যে "চরণ" শ্রুতি ব্রহ্মপর নহে, যদি এরূপ বলি? না, বলিতে পার না। কেন না ব্রহ্মগুণ যোগ হেতু এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাধানের উপদেশ হেতু গায়ত্রী-শব্দাভিধেয় ব্রহ্মই। দৃষ্টান্তও আছে যে ব্রহ্মসম্বন্ধেই শাস্ত্রে বিরাটরূপের উল্লেখ হইয়াছে।

[ "এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এবং মহাব্রতে ছন্দোগা"—ঋগ্বেদীয়া এই পরমাত্মাকে মহৎ উক্থরূপে উপা-

সনা করিয়া থাকেন, যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যুগণ অগ্নিতে ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং সামবেদীয় ছন্দোগাগণ যজ্ঞে ইহাঁর উপাসনা করিয়া থাকেন। ]

ভূতাদি পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ভূত-আদি-পাদ-ব্যপদেশঃ = গায়ত্রী সম্বন্ধে ভূতাদি পাদের উপদেশ আছে বলিয়া ; উপপত্তেঃ চ এবম্ = গায়ত্রী ব্রহ্মই ইহা উপপত্তি হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি গায়ত্রীতে চিত্ত সমাধানের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি ব্রহ্ম তাহা নহে, গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট বলায়ও তিনি ব্রহ্মই। এই সকল শব্দ ভগবান ব্রহ্মেতেই উপপত্তি হয়।

উপদেশ ভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্য বিরোধাৎ ॥ ২৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—উপদেশ-ভেদাৎ = উপদেশের ভেদ হেতু ; ন ইতি চেৎ = উহা ঠিক নহে যদি বলি ; ন = না বলিতে পার না, উভয়-অস্মিন্-অপি-অবিরোধাৎ = উভয়ে কোনও বিরোধ নাই।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বে শ্রুতি বলিয়াছেন "ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি," এখানে দিবি অধিকরণে সপ্তমী এবং পরে "যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিঃ," এখানে দিবঃ অবধিত্বে বা অপেক্ষার্থে পঞ্চমী—এই উপদেশের ভেদ হেতু উভয় বাক্যের ব্রহ্ম এক নহে। ইহা হইতে পারে না।—কেন ? একই ব্রহ্ম উভয়স্থলেই উক্ত হইয়াছেন। যেমন, "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ," "বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেনঃ"—উভয় বাক্যে একই শ্যেনকে বুঝাইতেছে।

* * *

প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ ॥ ২৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—প্রাণঃ তথা = প্রাণও ব্রহ্ম ; অনুগমাৎ = পূর্ব্বাপর আলোচনা করায়।

ভাষ্যানুবাদ :—কৌষীতকী উপনিষদে "প্রাণোঽস্মি" আমিই প্রাণ ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাদি শব্দ বাচ্য পরমাত্মাই। কেন না হিততমত্ব,

অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহা পরমাত্মবোধক, তাহা ঐ প্রাণ সম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

[ কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দিবদাস পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার অবলম্বনে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, প্রতর্দ্দন বলিলেন, "ত্বমেব মে বৃণীষ যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে"—মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া আপনি মনে করেন তাহা আমাকে বর দিন। ইন্দ্র বলিলেন, "মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে"—আমার স্বরূপ জ্ঞাত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলিয়া আমি বিবেচনা করি। "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব"—আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ুঃ এবং অমৃত জানিয়া উপাসনা কর। "প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিঁল্লোকে অমৃতত্বমাপ্নোতি"—প্রাণ কর্ত্তৃকই পরলোকে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ"—সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ অজর ও অমৃত। ]

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমাহ্যস্মিন ॥ ৩০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ন = না প্রাণাদি শব্দ ব্রহ্মবাচ্য নহে, বক্তুঃ আত্ম উপদেশাৎ = বক্তা ইন্দ্রের আত্ম-উপদেশ হেতু ; ইতি চেৎ = ইহা যদি বলি ; অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা হি অস্মিন = পরমাত্মা অধ্যাত্ম) সম্বন্ধে এই প্রকরণে বহু (ভূমা) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণাদি শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে পারে না।—কেন? না, বক্তা ইন্দ্র "আমাকে জান" এই উপদেশের দ্বারা নিজ দেবতা স্বরূপকেই জানিবার উপদেশ করিতেছেন।—ইহা যদি বলি। না, বলিতে পার না, কারণ এই প্রকরণে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ ঐ প্রাণ ও ইন্দ্রের গুণরূপে বলা হইয়াছে সেই হেতু প্রাণাদি পদার্থ পরমাত্মাই।

শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শাস্ত্র দৃষ্ট্যাতু = শাস্ত্র দৃষ্টান্তেও জানা যায় ; উপদেশঃ = ইন্দ্রের উপদেশ ; বামদেববৎ = বামদেবের সদৃশ্য।

ভাষ্যানুবাদ :—ইন্দ্র সর্ব্ব বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব অবধারণ করিয়াই বলিয়া-

ছিলেন, 'আমাকে জান'। শাস্ত্র দৃষ্টান্তে ইহা যুক্তই বলা হইয়াছে। "তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত"—যিনি সকলকে এক ব্রহ্মরূপে জানেন তাঁহার শোকই বা কোথায় মোহই বা কোথায়—ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য রহিয়াছে। যেমন বামদেব বলিয়াছিলেন "অহম্ মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চ" আমি মনু হইয়াছিলাম আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম—ইহাও সেইরূপ।

[ অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।

অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃংজেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥ ঋগ্বেদ।

৪র্থ মণ্ডল। ২৬ সূ। ১ম ঋক্॥

—আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলঙ্কৃত করিয়াছি। আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর। ]

জীবমুখ্যপ্রাণ লিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিত ত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ॥ ৩২ সূ॥

সূত্রার্থ :—জীব-মুখ্য-প্রাণ লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ=ইন্দ্র শব্দে জীব এবং মুখ্য-প্রাণের চিহ্ন থাকায় উহা ব্রহ্মবাচী নহে যদি বলি; ন=না বলিতে পার না; উপাসা ত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ=ত্রিবিধ উপাসনার ব্রহ্ম সম্বন্ধে আশ্রিত অর্থাৎ উক্ত আছে বলিয়া; ইহ তৎ যোগাৎ= এখানেও তাহার যোগ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারম্ বিদ্যাৎ"—বাক্যকে জানিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বক্তা তাঁহাকেই জান, "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনিত্যাদি"—আমিই ত্রিশীর্ষকে ও ত্বষ্টপুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম ইত্যাদি, "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপরতী"—প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণই শরীরকে রক্ষা করে ও উত্থাপিত করে। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে উক্ত বাক্য সকল হইতে বোধ হয়— ইন্দ্র ও প্রাণ ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নহে, কারণ ঐ স্থলে ঐ দুই শব্দ সম্বন্ধে জীবলিঙ্গ ও মুখ্য প্রাণ-লিঙ্গ স্পষ্ট রহিয়াছে। এইরূপ বলিলে আমরা তাহার উত্তরে বলি—উপাসকের অধিকার বিষয়ে তারতম্য হেতু ব্রহ্মোপাসনা

ত্রিবিধ। (১) জীববর্গের অন্তর্যামিত্বরূপে, (২) প্রাণাদি অচেতন পদার্থের অন্তর্যামিত্বরূপে এবং (৩) তদুভয়ের বিলক্ষণত্ব (অতীত) রূপে। এই ত্রিবিধ উপাসনা অন্য শ্রুতিতে আশ্রিত (অবলম্বিত) আছে। এই শ্রুতিতেও তাহাই অবলম্বিত হইয়াছে।

[ রামানুজ ভাষ্য ইহার অনুকূল। যথা—"এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অন্য প্রকরণেও পরিগৃহীত হইয়াছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তি, আন, ১)—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, 'আনন্দো ব্রহ্ম' (তৈত্তি, ভৃগু, ৬)—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের স্বরূপানুসন্ধান, আর, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ; তদনুপ্রবিশ্য, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চা-নিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চানিলয়ঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যম-ভবৎ (তৈত্তি, আন, ৬।২)—সেই সত্যরূপী ব্রহ্মসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন—ইত্যাদি স্থলে ভোক্তৃ-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ—শরীর-ধারিরূপেও অনুসন্ধান অভিহিত হইয়াছে। অতএব এই প্রকরণেও নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মানুসন্ধানই সঙ্গত হইয়াছে।"

নিম্বার্ক শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তভ নামক ব্যাখ্যানে রামানুজ ভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করও ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, "ব্রহ্মোপসনার ত্রিবি-ধত্ব আছে; এই ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা বিবৃত হইয়াছে—প্রাণধর্ম্মে উপাসনা, প্রজ্ঞাধর্ম্মে উপাসনা এবং স্বধর্ম্মে উপাসনা। ········ অন্যত্রও শ্রুতিতে মনোময় ও প্রাণময় শরীর ইত্যাদি উপাধি-ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে।" ]

ইতি নিম্বার্কীয় ব্রহ্মসূত্রে, প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম পাদঃ।

—বাসুদেবানন্দ।

# জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা

জি—বেদ কোনও নিত্য গ্রন্থ বর্ণ বা বাক্যরাশি কি-না ?

মী—বেদ কোন নিত্য গ্রন্থ নয় বা মাত্র কতকগুলি নিত্য বর্ণ বা বাক্যরাশি নয়। সরস্বতী উপাসকেরা যখন ঐ প্রশ্ন করেন ভগবান শঙ্কর তদুত্তরে বলেন—

কণ্ঠ তাল্বাদি সঙ্গমাৎ।
সমুদ্ভূতস্য বেদস্য নিত্যতা কথমুচ্যতে।
বর্ণমাত্রস্য নিত্যত্বং বর্ণানাং সন্ততেরুত।
নাস্যঃ সর্ব্বলয়ে তেষাং লয় সম্ভবহেতুতঃ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা ইতি জন্যত্বদর্শনাৎ।
যজ্জন্যং তদনিত্যং চেতি প্রমাণান্ন চান্যতমঃ॥
মহর্ষিভ্যোরবিঃ প্রাহ সৃষ্টিকালেঽখিলা প্রভুঃ॥
যুগান্তে প্রলয়ং যাতং বেদমঙ্গ সমন্বিতম্॥

মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর বিজয়ম্॥ ১৫ অধ্যায়॥

"কণ্ঠ তালু প্রভৃতির যোগে বেদ বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহার নিত্যতা কিরূপে হইবে? আর এক কথা—বর্ণ মাত্র নিত্য, কি বর্ণ সমূহ নিত্য? বর্ণ মাত্র নিত্য হইতে পারে না। কারণ, যখন সকল পদার্থের লয় হইবে, তখন লয় হইবার কারণ থাকাতে একটি বর্ণ থাকিবে, ইহা অযৌক্তিক কথা। "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ"—বেদ সকল যাঁহার নিঃশ্বাস; এই বচন দ্বারা বেদ জন্য-পদার্থ। যে বস্তু জন্য, সে বস্তু অনিত্য—এরূপ প্রমাণে শেষ পক্ষটিও বলা যাইবে না। অখিল পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান সূর্য্য সৃষ্টিকালে মহর্ষিগণকে বলিয়াছিলেন, যুগের শেষ সময়ে শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গ সমন্বিত বেদ লয় প্রাপ্ত হইবে।"

* * * *

জি—মালা তিলক প্রভৃতি চিহ্ন ধারণের সহিত মোক্ষের সম্বন্ধ কি ?

স্বামী—ইহারা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। প্রবর্ত্তকদিগের ভাবোদ্দীপন করে মাত্র। আচার্য্য শঙ্করকে কতকগুলি শৈবেরা চিহ্ন ধারণ করেন নাই বলিয়া দুর্বাক্য বলেন। তিনি উত্তরে বলেন—

মূলহীনং তু লিঙ্গাদের্ধারণং ত্যাজ্যমেবহি।
সর্ব্বদেবময়স্যাস্য তাপঃ শ্রেয়স্করো নহি॥ শং বি॥ ১৫ অধ্যায়॥

"কিন্তু লিঙ্গাদি ধারণ করিবার কোনও মূল নাই; সুতরাং উহা ত্যাগ করা উচিত। যিনি সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে তাপ দিলে মঙ্গল হয় না।"

বেদার্থজ্ঞং ব্রহ্মবোধায় গচ্ছেদিত্যেবং তস্মাদ্বিমোক্ষায়বোধাম্।
ব্রহ্মৈবান্য চিহ্ন সংধারণং তু ব্যর্থং মুক্তিঃ কেবলং জ্ঞানতোঽস্তি॥ ঐ॥

"একমনে বেদের অর্থজ্ঞ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গমন করিবেন। অতএব মোক্ষের জন্য ব্রহ্মকেই জানিবে। অন্য চিহ্ন ধারণ করা বৃথা, মুক্তি কেবল জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়।"

কিঞ্চ কৈবল্যোপনিষদ্বচঃ॥

শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহীত্যেবং ব্রূতে নৈব শূলাদি চিহ্নং।
জ্ঞানস্যাঙ্গং তেন নাস্ত্যেব তস্য জ্ঞানেপ্সূনাং ধারণং ভোঃ! কদাপি॥
"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" কোঽপি মুক্ত্যা ইত্যাদ্যৈর্ব্বেদবাক্যৈ মুমুক্ষোঃ।
নাস্ত্যেবার্থোদেহ সন্তাপনেন নিন্দা তস্য শ্রূয়মাণা হি শাস্ত্রে॥ ঐ॥

"কৈবল্য উপনিষদে এইরূপ লেখা আছে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান যোগে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। অতএব শূলাদি চিহ্ন কখন জ্ঞানের অঙ্গ নহে, এই কারণে জ্ঞানার্থিগণের বিভূত্যাদি ধারণ কখনও কর্ত্তব্য নহে। 'তিনি ব্যতীত মুক্তির আর কোন পথ নাই' ইত্যাদি বেদ বাক্যদ্বারা মোক্ষার্থীর দেহ সন্তাপে কোন ফলোদয় হয় না, বরং ঐরূপ কার্য্যে শাস্ত্রে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে।"

প্রহ্লাদস্য বিভীষণস্য গজরাজস্য ধ্রুবস্যানিলের্দ্রৌপদ্যা ব্রজবাসিনাঞ্চ খলু কশ্চক্রাঙ্কনং কেঽকরোৎ॥ ঐ॥

"প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ধ্রুব, বায়ুসুত হনুমান, দ্রৌপদী এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন?"

* * * *

জি—শঙ্কর মতাবলম্বী সাধুদের দেবপূজা, নৃত্য, ভজনগীতি, পাকাদি কর্ম্ম, আহারের পূর্ব্বে "ব্রহ্মার্পণ" মন্ত্রপাঠ—আধুনিক ?—না আচার্য্যের সমসাময়িক ?

মী—শঙ্করবিজয়ের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে—

পুরং গণবরং প্রাপ্য গণপত্যাশ্রমং শুভম্।
তত্র নদ্যাং হি কৌমুদ্যাং স্নাত্বা বিঘ্নেশমব্যয়ম্।
সুপূজ্য যতিরাট্ তত্র মাসমাস সহানুগৈঃ।
পদ্মপাদমুখাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চপূজা পরায়ণাঃ॥
দিগগজা ইতি বিখ্যাতাঃ পরবিদ্যা প্রভেদিনঃ।
পরপক্ষহরোদ্যুক্ত বচসঃ প্রৌঢবাদিনঃ॥
তদ্বাক্যং শিরসা গৃহ্য শিষ্যোঽন্যঃ পুরজিদ্বলে।
নিয়তঃ সর্ব্বশিষ্যাণাং পাকাদিষু চ কর্ম্মসু।
সমর্চ্চয়ন্ গুরুং ভিক্ষাং দত্বা তস্মৈ পরাত্মনে।
পদ্মপাদস্তদন্যেষাং শিষ্যাণাং ষড্রসৈর্যুতম্॥
অদদদ্ভোজনং নিত্যং ব্রহ্মার্পণমিতি স্মরণ।
সায়ন্তনে গুরুং শিষ্যাস্তমাচার্য্য শিরোমণিম্॥
দ্বিষড়্ধা তং নমস্কৃত্য ঢক্কাতাল করা শিবম্।
স্তবন্তো নৃত্যমাচক্রু পরেশং সচ্চিদব্যয়ম্॥

"অতএব আচার্য্য গণপতির আশ্রম সমন্বিত এক শুভ গণবরপুর প্রাপ্ত হইলেন। সেই কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া অব্যয় বিঘ্নপতিকে পূজা করিয়া যতিরাট্ অনুচরবর্গের সহিত তথায় একমাস অবস্থান করিলেন। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ পঞ্চদেবতার পূজা পরায়ণ হইল, দিগ্‌গজ বলিয়া বিখ্যাত হইল, বিপক্ষগণের শাস্ত্র সকল খণ্ডন করিতে লাগিল, পরপক্ষ হরণ করিবার উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, অহঙ্কার পূর্ব্বক বাদ করিতে লাগিল। অন্য আর একজন শিষ্য তাঁহার বাক্য মস্তকদ্বারা ধারণ করিয়া শিববলে সমস্ত শিষ্যদিগের পাকাদি কার্য্যে

আসক্ত রহিল এবং গুরুকে সমুচিত অর্চনা করিতে লাগিল। পাদপদ্ম সেই পরমাত্মা গুরুকে ভিক্ষা ও অন্যান্য শিষ্যদিগকে ষড়রসযুক্ত আহার দান করিলেন। ঐ সকল কার্য্যেও পদ্মপাদের 'ব্রহ্মার্পণ' স্মরণ করা নিত্য অভ্যাস ছিল। সায়ং কালে শিষ্যগণ আচার্য্য শিরোমণি গুরুদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া ঢকার তাল দিতে দিতে সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল।"

---

## সমালোচনা

বর্ণাশ্রম—শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত। স্বামিজীর প্রতিপাদ্য বিষয়—স্ত্রী-শূদ্রের বেদাধিকার নিরাস। ইহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন—

ধর্ম্ম, সাধারণ ও বিশেষ—বিশেষ ধর্ম্মই জগৎ স্থিতি পুষ্টির কারণ সুতরাং অপরিহার্য্য—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই বিশেষ ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—সমষ্টি সৃষ্টির অবরোহিণী গতিতে প্রাকৃতিক গুণপরিণামে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি—প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু ঊর্দ্ধোধঃ চরাচরে উহার বিকাশ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কল্পিত নহে—শাস্ত্র দৃষ্টিতে সমালোচনা ও ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদ—অন্যান্য দেশে না থাকিলেও ভারতে বর্ণাশ্রম থাকা কিছুই অযুক্ত নহে।

বর্ণ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা—গুণকর্ম্মানুসারে জীবের বিভিন্ন বর্ণে জন্ম—সর্ব্বজাতিরই বেদে অধিকার না হইবার হেতু—জাতি কি?—জাতির বহুত্ব হেতু জাতিভেদে ধর্ম্ম ও অধিকার ভেদের সমীচীনতা—অসাধারণ ধর্ম্মবলেই আরূঢ় গতিতার বেদাধিকার—অসবর্ণ বিবাহ যথেচ্ছাচার রোধের জন্যই বিহিত পরন্তু উহা শাস্ত্রে নিন্দিত এবং উহার ফল অতি বিষময় (জাতিনাশ ও নরক প্রাপ্তি)—কর্ম্মগত গুণ বর্ণত্বের কারণ হয় না।

ইহ জন্মের কর্ম্মকে বর্ণত্বের কারণ স্বীকারের অসম্ভাব্যতা ও অযৌক্তিকতা—উচ্চবর্ণে অযোগ্য ও নীচবর্ণে যোগ্য পুরুষের উৎপত্তির

কারণ আরূঢ় পতনাদি—চতুর্থবর্ণের বেদে অনধিকার ঈর্ষামূলক নহে পরন্তু অনুকম্পা মূলক।

শাস্ত্রের কদর্থের নিরসন—নিরাকার সগুণের (দয়াময় ইত্যাদির) উপাসনার অসিদ্ধতা—ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—দেবতা সগুণ) উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও তাহার বিরোধিমতের খণ্ডন—ব্রহ্মজ্ঞান কথন।

আশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা—আশ্রম ক্রম—সন্ন্যাসের অধিকারী নির্ণয়—বৈদিক সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী ভেদ ও সাধারণ চর্য্যা—তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

আলোচ্য বিষয়ে বহু শিখিবার ও ভাবিবার বস্তু আছে। কিন্তু অধিকারী নির্ণয় সম্বন্ধে 'উদ্বোধনে' (বিগত মাঘ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত) আমরা ধারাবাহিক রূপে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত "শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। স্বামিজীর প্রমাণ স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত পরন্তু পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রমাণ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তর্ক-মার্জ্জিত। মনু মহারাজ ও আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। স্বামিজী ব্রহ্মসূত্রের "অপশূদ্র" প্রকরণের শঙ্কর-ভাষ্যের কথা উল্লেখ করিতে পারেন কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য পণ্ডিতজী বিশেষ ভাবে তাঁহার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—সে বিষয়ে আমরা স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

তাহা ছাড়া ১৩৩০ সনের মাঘ হইতে চৈত্রের 'উদ্বোধনে' শ্রীযুক্ত অহিভূষণ দে চৌধুরী লিখিত "বৈদিক অধিকারী রহস্য" ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ সেন লিখিত (উক্ত বর্ষের ফাল্গুনের) "বর্ণবিভাগ" শীর্ষক প্রবন্ধও আমরা লেখককে পড়িতে অনুরোধ করি।

**বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস** (চতুর্থ খণ্ড)—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী প্রণীত—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহামূল্য গ্রন্থ যে বাঙ্গালীর ভাবসম্পদের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না। এ বিষয়ে আমরা বিগত ১৩২৯ মাঘের 'উদ্বোধনে' বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

# কবির আদর

সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্র সংবাদ আসিয়াছে ইউরোপে কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও সর্ব্বত্র সমাদর হইতেছে। ইহা যোগ্যের যোগ্য আদর। কবি-প্রতিভার তারিফ, ভারত-প্রতিভারই জয়গান। তাই জনে জনে ভারতবাসী প্রত্যেকে ইহাতে গৌরবান্বিত।

# মেদিনীপুরে বন্যা

## শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নিবেদন

আমাদের সেবাকার্য্য বর্ত্তমানে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর, ভগবানপুর থানার অন্তর্গত ইটাবেড়িয়া এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত পালপাড়া বা টোটানালা কেন্দ্রে সুচারুরূপে চলিতেছে। শীঘ্রই আর একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইবে।

বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামসমূহের অবস্থার এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সহৃদয় দেশবাসী সহস্র সহস্র বিপন্ন নর-নারীর সাহায্য কল্পে যত্নবান হউন এই নিবেদন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ১নং মুখার্জ্জিলেন, বাগবাজার—কলিকাতা,

(২) প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়—হাওড়া।

স্বাঃ সারদানন্দ—সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

---

# সংঘ-বার্ত্তা

গত ২৭শে ভাদ্র রাত্রি ১-৩০ মিনিটের সময় ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণচৈতন্য কাশী—সেবাশ্রমে শরীরত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে ইনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং শরীরত্যাগ কালে ইঁহার বয়স মাত্র কুড়ি একুশ বৎসর হইয়াছিল। এত অল্প দিনের মধ্যেই এই তরুণ ব্রহ্মচারী স্বীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে ও সরল ব্যবহারে সংঘের অনেকেরই স্নেহ ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

# মেরী মড্‌লীনের প্রার্থনা

ওগো ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আজি
রেখ না আমায় ধরে,
কেন বুঝিছ না আমার বেদনা
বুঝাই কেমন করে!
দেখিছ না প্রিয় আনন-কমলে
আশার অরুণ ভাস,
রঞ্জিত মরি, ইঙ্গিত করি,
কি চাহে আমার পাশ?
আজি ও-চরণ মম চুম্বন
করিবারে চাহে পান;
মোর কুন্তল, মোর আঁখি জল,
প্রিয়তম আজি চান।
কেবা বলে দিবে কোনখানে কবে
ওগো আমি আরবার,—
পাব সে শোণিত-লিপ্ত-লোহিত
পদ পরশিতে তাঁর?
আসিয়াছে আলো আজি মোরে ভালো
বেসেছেন প্রিয়তম,

Christiana Rossetti—বিরচিত।

ডেকেছেন তিনি, চেয়েছেন ফিরে
আকুল প্রণয় মম !
ওই পুনরায়, বুঝি শোনা যায়
ডাকিছেন মোর স্বামী,
ছেড়ে দাও মোরে রেখনাক ধরে
যাই প্রভু,—যাই আমি।

শ্রীনীহারিকা দেবী।

---

# স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম্ম

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

দেশ—ধর্ম্মকেও সভ্যতার একটা অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল ;—ধর্ম্মসাধনও চলিতেছিল ভাসা ভাসা নিতান্তই পোষাকী ভাবে। গির্জ্জার ছাঁচে মন্দির—সাপ্তাহিক উপাসনার অনুকরণে উপাসনা—ইউরোপের নিরাকার-বাদের মতই অবিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিহীন ব্রহ্মপূজা সবই চলিতেছিল, কিন্তু একটা বস্তু ছিল না—তাহা ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতি।

কাজেই ধর্ম্মের যাহা ফল তাহা ফলিতেছিল না ; মানবের অন্তরে শুদ্ধি ছিল না, আর ছিল না শান্তি। ধর্ম্মসাধন বাহ্যিক ভাবে চলিত বলিয়া সাধকের অন্তরাত্মা নিতান্তই তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ম্মে মর্ম্মে মানুষ পীড়িত হইতেছিল—এ পথ নয়, এ পদ্ধতি নয়।

এই অশান্তির, মূর্ত্ত অভিব্যক্তিই যেন বিবেকানন্দ। দেশ গতানুগতিক ভাবে চলিতে লাগিল, কিন্তু বিবেকানন্দ তাহা পারিলেন

না, পারা তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তিনি যে যুগপ্রবর্ত্তক, তিনি যে আসিয়াছেন জড়বাদ-মোহিত জাতির অন্তরে ভাগবত অনুভূতির সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে; তাই নিরাশা-দগ্ধ অশান্ত সাধক আচার্য্যকে শুধাইলেন, "ঈশ্বর আছেন? আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" উত্তর কিন্তু মিলিল না।

পশ্চিমের স্পর্শ যেখানে লাগিয়াছে সেখান হইতে আজ এ উত্তর পাওয়া সম্ভব নহে। এই জিজ্ঞাসাটি রূপক। এ যেন বিবেকানন্দের মূর্ত্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সেবক ভারতবর্ষের ইউরোপের কাছে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। আর ঐ নিরুত্তর ভাব যেন নব সভ্যতার পরাজয়।

ভারতের সাধনাতেই কেবল এ উত্তর পাওয়া সম্ভব। ভারতই কেবল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পরিয়াছে আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বিবেকানন্দ উত্তর পাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। আরণ্যক ঋষির মতই অভয় বাণী উদ্গীত হইল—"হাঁ ঈশ্বর আছেন, আমি তোমায় প্রত্যক্ষ করাইব।" পথভ্রষ্ট ভারত পথ পাইল, আত্মসংস্থ হইল। বিবেকানন্দকে দীক্ষিত করিয়া রামকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

স্বামিজী, ঠাকুর রামকৃষ্ণের শক্তি লাভ না করিলে হইতেন হয় তো একজন বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তি, বক্তা বা রাজনীতিক। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হইতেন না, তাঁর আগমন অসিদ্ধ হইত।

বিবেকানন্দ ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত নহেন—প্রবর্ত্তক। তিনি আসিয়াছিলেন ভারতকে আবার অভ্যুদিত করিয়া পূর্ব্ব তপশ্চর্য্যায় তপস্বী করিতে; জড় অভ্যুদয়ে ভারতের পরাজয়, সনাতন সভ্যতার অনুসরণেই ভারতের জয়।

বর্ত্তমানে সনাতনধর্ম্মীর প্রধান ব্যাধি পরাধীনতা এবং ইহা রাষ্ট্র অপেক্ষা মনোরাজ্যেই অধিক। আর ইহারই ফলে ভারত উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। রাজশক্তি হস্তান্তরিত হইলেও, জাতির যে আত্মস্থ ভাব থাকিলে আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। জাতীয় চিত্ত পাশ্চাত্য ভাবে বিমুগ্ধ;

এবং যাঁহারা উহার অগ্রসাধক, তাঁহারা দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম, শিক্ষা সভ্যতা সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবলই পরিত্যাগ নহে, উহা ভাঙ্গিবার জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই এই মোহের অপনোদন করিয়া জাতির ভবিষ্য কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিশেষ যুগের এক একটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে। অবতার সেই যুগধর্ম্মেরই প্রতীক ও সাধক। অবতারত্ব ঐ যুগধর্ম্ম পরিপালনের জন্যই। দার্শনিক গৌরাঙ্গ—প্রেমিক প্রভু নিমাই, অদ্বৈতবাদী—তার্কিক—যোদ্ধা—শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথী, এ সকলেরই গূঢ় তাৎপর্য্য আছে; তাহা যুগের বিশেষ ধর্ম্মসাধন। বিবেকানন্দও ত্যাগী, সন্ন্যাসী, মুমুক্ষু এই নিকষে তাঁহার বিচার করিলে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে না; বরং ভুল ধারণা হওয়াই সম্ভব।

কারণ ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-শঙ্কর বিমিশ্রিত যে আদর্শের সহিত পরিচিত বিবেকানন্দ অবিকল তাহারই অনুরূপ নহেন। তিনি কৌপীন চীর-সম্বল, লোকালয় বর্জ্জিত বনবাসী বিরক্ত সন্ন্যাসী নহেন। বিবেকানন্দকে দেখিতে পাইতেছি—লোক প্লাবিত মুখরিত মহাসভায়, বিবেকানন্দ বক্তা—আচার্য্য—বিশ্বমানবের নিয়ামক—মহা রাজসকর্ম্মী। ভারত, বনে কান্তারে ধ্যানরত যে তাপস মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এই অপরূপ যুগ সন্ন্যাসীর বিশেষ সাদৃশ্য নাই। এমন কি তাঁহার গুরু পরমহংস দেবের সহিতও তাঁহার একটি প্রভেদ সহজেই ধরা পড়ে।

এই প্রভেদই স্বামিজীর বিশেষত্ব; আর তাঁহাকে বুঝিতে হইলে একবার ইতিহাসের প্রতি তাকাইয়া এই বিভিন্ন বিশেষত্বের অর্থ বুঝিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র সমরে যে ক্লৈব্য পার্থকে সংমূঢ় করিয়াছিল, বৌদ্ধ প্লাবনের অন্তে আবার সেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস ভারতের জন-প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়াছিল। প্রচলিত সন্ন্যাসধর্ম্ম তাহারই অভিব্যক্তি। এ সন্ন্যাস আর্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম নহে।

সনাতন ভারতের নির্দ্দেশ বিবেকানন্দের কণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে, "ঐ জৈন বৌদ্ধধর্ম্মের পাল্লায় পড়ে, আমরা ঐ তমোগুণের পাল্লায় পড়েছি, দেশশুদ্ধ পড়ে কত হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বছর।"

এই বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের প্রতিবাদ স্বরূপই স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর জীবন-ধর্ম্ম সবই বিগত বৌদ্ধ যুগের সন্ন্যাস প্রণালী হইতে পৃথক। তাই দেশ কৌপীনবস্ত গুহাবাসী ধ্যানপরায়ণ বিবেকানন্দ না দেখিয়া—দেখিয়াছে বীরব্রতী কর্ম্ম-চঞ্চল।

ভারতের সনাতন সন্ন্যাস এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসে বিস্তর পার্থক্য। একটি সত্ত্ব প্রধান, অন্যটি অনেকটা তমোপ্রবণ, একটি সৃষ্টির অমৃত, অপরটি সৃষ্টি বিলোপের, একটিতে জীবনের প্রসারতা, অন্যটি অন্তরের দৈন্য। চতুরাশ্রমের যে ভিক্ষুব্রত তাহা সৃষ্টিকে অবহেলা করিয়া নহে, এবং বিশ্ব-বিধানের বিরুদ্ধতা করিয়াও নহে। তিনটি আশ্রমে সংযমের দ্বারা প্রবৃত্তি ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শেষ আশ্রমে আত্মজ্ঞানের সাধনাই ভিক্ষুধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এ ত্যাগ বা বিরতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস নহে; কিন্তু ইহা কর্ম্ম ত্যাগের যে পরিণতি তাহারই অভিমুখী। কর্ম্ম-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির বিনাশ। কিন্তু কর্ম্ম পরিহার করিলেই যে কামনার ধ্বংস হইবে এমন নহে। কামনার আশ্রয়ভূমি চিত্ত, কর্ম্মত্যাগ করিলেও বাসনার বিনাশ হয় না। গীতায় ইহাকে "মনসা স্মরণ" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযম করিলেও মানসিক উপভোগ চলিতে থাকে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বাসনা-মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "মা ফলেষু কদাচন।"

( ক্রমশঃ ) শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ

## ২১।১।২১—কাশীধাম

গত ২০শে তারিখে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, "মটরে করে মোগল-সরাই থেকে আসবার সময় দুধারে খোলা মাঠ প্রভৃতি দেখেও যে আনন্দ হল না, এমনি ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য যে, যেই bridge (গঙ্গার উপর পোল) পার হয়ে আসা অমনি এমন একটা মাধুর্য্য অনুভব করলুম কি বল্‌বো! শিব ক্ষেত্র—শিবই গুরু। একদিকে মা অন্ন-পূর্ণা অন্ন দিয়ে বাইরের অভাব দূর করছেন, অন্যদিকে বাবা বিশ্ব-নাথ ধর্ম্ম দিচ্ছেন। ঠাকুরের নিকট দাড়িওয়ালা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এসে তাঁকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন মহাকাল-ভৈরব। ঠাকুরের দেহটা পড়েছিল।"

একজন আসিয়া মহারাজের হাতে গঙ্গাজল দিলেন। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সকলের হাতে দাও।" তার পর বলিলেন "গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি অভীষ্ট দায়িনী, ইষ্ট দর্শনের সহায়ক। ঠাকুর বল্‌তেন,—'গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, আর বৃন্দাবনের রজঃ সব ব্রহ্ম-স্বরূপ।' কুলকুণ্ডলিনী যখন অধো মুখে থাকেন তখন জীবের মন লিঙ্গ গুহ্য নাভির বিষয় নিয়ে থাকে। কুলকুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধ মুখ হলে ভগবৎ বিষয় নিয়ে থাকে। সত্ত্বগুণ বাড়লে ঈশ্বরের রূপ দেখতে ইচ্ছা হয়, তাঁর নাম করতে ধ্যান করতে ভাল লাগে।"

## ২৫।১।২১, প্রাতঃকাল—কাশীধাম

শ্রীশ্রীমহারাজ সুরেশকে মহানিশায় জপ করিতে বলিলেন, মহা-নিশায় না পারিলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে; পুরশ্চরণ করিতে ও ধ্যান ভজনে ডুবিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তার পর সাধকের আহার সম্বন্ধে

বলিলেন, "রাত্রে খাওয়াটা কমাতে হয়। বার আনা আন্দাজ খাবে, পরে আট আনা হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম শরীর দুর্ব্বল বোধ হলেও পরে ঠিক হয়ে যায়, বরং তাতে শরীব ঝরঝরে থাকে।" তপস্যার সময় তিনি নিজে ও অন্যান্য গুরুভাইরা যে একাহারী থাকিতেন তাহার উল্লেখ করিলেন। আজই সন্ধ্যাব সময় বিমলকে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "কোন মহাপুরুষের কাছ থেকে জেনে নিয়ে methodically (সুশৃঙ্খল ভাবে) সাধন করতে হয়, haphazardly (বেগার ঠেলা) করলে তত ফল হয় না। মাঝে ছেড়ে দিলেই আবার দুনো খাটতে হয়। অবশ্য একেবারে ফেলা যায় না। সাধন পথে থাকলেই কাম ক্রোধাদি সব চলে যাবে। এখন মন রজঃ তমতে আচ্ছন্ন রয়েছে সেটাকে শুদ্ধ কবতে, সূক্ষ্ম করতে হবে, সত্ত্বগুণে নিয়ে যেতে হবে। তখন ধ্যান জপ ভাল লাগবে, বেশী বেশী করতে ইচ্ছা হবে; তার পর যখন মন শুদ্ধসত্ত্ব হবে তখন ঐ নিয়েই থাকবে। মন এখন জড়, কাজেই জড়ের প্রতি তার আকর্ষণ, আবার যখন চেতন হবে তখন চেতনকে টানবে। সূক্ষ্ম হলে তবে মনের capacity (ধারণা শক্তি) বেড়ে যাবে, ঈশ্বরীয় তত্ত্ব শীঘ্র বুঝতে পারবে। ধ্যান করতে বসবার সময় একটা আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করে নেবে। তাতে nerveগুলি (স্নায়ু) soothed (স্নিগ্ধ) হয়ে যাবে, নইলে শুঁটকো ধ্যান হবে। ইষ্টমূর্ত্তিকে সহাস্য আনন্দময় ভাবে চিন্তা করবে। আর সময় নষ্ট কবিস নে। রিপু সব এখন প্রবল হয়ে রয়েছে, এখন তাদের বেগ সহ্য করতে হবে তাতে কষ্টও হবে। কিন্তু সাত আট বছর খাট্, এক বছরেই ফল বুঝতে পারবি; মেয়েরাও পারছে আর তোরা পারবি নে? ওদের বিশ্বাস বেশী, চট্ করে কাজ হয়। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। একটু কর্ না, দেখ্‌বি তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তিনি বিপদ আপদ থেকে সর্ব্বদা রক্ষা করছেন, তাঁর কত কৃপা এসব কি বুঝান যায়? এসব শুনছিস্— এগুলো realize (উপলব্ধি) কর্, পড়াশুনো বিচার যথেষ্ট হয়েছে এখন কিছু কর্, যার যেটা নিজের ভাব তাই নিয়ে প্রথমে আরম্ভ

করতে হয়। পরে পাকা হয়ে গেলে সব ভাবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা চলে। Feelings ( ভাব-প্রবণতা ) চেপে রাখতে হয়, জপের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি চিন্তা করতে হয়, নইলে ভাল হয় না। পূর্ণ মূর্ত্তি ধ্যান না হলে অংশতঃ ধ্যান করবে, পাদপদ্ম থেকে আরম্ভ করবে, না হলে ছাড়বে কেন? এতো করতেই হবে—করতে করতেই হবে। ধ্যান কি হয়? ধ্যানের next step ( পরের অবস্থা ) হচ্ছে সমাধি। নির্ভর প্রভৃতি যা কিছু সবই সাধনের দ্বারা ভিতর থেকে বেরুবে। তাঁকে সব ছেড়ে দে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ'।

৩।২।২১—কাশীধাম

শ্রীশ্রীমহারাজকে ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ। পূজা, পাঠ, ভজন—এসব কি বাহ্য পূজা?"

শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "পূজা—বাহ্য ও মানস দুই-ই include করে ( বুঝায় )। মনে মনে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা পূজা করে ধ্যান ও মানস জপ করবে। ধ্যান কালে মূর্ত্তিটিকে জ্যোতির্ম্ময় রূপে ভাবতে হয়, তাঁর জ্যোতিঃতে সব আলো। তাঁকে Immaterial ( চৈতন্য স্বরূপ ) ভাববে, পরে ইহাই নিরাকার ধ্যানে সহজে পরিণত হয়। প্রথমটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়, তার পরে বোধ-চক্ষু হয়; তাতে বোধে বোধ হয়। তার পর জ্ঞান-চক্ষু ফোটে, তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর একটা জগৎ—এটা তার ছায়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। তার পর মন লয় হয়, তখন সমাধি। তার পর নির্ব্বিকল্প, তার পরে আরও এগিয়ে কি যে, কিছু বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শুনা নাই, অনন্ত—অনন্ত। সে সবই অবস্থার কথা, তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে হয়, এটা কিছু নয় মনে হয়; 'দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে, সমাধিতে দেহ ছেড়ে দেয়, যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—নয়টা সরায় জল আছে, তাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে

এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটা সূর্য্য ও একটা সরা রইলো, পরে সেটাও ভেঙ্গে দিলে যা তাই রইলো।"

ললিত—"মহারাজ, ধ্যানের সময় যদি তাঁকে সর্ব্বব্যাপী ভাবা যায় সেটাও তো ধ্যান ?"

তাহাতে মহারাজ বলিলেন, "ওটা করতেই হয়, তবে একটু পরে। সেই ইষ্টকে সকলের মধ্যে—জলে, স্থলে, পাতায়, আকাশে, নক্ষত্রে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, সর্ব্বত্র ভাবতে হয়।"

"এসব তত্ত্ব জানতে হলে গুরুসেবাদি দরকার—শাস্ত্রে বলে।"

"হাঁ, এটা প্রথম অবস্থায় বটে, তার পর মনই গুরু হয়, এই গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি করতে নেই ; ভাবতে হয়—তাঁর দেহটা যেন মন্দির, তাঁর ভিতরে তিনি রয়েছেন। এই ভাবে তাঁকে সেবা করতে করতে তাঁতে প্রেম ভক্তি হয়, ঐ ভাবটাই আবার ভগবানের দিকে দেওয়া যায়। গুরুমূর্ত্তি সহস্রারে ধ্যান কোরে তার পরে সেখানে ইষ্টের মধ্যে গুরুকে লয় করতে হয়। ঠাকুর বেশ বল্‌তেন, 'গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন—এই তোর ইষ্ট, তার পর তিনিও তাইতে লয় হয়ে যান।' বাস্তবিক গুরু, ইষ্ট ছাড়া নন্। কত তত্ত্ব আছে ললিত, মুখে আর তোমায় কি বল্‌বো। লেগে পড়। ভজন করতে করতে চিত্ত-শুদ্ধ হয়, তখন কত কি যে সব বোঝা যায় তার কি অন্ত আছে ? তাই নিয়েই তখন বিভোর হয়ে থাকে। ভজন করলেই হৃদয়াদি ধ্যানের স্থানও বোঝা যায়।"

"আচ্ছা মহারাজ, বোধ হয় সেই আনন্দের একটু আভাস পেলে লোকে এগিয়ে যেতে পারে।"

"আনন্দ কি বল্‌ছো ? সেখানে আনন্দ নিরানন্দ কিছু নেই, সুখ দুঃখ কিছু নেই, ভাব অভাব কিছু নেই। আনন্দ তো সাধন-অবস্থার কথা। নৌকাখানা যতক্ষণ destination ( লক্ষ্য ) এ পৌঁছায় নি, ততক্ষণই অনুকূল বাতাস, তার পর পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মত help ( সাহায্য ) করে, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয় হয়, শাস্ত্র ঐ পর্য্যন্ত শুধু বলেছে ; কিন্তু কি

জ্ঞান, তার পরে যা আছে তা আর বল্‌তে পারে না। সাধন করলে সে সব বোঝা যায়। সেই ভূমা বস্তু—যেখানে কোনও অভাব নেই, কোন ভয় নেই, শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়, কি মজার জিনিষ! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এক দেখেন।”

“নিত্যে পৌঁছে তাব পর তো লীলা?”

“তার কিছু মানে নেই, দুই বটে। বাসলীলা যখন হচ্ছিল তখন এক সখি আব একজনকে বল্‌ছিলেন, ‘সখি, বেদান্তসিদ্ধান্ত নৃত্যতি।’ বেদান্তসিদ্ধান্ত কি-না সেই পবব্রহ্ম, অর্থাৎ কৃষ্ণ। এখানে নিত্য লীলা এক। আর একটা আছে, নিত্য লীলা দুএর পার।”

## ৫।২।২১—কাশীধাম

ললিত প্রশ্ন করিল, “মহারাজ, কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি কি করে জাগে?”

মহারাজ—“ধ্যান জপ ইত্যাদির দ্বারাই জাগে। আর কেউ কেউ বলেন, উহার বিশেষ ধ্যানাদি আছে, তদ্দ্বারাও জাগে। আমার কিন্তু বিশ্বাস—জপ ধ্যানেব দ্বারাই জাগে। কলিতে জপই প্রশস্ত, জপের মত সহজ সাধন আর কিছু নেই; জপেব সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করতে হয়।”

“ধ্যান কি মহারাজ, মূর্ত্তি চিন্তা তো?”

“মূর্ত্তির চিন্তা, আবার নির্গুণ চিন্তা—দুই-ই।”

“আচ্ছা মহারাজ, কে মূর্ত্তি চিন্তার অধিকারী, আর কে নির্গুণ চিন্তার অধিকারী, গুরুই তো সে সব ঠিক করে দেন?”

“হাঁ, মনই গুরু। মনেই কখন মূর্ত্তি চিন্তা করতে ভাল লাগে, কখন বা নির্গুণ চিন্তা ভাল লাগে। বাইরের গুরু তো সব সময় মেলে না, সাধন ভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে পারে, মনই সব দেখিয়ে দেবে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—মনের নানা দিকে স্রোত, নানা দিক্ দিয়ে সব শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে; কতক দেহে, কতক ইন্দ্রিয়ে, কতক বিষয়ে মনটা বাঁধা আছে। মনের সব বাঁধন কেটে ফেল, সমস্তটা গুটিয়ে সেই দিকে লাগিয়ে দাও—এই তো সাধন। সমস্ত মনটাকে concentrate (একাগ্র) করে সেদিকে লাগিয়ে

দিতে হবে, যতদিন অভিলষিত বস্তু লাভ না হচ্ছে। খুব খাটো, লেগে পড়, এই তো বয়স, বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না। লাগো দেখি একবার জোর করে, দেখবে—মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগো, লাগো, জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়, সবই সমান। একটা ধরে ডুবে যাও, আর প্রশ্ন নয়, কিছু করে এসে—বলো।"

তার পর শ্রীশ্রীমহারাজ হৃষীকে বলিলেন, "পঞ্চ দেবতার পাঁচটা স্তোত্র রোজ পাঠ করবে, ওটা সাধনের মত হবে।"

জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, গুরুকৃপা হলে তো কুণ্ডলিনী জাগেন?"

মহারাজ বলিলেন, "গুরু কৃপা হলে কুণ্ডলিনী জাগা কি বল্‌ছো, সব হয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত হয়। কৃপা কি অমনি হয়? অনেক খাটতে হয়, তবে হয়। মনকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করো—'কি করলে?' মন জবাব দেবে—'কিছুই করিনি।' কিছু কর, কিছু কর। লেগে পড়, আর কোন দিকে দৃষ্টি নয় কেবল সেই জিনিষ নিয়ে পড়ে থাক—ডুবে যাও। প্রথমে একটা routine-work (ধারাবাহিক কর্ম্মপদ্ধতি) করা দরকার, কিছু দিন routine টা follow (পদ্ধতি অনুসারে কাজ) কর দেখি। জপ ধ্যানটা routine-work এর মত করা উচিত।"

---

# যিশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ইংরাজীতে একটি কথা আছে,—"We live more in great men than in ourselves." মহাপুরুষদের জীবনই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি। যুগযুগান্তর ধরিয়া কোনও জাতি যে আদর্শ লাভের চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছে তাহারই পূর্ণ বিকাশরূপে সেই জাতির চিন্তাধারার বিগ্রহস্বরূপ যুগনায়ক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এমনই একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, বিগত দুই সহস্র বর্ষ ধরিয়া জগৎ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়াও তাঁহার ভাবের অন্ত করিতে পারিল না। বস্তুতঃ মহাপুরুষদের জীবন যতই আমরা চিন্তা করি ততই আমরা তাহাতে নূতন তথ্য দেখিতে পাইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই। আমরা ব্যষ্টিমানব যে পূর্ণতা লাভের জন্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সুখদুঃখের মধ্যে চলিয়াছি তাহা তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। যাঁহারা নিজ শক্তিবলে জগতের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের ত কথাই নাই; সিদ্ধ সাধকের জীবন হইতেই মানবের চিরদিন সাহায্য করিবার উপকরণ রহিয়াছে। অতএব চির-পুরাতন হইলেও মহাপুরুষ-জীবন নিত্যনূতন। যে কোনও ভাবে উহার চিন্তা করিলে উহা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুণ্যাবির্ভাব জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে—এই শুভাবসরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যিশুর জীবন-কাহিনীর একত্রালোচনা একের দ্বারা অন্যকে বুঝিবার বিশেষ সহায়ক হইবে মনে করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য থাকিলেও মহাপুরুষদের জীবনীতে চিরদিনই একটা ঐক্য দেখা যায়; শ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিশু নিশ্চিতই সেইরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ

করেন নাই—উভয়ের শিক্ষাদীক্ষার স্থলও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল কিন্তু ঐ বিভিন্নতা তাহাদের সেই ঐক্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাই—উহাদের উভয়েই পার্থিব ভোগসুখ নিতান্ত তুচ্ছ ও ভগবল্লাভের অন্তরায় জ্ঞানে উহার পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নিজকে জগন্মাতার সন্তানজ্ঞানে সর্ব্বদা 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে পাগল হইয়া যাইতেন, যিশুও তেমনি ভগবানকে 'father' 'father' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জগৎ ভুলিয়া যাইতেন; সাধনার প্রাক্‌কালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব 'টাকা মাটি' 'মাটি টাকা' উভয়ের কোনটির দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হয় না জানিয়া মৃত্তিকা সহ একটি রৌপ্য মুদ্রা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া চিরতরে নিজ মন হইতে কামকাঞ্চন বাসনা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রভু যিশুর জীবনীতেও আমরা দেখিতে পাই John the Baptist হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর যখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক নূতন রহস্য তাঁহার কাছে খুলিয়া গেল, এবং সয়তান আসিয়া তাঁহাকে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইতে লাগিল,—

"All the kingdoms of the world, and the glory of them I shall give unto thee, if thou wilt worship me."
তখন তিনি ভগবদ্বিশ্বাসে অবিচল অটল হইয়া উত্তর দিলেন,—

"Get thee hence Satan for it is written, thou shalt worship the Lord only."

বস্তুতঃ এই সয়তান মন-সয়তান ব্যতীত আর কেহই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনের ঘটনাবলী নূতন এবং ধারাবাহিক ভাবে সম্বদ্ধ, পরন্তু যিশুর জীবনের ঘটনা সমূহ অতি পুরাতন ও পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ নহে বলিয়া উভয়ের জীবনের ঘটনাপরম্পরার সামঞ্জস্য প্রদর্শন একরূপ অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনে দেখা যাইত তিনি সহজাবস্থায় নিজকে জগন্মাতার সন্তান বা দাসভাবে দেখিয়া মাতৃচিন্তায় তন্ময় থাকিতেন, আবার কখনও মাকে পূর্ণ, নিজকে তাঁহার অংশ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে

মাতাপুত্রের একত্বের পথে অগ্রসর হইতেন, আবার কখনও বা মায়ের সহিত নিজের একত্বের ভাব তাঁহার অন্তরে এতই দৃঢ় হইত যে, মা বলিয়া আর স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিয়া তিনি নিজেই মা হইয়া যাইতেন ; তদ্রূপ যিশুর জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়—যিশু সহজাবস্থায় নিজকে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার তনয় এবং সর্ব্বদা তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু যখন তাঁহার ভাবধারা অনুভূতির উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যাইত তখন তিনি পিতৃসত্তায় নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিতেন, এমন কি কখন কখনও পিতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁহার কাছে আর থাকিত না। সেই অবস্থা হইতে মন নীচে নামিয়া আসিলে বলিতেন—

"I and my Father are one"

সহজ সরল গ্রাম্য সুমধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহ ব্যাখ্যা করিতেন তদ্রূপ যিশুও স্বভাব সুলভ মধুর ভাষায় গল্পের মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও যিশু উভয়েরই আমরা যাহাকে সাধারণভাবে বিদ্যা বলি তাহার সহিত আবাল্য বিরোধ। তাই তাঁহাদের কথায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই উহা সরল গ্রাম্য ভাষায় কথিত, কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেক কথাই বড় মর্ম্মস্পর্শী—ভগবদ্ভাবোদ্দীপক। পণ্ডিতের কাছে কতই বক্তৃতা শুনা যায় কিন্তু তাহাতে প্রাণ শীতল হয় না—কিন্তু ইঁহাদের সহজ সরল কথায় চিরদিন ভক্তহৃদয়ে আশার উদ্রেক হয়। পণ্ডিতদের কথায় আর ইঁহাদের কথায় প্রভেদ যে কি তাহা যিশুর শিষ্য St. Mathew তাঁহার Gospelএ সুন্দরভাবে সরল ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—গুরুভাবোন্মত্ত ঈশা তখন জনসাধারণের মানসিক গতি পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশামৃত বিতরণ পূর্ব্বক জেরুজালেমময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত ভগবদ্বাক্য শ্রবণে তদনুসরণকারী বিপুল জনসংঘ প্রাণে প্রবল উদ্দীপনা অনুভব করিতেছে —এই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়া যিশুর সুযোগ্য শিষ্য লিখিয়াছেন—

"For he taught them as one having authority and not as the scribes." "চাপরাস না পাইলে হয় না"—"মা রাস ঠেলে দেন" ইত্যাদি কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ

"New Testament" ও "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ করিলে অনেক স্থলে একই ব্যক্তির কথা একই ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। সেই সহজ সরল উপমা, গল্পের মধ্য দিয়া ধর্মতত্ত্ব বিবৃতি, পার্থিব ভোগসুখ ত্যাগ করিবার ভাব মানবের মনে দৃঢ় করিয়া দিবার চেষ্টা, উভয়ত্রই সুপরিস্ফুট। ভগবদ্বিশ্বাসের উপমাস্বরূপ "রামনামের জোরে মহাবীর হনুমানের সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া"--"বিশ্বাসের মত বস্তু আর নাই" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইত্যাদি কথা উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে ; যিশুও নিজ শিষ্যগণকে বলিয়াছেন,—

"Verily I say unto you, doubt not, if ye have faith ye shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast unto the sea and it shall be done."

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, "বালকের ন্যায় সরলতা না থাকিলে ভগবান লাভ হয় না,--ব্যাকুলতা থাকিলে সব হইয়া যায়—আর কিছু যদি না পার মায়ের উপর একান্ত নির্ভর কর—সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই ;" আমরা প্রভু যিশুর বাণীতেও ঐ সকল ভাবের একত্ব দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God. Ask and it shall be given you ; seek and ye shall find ; knock and it shall be opened unto you.

"Take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body than the raiment?

"Behold the fowls of the air for they sow not neither do they reap nor gather into barns yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not better than they?

"Take no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself."

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও যিশুখৃষ্টের কথায় এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিশুর ব্যাখ্যাত ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধীয় সকল কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইলেও তাঁহার কথায় উচ্চতর দার্শনিক তত্ত্ব, জ্ঞান ও কর্ম্মের কথা কিছুই নাই পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথায় এই সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ সরল ভাষায় বিবৃত। যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পর প্রাচ্যদেশে বিবিধ মতবাদের প্রচারকরূপে বিবিধ যুগনায়কের অভ্যুদয় এবং প্রতীচ্য দেশে নানা দার্শনিকমতের উৎপত্তি হইয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে ধর্ম্ম-জগতের প্রকৃত রহস্য জটিল করিয়া রাখিয়াছিল, উহার ফলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মধ্যে সর্ব্বভাবের সর্ব্বদর্শনের সমন্বয় দেখিতে পাই,—শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পূর্ব্বোক্ত কারণেই উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের অধিগম্য করিয়াছেন। অপর দিকে যিশুর আবির্ভাবের সময় ঐ সকলের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না তাই আমরা তাঁহার উপদেশে এই সকল উচ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখিতে পাই না, কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাস ও প্রীতি যে মানবের একমাত্র শান্তির পন্থা এই তথ্য প্রচারে উভয়েরই ভাষা একরূপ।

যিশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ঐক্য উভয়ের অপূর্ব্ব মানব-প্রেমে। মানবের হিতের জন্য, পতিত মানবকে কোল দিবার জন্য তাঁহারা নিজের শরীর মনপ্রাণ সবই বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উঁহাদের মুখ হইতে মানবের প্রতি আশীর্ব্বাণীই বর্ষিত হইয়াছে, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া ইঁহারা পরের পাপ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, যিশু পতিত মানবকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক আশার বাণী শুনাইয়াছেন,—"Come to me all ye that labour and are heavily laden, and I will give you rest." আচার-পরায়ণ ( formalist ) ইহুদীগণ যিশুর শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"Why eateth your master with Publicans and

sinners"—তাহা শুনিয়া যিশু বলিয়াছিলেন—"They that are whole need no Physician but they that are sick. I have not come to call the righteous but the sinners to repentance" আরও দেখা যায় Sabath dayতে (উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে) এক রুগ্ন ব্যক্তি রোগাপসারণ প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিল, "Is it lawful to heal on Sabath days." তখন যিশু বলিয়াছিলেন,—

"What man shall there be amongst you, that shall have one sheep and if it fall on a pit on the Sabath days; will he not lay hold on it and lift it out." শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতেও দেখা যায় তিনিও যিশুর ন্যায় পাপী-তাপীকে কোলে নিয়া অভয় দিতেছেন। ইঁহাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণই যেন পাপী-তাপীকে আশ্রয় প্রদান, লোকহিতায় জীবনদান। Last Supper এর গল্পটি পড়িলে মনে হয় যিশু যেন নিজের শরীর পর্য্যন্ত মানব-কল্যাণের জন্য দান করিয়া তাহাই রূপকচ্ছলে বলিতেছেন। St. Mathewর Gospel হইতে আমরা সেই করুণাপূর্ণ কাহিনীটি উদ্ধৃত করিলাম—

"And as they were eating; Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, 'Take, eat, this is my body.'

"And he took the cup and gave thanks and gave it to them saying, "Drink ye all of it; for this is my blood of the New Testament which is shed for many; for the remission of sins."

পাপী তাপীর পাপ গ্রহণের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বিষম রোগে ভুগিতেছিলেন তখন তাঁহাকে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেহ-ধারণে যখন এত কষ্ট তবে কেন বার বার আসা?" তিনি তখন স্বভাব-সুলভ মিষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, "নেমন্তন্ন খেতে খেতে কড়ায়ের ডাল ভাল লাগে না"—অর্থাৎ বারম্বার দেহধারণ পূর্ব্বক পরার্থে দুঃখ কষ্ট সহিতে সহিতে আর নিজের দুঃখের কথা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না। অপূর্ব্ব

প্রেমেব আধার এই সকল মহাপুরুষ-জীবনের মহিমা স্থূলবুদ্ধি মানব আমরা একটুকুও বুঝিতে পারি না ; তাঁহারা ত নিজেরাই তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "He that hath ears, let him hear. He that hath eyes, let him see." "বাউলের দল এলো গেল নাচ্‌লে গাইলে কেউ চিনলে না।" তাঁহারা মানবের নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইতেন তাহা হীনবুদ্ধির পরিচায়ক কিন্তু ইঁহাদের হৃদয় এতই প্রেমপূর্ণ যে তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন ; আমাদের দ্বারা পীড়িত হইযাও আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। দুরাত্মা ইহুদীগণ যখন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কবিতেছে তখন তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য স্বর্গীয় পিতাব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"Father forgive them for they know not what they do."

আবার শ্রীবামকৃষ্ণদেবকে অতি নগণ্য কালীপূজক হীন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া পদাঘাত কবিয়াছে তাহাকে তিনি ক্ষমাই কবিয়াছেন।

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীবামকৃষ্ণদেব ও যিশুখৃষ্টেব মধ্যে দুইটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ যিশুখৃষ্ট সব্বদাই ঐশ্বরীয় বিভূতি প্রদর্শন করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেবারেই ঐশ্বর্য্য বিহীন ছিলেন ; দ্বিতীয়তঃ যিশুর শিক্ষায় পাপীদেব প্রতি নানারূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাপীদের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করেন নাই ববং বলিয়াছেন, "যে শালা নিজেকে পাপী পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়, যে ভাবে আমি মুক্ত সে মুক্তই হয়।" কিন্তু এইরূপ বহিঃপার্থক্য থাকিলেও উভয়ের ভিতরেব দিকটা একই রকম। আমরা এখানে এই বিষয়ে দুই একটি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম—

যিশুর সময়ে তদ্দেশবাসীব অবস্থা এতই অধঃপতিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ব সমূহ ধারণা করিতে তাহারা একেবাবেই অক্ষম ছিল তাই তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিবার জন্যই ঐরূপ করিতেন। আমরা ত পদে পদে দেখিতে পাই তিনি রোগাপনয়ন করিতেছেন আর বলিতেছেন—"Thank the Lord, according to your faith ;

be it unto you." আর একস্থলে আছে—শিষ্যেরা আগত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিতে না পারিয়া তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেছেন—"If ye have faith in the Lord, ye would let this and this would be." কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অলৌকিক বিভূতিই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবে এই সকল বিভূতির প্রকাশ মোটেই নাই।

যিশু পাপীদের জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যিশু পাপের ভয় দেখাইয়া মানুষের ধর্ম্মের রুচি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোথাও পাপীকে ঘৃণা করিতে বলেন নাই,—বরং বলিয়াছেন—"Sinners should not be hated"; কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, "Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect"; প্রত্যেক মানবকে বলিয়াছেন, "Kingdom of heaven is within you." ইহা হইতেই বুঝা যায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে পূর্ণ ব্রহ্মশক্তি সুপ্ত বা জাগ্রত ভাবে রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মানবই আপাতদৃষ্টিতে মহাপাপী, দস্যু তস্কর হউক যদি সে ইচ্ছা করে তবে তাহার অন্তরের মোহ মলিনতা দূরে অপসারণ পূর্ব্বক বলিতে পারিবে, "আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতা একই"—ইহা তাঁহার প্রচারিত মতবাদের অঙ্গস্বরূপ ছিল। একদা জনৈক ইহুদী (Saducee) আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মানবের প্রতি ভগবানের প্রথম উপদেশ (first commandment) কি? তিনি তখন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন,—

"And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength, this is the first commandment.

"And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these."

তিনি ত আরও বলিয়াছেন,—

"Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbour and hate thine enemy.

"But I say unto you love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you."

যাঁহার মুখ হইতে এইরূপ সাম্যের বাণী নির্গত হইয়াছে তিনি কি কখনও পাপী তাপীকে ঘৃণা করিতে বা অপরকে ঘৃণা করিতে বলিতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় যিশুখৃষ্টকেও দেখিতে পাই মানবের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিজের শিষ্যদিগকে পার্থিব সুখভোগের আশা চিরতরে পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতে ধর্ম্মভাব বিতরণের উপদেশ দিতেছেন। গুরুভাবোন্মত্ত ঈশা সমবেত শিষ্যগণকে ধর্ম্মদানের উপদেশ এইরূপ ভাবে করিতেছেন,—

"Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out the devils, freely ye hath received, freely ye give.

"What I tell you in darkness, that speak in light; what ye hear in the ear, that preach ye in the house tops."

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেরূপ নিজ শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে উচ্চাধিকারী মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে বিবাহিত জীবনযাপনের উপদেশ না করিয়া কামকাঞ্চন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, এমন কি সুযোগ্য শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া মিনতির স্বরে বলিতেছেন, "বাবা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না।" আবার তদপেক্ষা নিম্নতর অধিকারী যখন সেইকথা শুনিয়া বলিতেছে, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিলে চলিবে কিরূপে? তখন তিনি তাহাকে বলিতেছেন, "ও আমাদের একটা হয়ে গেল;" তদ্রূপ যিশুকেও দেখিতে পাওয়া যায় আগত Pharisee যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—"Is it iawful for a man to put away his wife, for

every cause" এবং যিশুর প্রদত্ত উত্তর শুনিয়া যখন তাঁহার কৌমার বৈরাগ্যবান্ শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"If the case of man be so with his wife, it is not good for him to marry" তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

"For there are some eunuchs which are born eunuchs from their mother's womb, . . . and there are eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it."

এইরূপে—উপদেশে, কাজে, ব্যবহারে সর্ব্বত্রই এই দুই মহাপুরুষের ঐক্য দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে একই ভাবের প্রচারক বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন শরীরধারী হইলেও মূলতঃ একই ভাবের প্রচারক বলিয়া এ জগতে আবির্ভূত সকল মহাপুরুষকেই একই পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বাহ্যিক ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য থাকিলেও ইঁহারা সকলেই পার্থিব সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া মানবকে ত্যাগের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও মানব কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের তমোরাশি দূরীকরণের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানই যেন ইঁহাদের ভিতর দিয়া যুগে যুগে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন—বস্তুতঃ তাঁহারা যখন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে আপনাদের ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগকে ভগবান বলিলেও আপত্তি করিবার কোনও হেতু নাই; বিশেষতঃ আমাদের ভগবৎ ধারণার পূর্ণতাও তাঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব।

# ভাববার কথা

পত্রে, গল্পে, উড়ো চিঠিতে, কথাবার্ত্তায় ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আপত্তি আমরা যেখানে সেখানে দেখিতে পাই ; কিন্তু কোথায়ও পবিত্র মনের বিশ্লেষণ, যুক্তি বা শাস্ত্র কিছুই দেখান হয় না। কেবল শাস্ত্রের মধ্যে —বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও যুক্তির মধ্যে—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ অসম্ভব। আবার কেহ বা মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা মোক্ষশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু মনু মহারাজ যে মোক্ষশাস্ত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান দিয়াছেন এটা কি তাঁহাদের জানা নাই ? একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সুলভা উপাখ্যানে ধর্ম্মধ্বজ জনক ও সুলভা নামক সন্ন্যাসিনীর যে বিচার হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে শাস্ত্রজ্ঞানহীন বহু সমাজ-নেতার সংশয় মিটিয়া যাইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, "ন প্রজয়া ন ধনেন," "কিং প্রজয়া করিষ্যাম"—পুত্র বা বিত্তের দ্বারা অমৃতকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পুত্রের দ্বারা আমরা কি করিব ? ঋগ্বেদের টিকাকার গার্গীর জীবন ও যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, মহাভারতের তাপসী, যোগবাশিষ্ঠের লীলা, চূড়লা উপাখ্যান আলোচনা করা প্রত্যেক প্রবৃত্তি-মার্গ-সমর্থক হিন্দুর বিশেষ কর্ত্তব্য। ভগবান বলিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। এই বেদ তাৎপর্য্য না মান, মুসলমানের দলে নাম লিখাইয়া আমাদের মানসী প্রতিমা সকল ভাঙ্গিতে থাক—নৈবম্ পাপমবাপ্স্যসি—কোন দোষ হইবে না। তবে হিন্দু হইয়া "ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা সম্যগ্‌জ্ঞানেন তল্লভ্য"—এই মহাবাক্যের প্রতিষেধ করিও না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রবৃত্তি মূলক কথা আছে, তাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে

ধীরে ধীরে নিরোধ করিবার জন্য। ছেলে যখন ঔষধ খাইতে চাহে না মা তখন তাহাকে মিষ্টির মধ্য দিয়া তাহা খাওয়াইয়া থাকেন। এখানে মিষ্টি খাওয়ানটা উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য হইতেছে ঔষধ। সেইরূপ প্রবৃত্তি মূলক বিধিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, প্রবৃত্তির নিষেধেই তাহার তাৎপর্য্য।

কয়েকজন লোককে আমরা জানি তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা মোক্ষশাস্ত্রের অসারতা দেখান, কিন্তু কার্য্যকালে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রে পদাঘাত করেন—কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রও অবাধ ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনা সমর্থন করে না। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—সংযমই উন্নতির হেতু। মানুষও পশু কিন্তু পশুজগতে যে মানুষ এত বড় হইয়াছে তাহা সংযমকে অবলম্বন করিয়াই। যে কোনও দেশে, যে কোনও কালে, যে কোনও মানুষ কিছু নূতন আলোক জগতে আনয়ন করিয়াছেন তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া দেখুন তিনি তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ সংযমী। সংযমকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ Super-man হয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণই Super-man বা অতি-মানব। আলেকজেণ্ডার, সিজার বা নিপোলিয়োঁ Super-man নহে—খুব বড় যোদ্ধা। কিন্তু বড় যোদ্ধা হইতে গেলেও সংযমসাপেক্ষ। সকল বীরের পতন দেখা যায় অসংযমতায়।

পড়িয়াছিলাম, ধর্ম্মসভায় না-কি এক বিশিষ্ট হিন্দু-নেতা বলিয়াছিলেন, 'অদ্যাবধি তাঁহার ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন হয় নাই, সেইজন্য তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানেন না।' ভগবান আমাদিগকে এইরূপ নেতাদের হাত হইতে রক্ষা করুন। আবার শুনিলাম, সেদিন আর এক ধর্ম্মসভায় জনৈক মহিলা-নেতা বলিয়াছেন, 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কি হইবে, আগে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার শক্তি অর্জ্জন কর।' আমরা ত জানি ধর্ম্মই সকলের রক্ষক, ধর্ম্মকে এক ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করিতে পারে? যে শক্তি সকলকে রক্ষা করে, যাঁহার অর্চ্চনার দ্বারা জগতের যাবতীয় শক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের উপরই সমাজ। ধর্ম্মই পিতা পুত্রের, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্মের উপাসনা করিলেই পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নচেৎ কেই বা কাহার?

অধিনেত্রী যখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় এত উৎসুক তখন তৎপূর্ব্বে ধর্ম্ম কি তাহা তাঁহার জানা উচিত। তাঁহার নিকট আমার মিনতি তিনি যেন মহাভারত পাঠ করিয়া বীরাগ্রগণ্য, ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মবিদোত্তম ভীষ্মের নিকট হইতে কিছু ধর্ম্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

---

# স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

১৭৮৫ শকের সরস বরষা। মাঠে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, উপবনে মালতী ফুলের মধুগন্ধ, আকাশে বর্ষণপর জলদজালের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন, এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী বরষার এক শুভদিনে বঙ্গ-সংসার আলো করিয়া শশী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। শশী মহারাজের পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

বাল্যকালে শশী মহারাজ এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। ঐ স্কুলের ছাত্রগণের একটি সমিতি ছিল; পূজনীয় শশী মহারাজও ঐ সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। একবার সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময় স্থির হইল যে, উহার সভ্যগণ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে গিয়া আনন্দোৎসব করিবে। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বালকগণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইল। তখন মধ্যাহ্ন কাল। বিস্তৃত উদ্যানে ছুটাছুটি, বৃক্ষারোহন প্রভৃতি বালসুলভ ক্রীড়াদি করিয়া অপরাহ্নে তাহারা পরমহংস দেবের শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিলেন। শশী মহারাজের খুল্লতাত পুত্র

পূজনীয় শরৎ মহারাজও ঐ সময়ে তাহাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিও এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। যাহাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় মহাপুরুষ ব্যকুল কণ্ঠে বাতাস বেদনাময় করিয়া তুলিতেন, তাহাদের অন্যতম এই বালক দুইটিকে পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, আদর আপ্যায়নে, প্রেমে ভালবাসায় তাঁহারাও তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। তখন হইতে পূজনীয় শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, তারক, নিরঞ্জন, যোগেন, সারদা, সুবোধ, হরি, গঙ্গাধর, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি অন্যান্য বালক ভক্তগণও উহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হন। এই সমস্ত বালক ভক্তকে লইয়া শ্রীভগবান দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধাসনে বসিয়া যুগচক্র নির্ম্মাণে তখন হইতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার অমানব ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরীয় ভাবসমূহ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারণ পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের ঘাতসহ করিয়া তাঁহাদিগকে বজ্র-উপাদানে তিনি গঠন করিতে ছিলেন। যাঁহার যেমন ভাব—তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষাদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহার সর্ব্বভাবসমন্বয়ের অঙ্গরূপে এক একটি জীবনকে নিখুঁত ভাবে গড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য ভাবের সহিত কাহাকেও জ্ঞান, কাহাকেও বৈরাগ্য, কাহাকেও প্রেম, কাহাকেও স্থৈর্য্য, কাহাকেও মাধুর্য্য এইরূপ দৈবী সম্পত্তি তিনি সকল সন্তানের মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বিতরণ করিতেছিলেন। আমাদের মনে হয়, পূজনীয় শশী মহারাজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন শ্রীগুরুর অতুলনীয় পরাভক্তি। কারণ এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে ঐ ভাবের যে অঙ্কুর উদ্গত হইতে দেখা গিয়াছিল, উত্তর জীবনে তাহা ফুলফলে বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব যখন গলরোগে পীড়িত তখন শশী মহারাজ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এই সেবার ভাব জীবনে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। শ্রীভগবান স্থূল শরীর ত্যাগ

করিলে তাঁহার অস্থিসম্পুট কৌটা বরাহনগরের নব প্রতিষ্ঠিত মঠে স্থাপনা করিয়া পূর্ব্বের মতই নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। শুধু শ্রীভগবানের সেবা নয়, তাঁহার সন্তানগণের সেবাও ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সাধনা। স্বামিজী বলিতেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ভ, সে না থাকলে মঠ চলা অসম্ভব হোত। ভিক্ষে শিক্ষে করে ঠাকুরের ভোগরাগ ও সকলের খাওয়া দাওয়া যোগাড় করা থেকে, রাঁধাবাড়া, সকলকে খাওয়ান পর্য্যন্ত সব কাজ তাকে দেখতে হোত। আমরা ভোর তিনটার সময় উঠতুম, তারপর কেউ স্নান করতে, কেউ বা অমনিই ঠাকুর ঘরে গিয়ে জপ ধ্যানে বসে যেতো; এমন অনেক দিন গিয়েছে যে ভোর চারটে পাঁচটার সময় থেকে সন্ধ্যে চার পাঁচটা পর্য্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে বসে থাক্‌তো, তখন আমাদের জপধ্যানে এত মন গিয়েছে যে বিশ্ব থাক্ বা না-থাক্ কিছুই গ্রাহ্য নেই।" বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ তখন ঈশ্বর লাভের জন্য উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন; "কেহ কেহ কয়েক প্রহর নিস্পন্দভাবে বসিয়া ভগবৎধ্যান করিতেছেন, কেহ বা অধ্যাত্ম সংগীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্তরে চিদানন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তাঁহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। সে সময়ে তাঁহাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্যুই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্মশানে রাত্রি যাপন করিতে ও চিতানলের শত শত লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে কেমন করিয়া এ নশ্বর মানবদেহের শেষ চিহ্ন চিরদিনের মত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয় তাহা দেখিতে দেখিতে মৃত্যু চিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। আবার কেহ বা সত্যলাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রতি রজনী একটি প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।" শশী মহারাজের কোমল প্রাণ তাঁহাদের এই কঠোরতায় বড়ই ব্যথিত হইত। ব্যথিত হইত ইহার জন্য যে, এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তাঁহার

গুরুভাইগণের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই তিনি তাঁহাদের কাহাকেও ধরিয়া স্নান করাইতেন, কাহাকেও বা জোর করিয়া খাওয়াইতেন, আশ্রমের কাজ নিজেই বেশীর ভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সাধন ভজন করিবার অবসর দিতেন।

পূজনীয় শশী মহারাজ যে ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্থূল শরীরে অবস্থান কালে যেরূপ একনিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর-ত্যাগের পরও ঠিক সেইরূপ অস্তিত্ব বোধে তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে এই বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা) কোন সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন, "একদিন শশী মহারাজ ঠাকুরের দাঁতন কাঠি থেঁতো করে দিতে আমায় বলেন। থেঁতো করে দিলে তিনি দেখে বল্‌লেন, 'খুব নরম হওয়া চাই, তা না হলে ঠাকুরের মাড়িতে লাগবে।' * * * শশী মহারাজ একবার আমায় ঠাকুরের পান সাজবার ভার দিয়েছিলেন। একদিন পানে চূণ বেশী হওয়ায় তিনি আর আমাকে পান সাজতে দিতেন না। দু তিন মাস অন্য সকলের পান সেজে অভ্যস্ত হলে পর তবে আবার আমায় ঠাকুরের পান সাজতে দেন। * * * একবার খুব মজা হয়েছিল, সকালে ঠাকুরের বাল্যভোগের জন্য হালুয়া তৈরী করতে গিয়ে শশী মহারাজ দেখেন, কড়া অপরিষ্কার, রাত্তিরে লাটু মহারাজ ছোলা সিদ্ধ করে খেয়েছিলেন তা আর পরিষ্কার করা হয় নি। কড়া মেজে হালুয়া তৈরী করে ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতে দেরী হয়ে যাবে, এইজন্য তিনি সেদিন লাটু মহারাজকে যা তা বলে গালাগালি করতে লাগলেন। কারণ, ঠাকুরের সেবার কোনরূপ সামান্য ত্রুটী হলেই তিনি একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়তেন। গালাগালি খেয়ে লাটু মহারাজ বল্‌লেন, 'হামি মাকে পত্র দিব ; তোমার বাবা মা আউর হামার বাবা মা কি আলাদা আছে'?" মাদ্রাজে থাকিবার সময় শশী মহারাজ কখন কখন ঠাকুরের জন্য ষ্টোভে খাবার তৈরী করিতেন। ঠাকুরের সম্মুখে থালা রাখিয়া ষ্টোভে একখানি করিয়া লুচি ভাজিতেন এবং গরম

গরম সেই লুচিখানি আনিয়া ঠাকুরের পাতে দিতেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন দিবার পর খুব গরম বোধ হইলে শশী মহারাজ পুনরায় ঠাকুরঘর খুলিয়া সারা রাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেন। ঠাকুরকে এইরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত দেখিয়া তিনি আজীবন মন প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বরাহনগর মঠে আসিবার পূর্ব্বে যুবক সন্ন্যাসিগণ অভাব কি বস্তু তাহা জানিতেন না। মঠে যোগদান করিয়াই তাঁহারা ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িলেন। সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, অভাবে উদার মানবমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সহোদর সহোদরা, পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও অভাবের তাড়নায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু দীর্ঘকাল অভাবের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের সপ্রেম সম্বন্ধ ঈষন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং রবির খরতাপে কমলদল যেরূপ বিকশিত হয়, এই দুঃখের সংস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়গণেরও প্রেমসরোজ তদ্রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি; মঠে তখন সামান্য কিছু ভাল জিনিষ আসিলে, তাহা খাওয়াইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইত। কেহ খাইবে না অথচ সকলেই বলে 'তুমি খাও'। শেষে সকলে মিলিয়া কোন একজনকে ধরিয়া জোর করিয়া তাঁহার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিতেন। বিস্তারই প্রেমের স্বভাব—তাই দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই ভ্রাতৃপ্রেম সংঘের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সকল দেশের সকল জাতির নিতান্ত হীনজনকেও একান্ত আপনার বোধে আজ স্পর্শ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অদ্ভুত ছিল—শশী মহারাজের নিষ্ঠা। প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ বরাহনগর-মঠে তখন কেহ বড় একটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া একে একে সকলেই পাহাড় পর্ব্বত ও তীর্থাদিতে সাধন ভজন করিতে যাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—শশী মহারাজ প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন নাই। আবার অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সেবা-পূজাকে তিনি

প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিসম্পুট যে 'আত্মারামের কৌটা'কে একদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মাদ্রাজ গমন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শশী মহারাজকে মাদ্রাজ পাঠাইবার উদ্দেশ্য—দাক্ষিণাত্য-বাসীরা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির, ধর্ম্মজীবনে যে যতই উন্নত হোক না কেন, আচার নিষ্ঠার সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই তাহার উপর উহাদের সমস্ত ভক্তি একেবারে 'চটিয়া' যায়। তাই স্বামিজী মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময় জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন—

"I shall send you one who is more orthodox than your most orthodox men of the South and who is at the same time unique and unsurpassed in his worship and meditation of God."

'আমি তোমাদের এখানে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাইব যিনি এ দেশের সব চাইতে গোঁড়া হইতেও অধিকতর গোঁড়া। শুধু গোঁড়াই নহেন আবার ধ্যান জপ ও পূজা অর্চ্চনায় যাঁহার সমকক্ষ লোক দৃষ্ট হয় না।'

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে আসিলেন কিন্তু এখানে প্রচার কার্য্য তাঁহার বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। স্বামী বিবেকানন্দ অগ্নিময় বক্তৃতা-শক্তিতে মাদ্রাজে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া গেলেন, কিন্তু হুজুগ আর কয়দিন স্থায়ী হয়! ধীরে ধীরে উহা স্তিমিত হইতে লাগিল। তাহার উপর ক্রিশ্চিয়ান মিশনরীগণ এখানে বহুদিন হইতে প্রবলভাবে খৃষ্ট-মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের অসত্যতা, মূর্ত্তিপূজার অকিঞ্চিৎ-করতা প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধার ভাব চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে ছিল। শুধু পাদ্রীগণকে দোষী করিলে সত্যের অপলাপ হয়। হিন্দু-পারিয়াগণের উপর মাদ্রাজবাসী উচ্চবর্ণের অনুদার এবং নিষ্ঠুরাচরণও তাঁহাদের স্বদেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। উচ্চবর্ণেরা ইংরাজীশিক্ষা ও পাদ্রীপ্রচারিত ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাহীন, পারিয়া-গণও উচ্চবর্ণের বহু শতাব্দব্যাপী কঠোর অত্যাচারে তাঁহাদের উপর

সম্পূর্ণ বীতরাগ—এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্ব্বমতসামঞ্জস্য ভাব এবং শ্রীবিবেকানন্দের সার্ব্বভৌম বেদান্ত, নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন প্রভৃতি মহদুদার মতবাদ প্রচার করা কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য তাঁহাকে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হইত তাহা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী মাদ্রাজবাসীর লেখনী হইতে উদ্ধৃত হইল—

"His classes were scattered in the different parts of the city and to many of these he used to go on foot for a long time. On certain days of the week he had to lecture more than twice or thrice and would return to the Math quite tired, unfit to cook his food even. I have known days when a loaf of bread purchased from bakaries was his simple meal for the night, that was because there was little energy left in him for cooking or there were no food-stuffs in the Math."

'সহরের বিভিন্ন স্থানে তিনি ক্লাস করিতেন, অনেকগুলি ক্লাসে তাঁহাকে বহুদিন হাঁটিয়া যাইতে হইত। কোন কোন সময় তিনি প্রত্যহ দুই তিনটি বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা করিয়া এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া মঠে ফিরিতেন যে, তখন আর রান্না করিবার সামর্থ্য থাকিত না। আমি জানি, এমন দিনও গিয়াছে যে এক টুকরা পাঁউরুটি খাইয়া তিনি রাত্রির আহার শেষ করিতেন। পরিশ্রান্ত হইয়াই যে তিনি রান্না করিতেন না এমন নহে, অনেক সময় মঠে খাইবার মত কিছু থাকিতও না।'

পূজনীয় শশী মহারাজ যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর তাঁহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। একদিন তিনি দেখেন, শশী মহারাজ খুব প্ররিশ্রম করিয়া আসিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া মাদুরে শুইয়া পড়িলেন। দুই এক মিনিট পরেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামিজীকে যেন সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে

লিলেন, "দেখ্ দেখিনি কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে খেটে প্রাণটা গেল, তোর জন্যই তো মাদ্রাজে এসেছি, আর পারি না"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠিক যেন তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাই আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এসব কথা বলে ফেলেছি, মাপ করো। তুমি যা বলবে ভাই, আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

( ক্রমশঃ )　　—চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

---

# জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকের বেদাধিকারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?

উত্তর—কারণ ঋগ্বেদে বহু স্ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা আছেন। যথা—(১) লোপমুদ্রা ১ম মণ্ডল, ১৭৯ সূক্ত; (২) বিশ্ববারা ৫ মণ্ডল ২৮ সূক্ত, (৩) শাশ্বতী, ৮ মণ্ডল—১ সূ ৩৪ ঋ; (৪) অপালা, ৮ম—৯১ সূ; (৫) ঘোষা ১০ম—৩৯, ৪০ সূ, (৬) রাত্রি, ১০ম—১২৭ সূ; (৭) জুহু, ১০ম—১০৯ সূ; (৮) সূর্য্যা, ১০ম—৮৫ সূ; (৯) যমী, ১০ম—১৫৪ সূ; (১০) শচী, ১০ম—১৫৯ সূ, (১১) উর্ব্বশী, ১০ম—৯৫ সূ; (১২) সরমা, ১০ম—১০৮ সূ; (১৩) বাক্, ১০ম—১২৫ সূ।

এই ত গেল বেদ সংহিতার কথা। স্মৃতি সংহিতা হইতে বলিতেছি—

(১) মহর্ষি হারীত বলিতেছেন—"দ্বিবিধা হি স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমৌঞ্জীবন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা।" স্ত্রী দুই শ্রেণীর, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী-

দিগের জন্য মৌঞ্জীবন্ধন, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যার ব্যবস্থা এবং সদ্যবধূর নিমিত্ত বিবাহ সংস্কার।

( ২ ) মহর্ষি যম বলিতেছেন—

"পুরা কল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎপরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে।
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ ॥

পুরাকল্পে কুমারীদিগের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদাধ্যয়ন এবং সাবিত্রী-পাঠের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা পিতা পিতৃব্য এবং ভ্রাতার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা নিজগৃহেই ভিক্ষা লাভ করিতেন, কিন্তু জটাবল্কল ও অজিন নিষিদ্ধ ছিল।

এ সম্বন্ধে উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ী, মহাভারতের সুলভা ও তাপসী এবং যোগবাশিষ্ঠের লীলা ও চূড়ালা সমধিক প্রমাণ।

---

# জন্মান্তর ও পতঞ্জলি

পুত্রাত্মবাদী ও দেহাত্মবাদীরা বলিয়া থাকেন জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান জন্মই প্রথম ও শেষ। কেন না, জন্মান্তর বলিয়া যদি কিছু থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু না কিছু মনে থাকিত। বলিতে পার এ জন্মেরও ত সব ঘটনা স্মরণ থাকে না?—তথাপি অতি শিশুকালেরও বিশেষ বিশেষ ঘটনা বেশ স্মরণ থাকে। সেই পূর্ব্বজন্মের সামান্য ঘটনা মনে না থাকিলেও অন্ততঃ যে বিষয় লইয়া যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছে তাহার কিছু মনে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। কাজে কাজেই বলিতে হয় জন্মান্তর শব্দটি কল্পনামাত্র। এই ত গেল অনুভবের কথা, তাহার পর দেখ উহা যুক্তিতেও টিঁকে না। আমরা দেখিতে পাই এই জন্মে একটি শিশুর জ্ঞান ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া বৃদ্ধকালে তাহার যতদূর সম্ভব চরম পরিণতি হয়—কিন্তু যদি জন্মান্তরের জ্ঞান স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানের পর হইতে আরম্ভ দেখা যাইত শৈশব অবস্থা বলিয়া আর কিছুই থাকিত না।

আবার দেখ জন্মান্তরবাদীরা বলেন জন্মান্তর কর্ম্মফলে হইয়া থাকে। কর্ম্মফল মানিলে ঈশ্বরবাদ মানা চলে না। ঈশ্বর যে সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ইহা মিথ্যা হইয়া যায়। এবং প্রথমতঃ পাপকর্ম্মরত ব্যক্তি বলিবে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যোন্মুখ হওয়ায় তাহার পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেছে, অতএব তাহার কোন হাত নাই। দ্বিতীয়তঃ সকলেই যখন স্ব স্ব কর্ম্মবশে দুঃখ কষ্ট পাইতেছে, তখন দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ কর্ম্মের বৈচিত্র্য হেতু উচ্চ নীচ গতি চিরকালই থাকিবে অতএব মুক্তি কখনও কাহারও হইবে না। চতুর্থতঃ যে একবার উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছে সে বরাবরই উচ্চগতি লাভ করিবে ( Evolution in a straight line ) তাহার নিম্নগতি ( Devolution )

কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? পঞ্চমতঃ কোনও ব্যক্তি এই জীবনে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে, ঐ সুখ দুঃখ পূর্ব্বজন্মের কোন্ কারণ হইতে ঘটিতেছে, তাহা সে জানিতে না পারায় উহা অন্যায়েরই স্বরূপ হইতেছে।

জন্মান্তরীয় সংস্কার অস্বীকার করিলে ইহ জন্মের উত্তমাধম অবস্থা, সুখ দুঃখের উৎকর্ষ অপকর্ষ, কর্ম্মফলের বিচিত্রতা প্রভৃতি বৈষম্যের সমাধান হইবে কি করিয়া?

কেন, বংশ পরম্পরাগত গুণ ও পারিপার্শ্বিক সংসর্গ (Environment) জনিত পুত্রাত্মবাদ (Theory of the Law of Heridity and Environment ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করিবে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বিষয়ও দৃষ্টি গোচর হইতে পারে। আর তাহা যদি না মান তাহা হইলে ব্যাপ্তিমূলক অনুমান মানিতেই হইবে। কেবল প্রত্যক্ষের উপর লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয় না এমন কি নিজের পিতামাতা সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই হেতু অভ্রান্ত ব্যাপ্তিমূলক জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত পুনর্জন্মবাদ মানিতে হইবে। দেখ জাতমাত্র শিশু স্তন্য পান করে, স্তন্য পান করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, এই অভিষ্টজ্ঞান শিশু কোথা হইতে পাইল। অনুমানের দ্বারা পিতার গুণ পুত্রে জন্মায় যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মবাদও স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু পুত্রে পিতৃগুণ সঞ্চার সম্বন্ধে অনেক দোষ দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু তোমরা আমাদের অনুমানে কোনও দোষ দেখাইতে পারিবে না।

যদি বলি শিশুর ঐ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক?

না, তাহা বলিতে পার না, কারণ যেটি যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম সেটি তাহার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। কিন্তু বালকের সর্ব্বদা স্তন্যপানে প্রবৃত্তি থাকে না। যাহা স্বাভাবিক তাহার অপর কোনও নিমিত্ত নাই। অগ্নির স্বভাবই উষ্ণতা উহার অপর কোনও কারণ নাই। পরন্তু বালকের স্তন্যপানের প্রবৃত্তির হেতু ক্ষুধার তাড়না।

এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্য্য পতঞ্জলি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ॥ পাতঞ্জল দর্শন। ২ পাদ। ৯ সূত্র॥

সূত্রার্থ :—যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত, ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা। (রাজযোগ)

ব্যাস-ভাষ্যের তাৎপর্য্য :—প্রত্যেক প্রাণীর নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে আশীঃ ইচ্ছা বিশেষ আছে। সকলেই মনে করে, 'আমার নাশ যেন না হয়, আমি যেন চিরকালই থাকি।' যাহার মরণের অভিজ্ঞতা নাই তাহার ঐরূপ আশীঃ বা ইচ্ছা কিরূপে হইতে পারে? সে ত প্রত্যক্ষ বা অনুমান বা আপ্ত ইহার কোনটির দ্বারাই পূর্ব্বে ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। পরন্তু এই অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় কৃমিকীটেরও জন্মগত। মূঢ়ের যেরূপ মৃত্যুভয়. অতি বড় কৈবল্য শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতেরও সেই একই ভয়। এই ভয়রূপ সংস্কারের কারণ আমরা বলিব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যা :—এই জীবনের মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর অনেক পরকাল সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেহেতু লোকে ঐহিক জীবন এতদূর ভালবাসে, সুতরাং ভবিষ্যতেও যেন জীবিত থাকি, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অবশ্য, ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোনও মূল্য নাই—তবে ইহার মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্যদেশ সমূহে এই জীবনে মমতা হইতে যে পরলোকের সম্ভাবনীয়তা সূচীত হয়, তাহা তাঁহাদের মতে, কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, কিন্তু অন্যান্য জন্তুর পক্ষে নহে। ভারতে এই জীবনে মমতা, পূর্ব্বসংস্কার ও পূর্ব্বজীবন প্রমাণ কবিবার একটি যুক্তি স্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে আমরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে

পারি না অথবা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুট-শাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবা মাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংস ডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে, তাহাব কুক্কুটী মাতা মনে করিল, শাবকটা বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। যদি প্রত্যক্ষানুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুক্কুট শাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল? অথবা ঐ হংস শাবক-গুলি জল তাহাদের উপযোগী স্থান বলিয়া জানিতে পারিল? যদি তুমি বল, উহা সহজাত জ্ঞান ( Instinct ) মাত্র, তবে তাহাতে কিছুই বুঝাইল না। কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইল মাত্র, কারণ ব্যাখ্যা কিছুই করা হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত জ্ঞান অনেক রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাউক, আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন, আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ, উভয় প্রকার পরদায়, একটির পর অপরটিতে কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যাসের পর, এক্ষণে আপনারা হয় ত কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর অঙ্গুলি আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। উহা এক্ষণে আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে—উহা আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য কার্য্য যাহা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ। অভ্যাসের দ্বারা উহা সহাজাত জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক হইয়া যায়।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এক্ষণে যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক বা সহজাত-জ্ঞান-জনিত বলিয়া থাকি, সেগুলি পূর্ব্বে বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানের ক্রিয়া ছিল, এক্ষণে নিম্ন ভাবাপন্ন হইয়া ঐরূপ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের ভাষায় সহজাত জ্ঞান, বিচারের নিম্ন ভাবাপন্ন ক্রমসঙ্কুচিত

অবস্থা মাত্র। বিচারজনিত জ্ঞান অবনত ভাবাপন্ন হইয়া স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব, আমরা এ জগতে যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা যে কেবলমাত্র বিচারজনিত জ্ঞানের নিম্নাবস্থা মাত্র একথা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। এই বিচার আবার প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষানুভূতির ফল। কুক্কুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংস শাবকগণ জল ভালবাসে, ইহা সবই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষানুভূতির ফলস্বরূপ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, অনুভূতি আত্মার অথবা উহা কেবল শরীরের? হংস এক্ষণে যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পিতৃপুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিয়াছে, না উহা হংসের নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম্ম কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অনুভূতি, শরীরের ভিতর দিয়া উহা আসিতেছে মাত্র। ইহাকেই পুনর্জন্মবাদ বলে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যাহাদিগকে প্রত্যক্ষ বিচারজনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহার সমুদয়ই প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী দিয়াই আসিতে পাবে আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের পূর্ব্ব প্রত্যক্ষানুভূতির ফল স্বরূপ, উহাই এক্ষণে অবনত ভাবাপন্ন হইয়া সহজাত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচার-জনিত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সমুদয় জগতের ভিতরই এই ব্যাপার চলিতেছে।

ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্মবাদের একটি প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বানুভূত অনেক ভয়ের সংস্কার, কালে এই জীবনের মমতারূপে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই আপনাপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ, তাহার মনে কষ্টের পূর্ব্বানুভূতি-জনিত সংস্কার রহিয়াছে। অতিশয় বিদ্বান ব্যক্তির ভিতরে—যাঁহারা জানেন যে, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাঁহারা বলেন, আত্মার মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, তাঁ... মধ্যেও তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্ত্বেও আমরা এই

জীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে পাই। এই জীবনে মমতা কোথা হইতে আসিল? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের সহজ বা স্বাভাবিকের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। এই সংস্কার গুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্ত হইয়া চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। এই সমুদয় পূর্ব্ব মৃত্যুর অনুভূতিগুলি, যাহাদিগকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি—তাহারা যেন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে উপনীত হইয়াছে। উহারা চিত্তেই বাস করে, আর তাহারা যে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা নহে, উহারা ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলি অর্থাৎ সেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি ইত্যাদি।

তাসামনাদিত্বঞ্চ আশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ৪ পাদ, ১০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি। ( রাজযোগ )। অর্থাৎ আমি যেন না-মরি চিরকালই জীবিত থাকি, সকলেরই এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ ( ইচ্ছা ) আছে। না মরিলে মরণ দুঃখের অনুভব হয় না, অতএব উক্ত আশীর্ব্বাদ ( ইচ্ছা ) হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত বাসনা ( সংস্কার ) সকল অনাদি।

ভাষ্যানুবাদ :—আত্মা সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ বা বাঁচিবার ইচ্ছা যখন নিত্য তখন মৃত্যুভয়ের সংস্কারও অনাদি। যদি বল ঐ ধর্ম্ম জীবের স্বাভাবিক, তাহা হইতে পারে না। কারণ যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার কোন কারণ থাকে না—স্বাভাবিক ধর্ম্ম ত্রিকালে নিত্য থাকে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হইলে তাহার প্রকাশ এবং কারণের অভাবে অপ্রকাশ, স্বাভাবিক ধর্ম্মের এইরূপ হয় না। সদ্যজাত শিশুর ক্ষুধা ও মৃত্যুভয়-জনিত স্তন্যপান ও বাঁচিবার ইচ্ছা ও দ্বেষের বিষয় যে দুঃখের প্রত্যক্ষ-জনিত স্মৃতি তাহা ছাড়া কিরূপে হইতে পারে? দেখা যায় শিশুকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে সে ভয়ে মাতৃবক্ষ অবলম্বন করে; মরণ ভয় স্বাভাবিক হইলে পতনের উপক্রম অথবা ঐরূপ অন্য কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই

কম্পিত হয় কেন? যেটি যাহার স্বাভাবিক সেটির কখনও অপ্রকাশ ঘটে না, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। মৃত্যুভয় জনিত কম্পন যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে শিশুর কম্পন সর্ব্বদা দেখা যাইত। অতএব বলিতে হয় চিত্তে অনাদিকাল হইতে অসংখ্য সংস্কার সঞ্চিত আছে, কোনও অদৃষ্ট কারণে ( Environment etc সেগুলি উদ্বোধিত হয় ইত্যাদি। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥ ৪ পা, ৩সূ॥

সূত্রার্থ :—সৎ ও অসৎ কর্ম্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্তু উহারা উহার বাধা ভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র যেমন, কৃষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার স্বভাবেই চলিয়া যায়। ( রাজযোগ )

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যা।—যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কবাটের দ্বারা ঐ জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কবাট খুলিয়া দেয় মাত্র, দিবামাত্রই জল আপনা আপনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে তাহার ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক মানুষের স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহা নিজের প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার সেই স্বভাবগত পূর্ণতা নিজ শক্তিবলে অভিব্যক্ত হইবেই হইবে। তখন মানুষ তাহার ভিতর পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা যাহাদিগকে পাপী বলি, তাহারা সাধুরূপে পরিণত হয়। স্বভাবই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লইয়া যাইবেন। ধার্ম্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্য্য মাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া ও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া।

আজকাল প্রাচীন যোগীদিগের পরিণামবাদ বর্ত্তমান কালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু যোগী-দিগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটি কারণ, যৌননির্ব্বাচন ( Sexual Selection ) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন ( Survival of the Fittest )। কিন্তু এই দুইটি কারণকে সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও পতি বা পত্নী লাভ করিবার বিষয়ে প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতি প্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভৎসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা দার্শনিক নাম ধারণ করিয়া যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়া ( অবশ্য ইঁহারাই উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার একমাত্র বিচারক ) মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের প্রকৃত রহস্য প্রত্যেক ব্যক্তিতে পূর্ণতার যে প্রাগ্‌ভাব রহিয়াছে, তাহারই আবির্ভাব মাত্র। তিনি বলেন, এই পূর্ণতা নিজ প্রকাশের বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ পূর্ণতারূপ আমাদের অন্তরালস্থ অনন্ত তরঙ্গরাশি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফল মাত্র। আমরা এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয় তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত তরঙ্গরাশি রহিয়াছে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে ; ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ ; কেবল জীবন ধারণ অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। উহারা বাস্তবিক ক্ষণিক, অনাবশ্যক, বাহ্য ব্যাপার মাত্র। উহারা অজ্ঞানজাত। সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি র্ণপূ হইতেছে, ততদিন আমাদের অন্তরালস্থ এই পূর্ণস্বভাব

আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। এই জন্যই প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর মানুষ গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, যেমন দ্বার খোলা হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয় অমনি মানুষ প্রকাশ পায়। এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবতা গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাঁহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। যখন জ্ঞান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশ পান।

( কর্ম্মফল সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না কেন ? )

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ২ পা, ১২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—কর্ম্মের আশয়ের মূল এই পূর্ব্বোক্ত ক্লেশগুলি—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ; বর্ত্তমান অথবা পর জীবনে উহারা ফল প্রসব করে। ( রাজযোগ )

ভাষ্যানুবাদ :—পুণ্যকর্ম্মাশয়রূপ ধর্ম্ম ও অপুণ্যকর্ম্মাশয়রূপ অধর্ম্ম উভয়ই কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে জন্মে। ঐ সকল কর্ম্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্ম বেদনীয়—এই জন্মেই উহার পরিপাক বা ভোগ হয় আর অপরগুলি অদৃষ্টজন্ম বেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে ফল প্রসব করে। তীব্র সংবেগ অর্থাৎ উৎকট প্রযত্ন দ্বারা পুণ্যকর্ম্মাশয় সন্তঃ ফল প্রসব করে এবং তদ্বিপরীত উৎকট অবিদ্যাদি জাত পাপকর্ম্মাশয়ও সদ্যঃ ফল প্রসব করে। মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি অথবা পরমেশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভবগণের আরাধনা জাত পুণ্যকর্ম্মাশয় তথা ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত অথবা মহানুভব তপস্বিগণের প্রতি বারংবার অপকার হইতে জাত অপুণ্যকর্ম্মাশয় সদ্যঃ ফল প্রসব করে। যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনা করিয়া মনুষ্য শরীর হইতেই দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন। তদ্বিপরীত নহুষরাজা দেবগণের ইন্দ্র হইয়া মহর্ষির শাপ বশতঃ দেবতারূপ হইতে তির্য্যকরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দকৃত ব্যাখ্যা।—কর্ম্মাশয়ের অর্থ সংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। আমরা মনে করি ; ঐ কার্য্যটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও

চলিয়া যাইবে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা যেন সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তথাপি তখনও ঐ স্থানেই রহিয়াছে। যখন আমরা উহা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্ব্বার উদয় হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। সুতরাং, জানা যাইতেছে, উহা মনের ভিতর গূঢ়ভাবে ছিল ; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। সুতরাং, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হোক, আর অশুভই হোক মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে ও ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে। সুখকর অথবা দুঃখকর সকল প্রকার চিন্তাকেই ক্লেশ বলে, কারণ যোগীদিগের মতে উভয়ই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্রিয়গণ হইতে যে সকল সুখ পাওয়া যায়, তাহারা পরিণামে দুঃখ আনয়ন করিবেই করিবে। ভোগে ভোগতৃষ্ণা বাড়িয়া থাকে ; তাহার ফল দুঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই ; মানুষ ক্রমাগত বাসনা করিতেছে, বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন একস্থানে উপনীত হয় যে, কোন মতে তাহার বাসনা আর পরিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ, অশুভ সমুদয় সংস্কারগুলির সমষ্টিকে ক্লেশ বলিয়া থাকেন, উহারা আত্মার মুক্তির পথে বাধা প্রদান করে। সমুদয় কার্য্যের সূক্ষ্মমূল স্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা কারণ স্বরূপ হইয়া ইহ জীবনে অথবা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐ সংস্কারগুলির প্রাবল্য হেতু উহারা অতি শীঘ্রই ফল প্রসব করে, অত্যুৎকট পুণ্য বা পাপকর্ম্ম ইহ জীবনেই তাহার ফল উৎপাদন করে। যোগীরা বলেন, যে সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, তাঁহারা ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। যোগীদিগের গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আপনাদের শরীরের উপাদান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন। ইঁহারা নিজেদের দেহের পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের

নিকট আসিতে পারে না। এরূপ ঘটনা হইবার কোন কারণ নাই। শারীর বিধান শাস্ত্র খাদ্যের অর্থ করেন—সূর্য্য হইতে শক্তি গ্রহণ। ঐ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ্‌কে আবার কোন পশু ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশু মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাহা কে বলিল? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না; কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তিসংগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও যত ইচ্ছা, শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথায়ও যাইতে হইলে সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের উপাদানীভূত পদার্থ হইতে এই স্নায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই স্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার আমার প্রয়োজন কি? এই তত্ত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে তড়িৎ শক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু উহা প্রেরণ করিবার জন্য আমাদের তারের আবশ্যক হয়। কেন, প্রকৃতি ত বিনা তারে বহু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ করিতেছেন। আমরাই বা কেন না তাহা করিতে পারিব? আমরা চতুর্দ্দিকে মানস-তড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎ শক্তির সদৃশ। স্নায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তড়িতের ন্যায় উহারও প্রান্তদ্বয়ে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় ও তড়িতের অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম, উহাতেও সেই ধর্ম্মগুলি দেখা

যায়। এই তড়িৎ শক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারিব। যখন কোন আত্মা এই স্নায়ু যন্ত্ররূপ প্রণালীর ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, আমরা তখন তাঁহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্র-গুলির নাশ হইলেই তাঁহাকে মৃত বলি। কিন্তু যিনি এইরূপ স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যেই হউক, অথবা তৎসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই হউক, উভয় প্রকারেই কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই শব্দের কোন অর্থ ই নাই। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর আছে সবই তন্মাত্রা দ্বারা রচিত, কেবল প্রভেদ তাহাদের বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ঐ বিন্যাসের কর্ত্তা হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, ঐ তন্মাত্রাগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই শরীর তুমি ছাড়া আর কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত, তোমাকে বড় বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমিই। ঐ রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। আমরাই দেহের কর্ত্তা এবং উহাতে বাস করিতেছি। কেবল উহা কিরূপে নূতন করিয়া গড়িতে হয়, সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্রতুল্য অবনত স্বভাব হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের পরমাণুগুলির বিন্যাসপ্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমরা এক্ষণে যাহা যন্ত্রবৎ করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে। আমরাই কর্ত্তা, সুতরাং আমাদিগকেই এই বিন্যাসপ্রণালীকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত নূতন করিয়া দেহের নির্ম্মাণে সমর্থ হইব, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি আদি কিছুই থাকিবে না।

( ক্রমশঃ ) — বাসুদেবানন্দ।

# শ্রীনিম্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনভাষ্যম্

## প্রথম অধ্যায়ে—দ্বিতীয় পাদঃ

### সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ সূ ॥

সূত্রার্থ ঃ—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশাৎ = সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশ আছে বলিয়া।

বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যানুবাদ ঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুর্ব্বীত। মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ" ( ছা, উ )—এ সমস্তই ব্রহ্ম ; এ সমস্তই তজ্জ ( তাঁহা হইতে জাত ) তল্ল ( তাঁহাতে লীন ) এবং তদন্ ( তাঁহাতে স্থিত )। ইহা জানিয়া শান্ত ( কাম ক্রোধাদি বর্জ্জিত এবং আত্মপর বোধ রোহিত ) হইয়া উপাসনা করিবে—এইরূপ আরম্ভ করিয়া পরে শ্রুতি বলিতেছেন, এই পুরুষ ক্রতুময় ( যে বিষয়ের যজ্ঞ বা উপাসনা বা ধ্যান করেন তাহারই গুণ বিশিষ্ট )। ইহলোকে পুরুষ যেরূপ ক্রতু সম্পন্ন হন, মৃত্যুর পরও সেই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হন। অতএব পুরুষ ক্রতু করিবে, মনোময় প্রাণ-শরীর জ্যোতিঃরূপ ধ্যান করিবে। এখানে মনোময় শব্দের অর্থ উপাস্যরূপে সর্ব্বকারণভূত পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, জীবাত্মা নহে। কেন ?—সমস্ত বেদান্তে পরমাত্মা সম্বন্ধেই কেবল এই উপদেশ করা হইয়াছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

[ আচার্য্য শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ]

### বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ সূ ॥

সূত্রার্থ ঃ—বিবক্ষিত গুণঃ = শ্রুতি যে সকল গুণের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; উপপত্তেঃ চ = তাহা ব্রহ্মেতেই উৎপত্তি হয়।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"মনোময়ঃ প্রাণ শরীরোভারূপঃ" এই বাক্যের পর

আছে "সত্য সঙ্কল্প" ইত্যাদি। মনময়ত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণ যাহা শ্রুতি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম বিষয়েই খাটে।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অনুপপত্তেঃ তু = ঐ সকল গুণ অনুপপত্তি হয় ; ন শারীর = ঐ সকল গুণ দেহীর হইতে পারে না।

ভাষ্যানুবাদ :—মনময়ত্বাদি গুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই খাটে, জীব সম্বন্ধে মনময়ত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ সম্ভব নহে।

[ শাঙ্কর-ভাষ্যে ইহা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। 'সত্যসঙ্কল্প', 'আকাশাত্মা', 'অবাকাঽনাদরঃ' 'জ্যায়ান পৃথিব্যা' অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, অবাকী, অকাম, পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি গুণ শরীরধারী জীবে সম্ভব নহে। ]

কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—কর্ম্ম কর্তৃ ব্যপদেশাৎ চ = কর্ম্ম এবং কর্ত্তার উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—"এতমিতঃ প্রেত্যাঽভিসম্ভবিতাঽস্মি"—আমি ইহ-লোক ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে ( আমার উপাস্যকে ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও জীব কর্ত্তা এবং কর্ম্ম 'এতম্' অর্থাৎ মনোময়াদি পদবাচ্য পর-মাত্মা, শারীর জীব নহে। 'এতমিতঃ' বাক্যে কর্ম্ম এবং কর্ত্তার স্পষ্ট রূপে উপদেশ করা হইয়াছে।

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শব্দ-বিশেষাৎ = শ্রুতির শব্দ বিশেষ হইতে।

ভাষ্যানুবাদ :—"এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে"—এই আত্মা আমার হৃদয়ে —এই শ্রুতিতে জীব সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি 'মে' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে এবং উপাস্য আত্মা সম্বন্ধে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই হেতু মনোময়ত্বাদি গুণ সকল শরীর হইতে অন্য পরমাত্মার।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—স্মৃতেঃ চ = স্মৃতিতেও এরূপ আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিতেও জীব এবং পরমাত্মার ভেদ দৃষ্ট হয়, যথা

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং, হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ( গীতা ) হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্ব প্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, তিনি হৃদ্দেশে থাকিয়া মায়ার দ্বারা জীব সকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রমণ করান।

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ॥ ৭ সূ॥

সূত্রার্থ :—অর্ভকঃ=অল্প; ওকঃ=স্থানং; ত্বাৎ=হেতু; তৎ=তাহার; ব্যপদেশাৎ চ=উপদেশ হেতু জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না; ইতি চেৎ=ইহা যদি বলি; ন=না বলিতে পার না; নিচায্যত্বাৎ=জীবের ব্রহ্মাত্মকতাই উপদেশ আছে বলিয়া; ব্যোমবৎ=যেমন আকাশ ক্ষুদ্র উপাধিতে ক্ষুদ্র দেখায়।

ভাষ্যানুবাদ :—"এষ মে আত্মা হৃদয়ে"—এখানে অল্প আযতনের উল্লেখ হেতু, "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা"—আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা ক্ষুদ্র—এই অল্পত্ব উপদেশ হেতু—আত্মা অর্থে ব্রহ্ম বুঝা যায় না।—না এরূপ নহে—ব্রহ্মই এখানে আত্মারূপে উপাস্য। ব্রহ্মই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যেমন আকাশ গবাক্ষাদিতে বৃহৎ ও অণু বলিয়া বোধ হয়।

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ॥ ৮ সূ॥

সূত্রার্থ :—সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ=ব্রহ্ম জীবে আছেন বলিলে তাঁহার জীবের ন্যায় সম্ভোগ প্রাপ্তি হয় যদি এইরূপ বলি; ন=না বলিতে পার না; বৈশেষ্যাৎ=বিশেষত্ব আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—যদি বল, সর্ব্ব হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ব্রহ্মেরও সুখ দুঃখ সম্ভোগ প্রাপ্তি হইবে—না তাহাতে দোষ নাই। স্বকৃত কর্ম্মফল ভোক্তৃত্ব এবং অপহত পাপ্মাত্ব এই দুই পৃথক গুণ হেতু জীব এবং ব্রহ্মের অত্যন্ত বিশেষত্ব আছে।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ৯ সূ॥

সূত্রার্থ :—অত্তা=ভক্ষক ব্রহ্ম; চর অচর গ্রহণাৎ=চরাচরকে গ্রাস করেন বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—"যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যুর্যস্যোপ-সেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স" ( কঠ, উ, ১।২ )—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন ( যাহা দিয়া মাখিয়া খায় ), তাঁহার স্বরূপ

কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে? এখানে অত্তা (ভক্ষক) শ্রীপুরুষোত্তম।—কেন? ব্রহ্মের মৃত্যুরূপ উপসেচনের খাদ্য হইতেছে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহা চরাচরাত্মক বিশ্বে উপলক্ষিত অর্থাৎ যিনি চরাচরাত্মক বিশ্বকে গ্রহণ বা গ্রাস করেন এই হেতু।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকরণাৎ চ=ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এই হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—অত্তা (ভক্ষক) ভগবান পুরুষোত্তম, কারণ ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্তু "মহান্তং বিভুং।" ইহাই অত্তার প্রকৃতত্ত্বের হেতু।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—গুহাং=হৃদয় গুহাং; প্রবিষ্টৌ=প্রবিষ্ট; আত্মনৌ=আত্মাদ্বয়ের; তৎ=তাহার; দর্শনাৎ=উপদেশ দেখা যায় বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ"—কঠবল্লীতে গুহাতে প্রবিষ্ট যে আত্মদ্বয়ের কথা আছে, সেই দুই চেতন আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া বুঝিবে।—কেন? তাহাদের উভয়ের গুহা প্রবেশ সম্বন্ধে এই প্রকরণে উপদেশ দেখা যায় বলিয়া। "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্"—এইটি পরমাত্মা সম্বন্ধে এবং "যা প্রাণেন গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তি"—এইটি জীবাত্মা সম্বন্ধে।

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—বিশেষণাৎ চ=জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বিশেষণতা আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—গুহা প্রবিষ্টদ্বয়কে জীব এবং পর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে হেতু, এই প্রকরণে, "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তি মত্যন্তমেতি," "যঃ সেতুরীজানানাং"—এই সকল মন্ত্রে, ঐ দুয়ের উপাস্য উপাসকত্ব, বেদ্যত্ব বেত্তৃত্ব বিশেষিত আছে।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অন্তর=শ্রুতির অন্তর শব্দের দ্বারা; উপপত্তেঃ=পরমাত্মাতেই উপপত্তি হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দগ্যের উপকোশল প্রকরণে আছে, "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে"—চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন—এই স্থলেও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ যিনি তিনি পুরুষোত্তমই, জীব নহে।—কেন? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি," "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি"—প্রভৃতি মন্ত্রে ঐ পুরুষকে শ্রুতি আত্মত্ব, অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, সংযদ্বামত্বাদি গুণের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। ( বামনী = জীব কর্ম্মফল দাতা, ভামনী = সর্ব্ব প্রকাশক )। এই সকল বিশেষণ জীব সম্বন্ধে প্রয়োজন হয় না।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—স্থানাদি = চক্ষু প্রভৃতি স্থানের; উপদেশাৎ = উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—"যং পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্, তস্যোদিতি নাম হিরণ্যশ্মশ্রু"—যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন, উৎ যাঁহার নাম, যিনি হিরণ্ময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মধ্যানের জন্য স্থান নাম ও রূপের উপদেশ আছে বলিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষকে ব্রহ্মই বলিতে হয়।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সুখ বিশিষ্ট = অক্ষিগত পুরুষকে সুখ বিশিষ্ট; অভিধানাৎ এব চ = অভিধান হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—অক্ষিগত পুরুষ পরব্রহ্ম, কেননা "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। জীব সুখ স্বরূপ নহে পরন্তু দুঃখ স্বরূপ।

অতএব চ তদ্ব্রহ্ম ॥ ১৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অতএব চ তৎ ব্রহ্ম = অতএব তাহা ব্রহ্মই।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি বলিতেছেন, "যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং তদেব কং"—যাহা সুখ স্বরূপ, তিনিই আকাশস্বরূপ; যিনি আকাশস্বরূপ তিনিই সুখ স্বরূপ। সুখ স্বরূপ আত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে অতএব তাহা ব্রহ্ম, জীব নহে।

শ্রুতোপনিষৎকসত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতোপনিষৎক=শ্রুতোপনিষৎ যুক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের (উপনিষদিতি পরমাত্মানং প্রাপয়তি যা পরমাত্মবিদ্যা সা উপনিষৎ; শ্রুতোপনিষত্কেন); গতি=মৃত্যুর পর পরলোকে গমন; অভিধানাৎ চ=উল্লেখ আছে বলিয়া ।

ভাষ্যানুবাদ :—উপনিষদের দ্বারা অক্ষি-পুরুষের উপাসক ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির যে দেব যানাখ্য—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ-পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্ততে"—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিয়া দেহান্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই জীবের শেষ বিশ্রাম স্থান, ইহাই অমৃত (মোক্ষ), পরম অভয়স্থান। এই স্থান প্রাপ্ত পুরুষ আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না এবং "তস্যা এবেহ তের্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তী" প্রভৃতি বাক্যে গতির উল্লেখ থাকায় চক্ষুর অন্তবর্ত্তী পুরুষ পুরুষোত্তমই।

[শ্রুতি বলিতেছেন, "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদু চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি"—"আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তত ইতি"—উপাসকের মৃত্যু হইলে তাঁহার কুটুম্বগণ তাঁহার শব সংস্কার করুক আর নাই করুক, তিনি অর্চ্চিকে (অগ্নি) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েন; সেই পুরুষ আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুল্লোক প্রাপ্ত হয়েন; তখন ব্রহ্মলোকবাসী দিব্যপুরুষ উক্ত উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহারই নাম দেবপথ ও ব্রহ্মপথ; ইহা প্রাপ্ত হইলে মানবের এই আবর্ত্তমান সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অনবস্থিতেঃ=জীবের অবস্থান; অসম্ভবাৎ চ=অসম্ভব হেতু; ন ইতরঃ=অপর কেহ নহে পরমাত্মাই।

ভাষ্যানুবাদ :—অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা আর কেহ নহে।—কেন?

তদ্ভিতর জীবের অক্ষিতে অবস্থানের নিয়ম নাই এবং অমৃতত্বাদি ও জীবেতে অসম্ভব।

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অন্তর্য্যামী অধিদৈবাদি লোকাদিষু=অধিদৈবাদি লোকে যে অন্তর্যামীর উল্লেখ আছে, তিনি ব্রহ্ম ; তৎ ধর্ম্ম ব্যপদেশাৎ=তাঁহার ধর্ম্ম উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকশ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ( অন্তর্য্যামী ) ব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্"—যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, এই উপক্রম করিয়া শেষে "এষ তে আত্মাঽন্তর্যামী"—এই তোমার আত্মা অন্তর্যামী বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যায় ক্রমে অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তেজঃ, প্রাণিবর্গ, ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি অধিদৈব, অধিলোক, অধ্যাত্ম বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পুরুষকে প্রতিবার "এষতে আত্মাঽন্তর্যামী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পুরুষ জীবাত্মা নহেন পরমাত্মা।—কেন ? ব্রহ্মের ধর্ম্ম যে সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্বাদি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে উপদেশ আছে বলিয়া।

নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ২০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—নচ স্মার্ত্তম=সাংখ্যাদি স্মৃতিতে যে প্রধান বা জড়ের উল্লেখ আছে তাহা ঐ অন্তর্যামী পুরুষ নহেন। অতৎ ধর্ম্ম=যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা জড়ের ধর্ম্ম নহে, অভিলাপাৎ=চেতনের ধর্ম্মের অপলাপ হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রধান অন্তর্যামী শব্দবাচ্য নহে। কারণ তাহা হইলে চেতনধর্ম্ম সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদির অপলাপ হয়।

শারীরশ্চোভয়েঽপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শারীরঃ চ=জীবও নহে ; উভয়ে অপি হি=জীবও পরমাত্মা উভয়েই ; ভেদেন এনম অধীয়তে=শ্রুতিতে ভেদের সহিত অধ্যয়ন করা যায়।

ভাষ্যানুবাদ :—জীব অন্তর্যামী নহেন। যে হেতু কাম্ব এবং মাধ্যং-

ন্দিন উভয় শাখাতেই জীব ও পরমাত্মার ভেদের উপদেশ আছে। যথা—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিতি ( কাণ্বাঃ )—যিনি বিজ্ঞানে ( জীবে ) থাকিয়া এবং এবং স "আত্মনীতি" ( মাধ্যংদিন ) যিনি আত্মাতে ( জীবে ) থাকিয়া ইত্যাদি।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ = অদৃশ্যত্বাদি গুণ বিশিষ্ট যিনি তিনি ব্রহ্ম ; ধর্ম্মোক্তেঃ = পরে ঐ গুণ ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকে আছে "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্"—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যত্বাদিগুণ পরমাত্মারই।—কেন ? কারণ পরে ঐ শ্রুতি বলিতেছেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" যিনি সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম চেতন ব্রহ্মেরই।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ ২৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—বিশেষণ ভেদ ব্যপদেশাভ্যাং = বিশেষণ এবং ভেদ উপদেশ হইতে ; ন ইতরৌ—জীবাত্মা বা প্রধান নহে।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা জীব উক্ত শ্রুতির ভূতযোনি বা অক্ষর পদবাচ্য নহে। কারণ সর্ব্বগত এই বিশেষণ হইতে উহা জীব নহে বুঝা যায় এবং "অক্ষরাৎ পরতঃ পর"—অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ—এই উপদেশ দ্বারা প্রাধান হইতে শ্রুতি পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—রূপঃ উপন্যাসাৎ চ = রূপের বর্ণনা হইতে।

ভাষ্যানুবাদ :—তাহার পর শ্রুতি বলিতেছেন সেই পুরুষের "অগ্নি-মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ"—অগ্নি ইঁহার শির, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু।—ইত্যাদি রূপ বর্ণনা হেতু বলিতে হয় ঐ পুরুষ জীব নহেন পরমাত্মা।

বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দ বিশেষাৎ ॥ ২৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ = বৈশ্বানর বা অগ্নি শব্দটি সাধারণ অগ্নিবোধক শব্দ হইতে বিশেষভাবে বর্ণনা হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ

আছে। ঐ স্থলে বৈশ্বানর পরমাত্মাই। যদিও বৈশ্বানর শব্দের সাধারণতঃ দুইটি অর্থ হয়—অগ্নি এবং ব্রহ্ম কিন্তু পরে "দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি"—তাঁহার শির স্বর্গ—বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় ঐ বৈশ্বানর পুরুষ অগ্নি নহেন পরমাত্মা।

স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—স্মর্য্যমাণম্ অনুমানং স্যাৎ ইতি=স্মৃতিও ব্রহ্মের ঐরূপ রূপ অনুমান করিয়াছেন।

ভাষ্যানুবাদ :—বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মা, কারণ স্মৃতিও বলিয়াছেন, "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌমূর্দ্ধেত্যাদি"—অগ্নি যাঁহার আস্য বা বদন, স্বর্গ যাঁহার শির—এই স্মৃতি বাক্য পরমাত্মারই রূপ নিশ্চয় করিতেছে।

[ এইরূপ দুইটি স্মৃতিবাক্য দেখা যায়—

(১) দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্র সূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ
যোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত প্রণেতা ॥

—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে যাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ সকলকে যাঁহার শ্রোত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং পৃথিবীকেই যাঁহার পাদ বলিয়া অবগত হয়েন, সেই আত্মা অচিন্ত্য এবং সকল ভূতের স্রষ্টা।

(২) যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌমূর্দ্ধা, খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥ ]

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন,
তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে ॥ ২৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শব্দাদিভ্যঃ=বৈশ্বানর শব্দাদি; অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাৎ=জঠর অন্তরে প্রতিষ্ঠান আছে এইরূপ শ্রুতিতে থাকায়; ন ইতি=উহারা পরমাত্ম শব্দবাচী নহে; চেৎ=যদি বলি; ন=না বলিতে পার না; তথা=সেই বৈশ্বানরে; দৃষ্টি উপদেশাৎ=ব্রহ্মদৃষ্টি উপদেশ হেতু; অসম্ভবাৎ=অসম্ভব হেতু; পুরুষম্ অভিধীয়তে=পুরুষ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করায়।

ভাষ্যানুবাদ :—বৈশ্বানর শব্দের রূঢ়ার্থ ( স্বাভাবিক ) জঠর-অগ্নি বা অগ্নি। শ্রুতি এখানে হৃদয়, গার্হপত্য ও মনঃ এই ত্রিবিধ অগ্নির উল্লেখ করায়, "প্রথমমাগচ্ছেৎ"—ইত্যাদি প্রাণাহুতি বাক্যে অগ্নির আধারত্বও বলা হইয়াছে এবং "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানরকে পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলায় উহা পরমাত্মবাচী শব্দ নহে উহা জাঠরাগ্নি যদি এইরূপ বলি ?

না বলিতে পার না, কারণ শ্রুতি বৈশ্বানর উপাধিতে পরমাত্ম দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন। এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মবাচী না হইলে, "স্বর্গ ইঁহার শির" এরূপ বাক্য অসম্ভব হয়। তাহা ছাড়া শ্রুতি বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

[ শ্রুতি—স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি ]

অতএব ন দেবতা ভূতং চ॥ ২৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অতএব = এই হেতু ; ন দেবতা ভূতং চ = অগ্নি শব্দের অর্থ দেবতাও নহে বা তৃতীয় ভূতও নহে।

ভাষ্যানুবাদ :—উক্ত কারণে বৈশ্বানর শব্দে দেবতা বা তেজঃপদার্থ অর্থে গ্রহণ হইতে পারে না।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং = সাক্ষাৎ সম্বন্ধও অবিরোধ হয় ; জৈমিনিঃ = ইহা জৈমিনিরও মত।

ভাষ্যানুবাদ :—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ = বৈশ্বানরঃ। অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা ভগবান বৈশ্বানর শব্দবাচ্য এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ( জঠরাগ্নিকে উপলক্ষ্য করিয়া ) উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, দৃষ্টতঃও কোনও বাক্য বিরোধ হয় না, ইহা জৈমিনি মুনি বলেন।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ। ৩০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অভিব্যক্তেঃ = অভিব্যক্তির নিমিত্ত , আশ্মরথ্যঃ = আশ্মরথ্য মুনিও বলেন।

ভাষ্যানুবাদ :—অনন্তমতি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত, অনন্ত হইয়াও পরমাত্মা উপাসকের অভিলক্ষিতরূপে অভিব্যক্ত হয়েন। অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশ মাত্ররূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হন। আশ্মরথ্য মুনি এইরূপ মনে করেন।

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অনুস্মৃতেঃ = ধ্যানের নিমিত্ত ; বাদরিঃ = বাদরি মুনির মত।

ভাষ্যানুবাদ :—বাদরি মুনি মনে করেন, শ্রুতি ব্রহ্ম ধ্যানের সুবিধার জন্য মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত দেহ কল্পনার উপদেশ করিয়াছেন।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সম্পত্তেঃ = ধ্যেয় বস্তুর সহিত একরূপতা বা সমাপত্তি হেতু ; জৈমিনিঃ = এইরূপ জৈমিনির মত ; তথা হি দর্শয়তি = শ্রুতিও এইরূপ দেখাইতেছেন।

ভাষ্যানুবাদ :—বৈশ্বানর উপাসকের ক্রিয়াঙ্গীভূত প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব করিবার জন্য সেই উপাসকদের নিজ উরুঃ প্রভৃতি অঙ্গকে উপাস্য বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গরূপে ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, ইহা আচার্য্য জৈমিনির মত। শ্রুতি বলিতেছেন, "তথৈবাথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতীতি—যে বিদ্বান্ পুরুষ এই প্রকার অগ্নিহোত্র যাগ করেন ইত্যাদি।

[ বাজসনেয় শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গসকলকে উপাসক আপনার শিরঃ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত স্থানে ধ্যানদ্বারা সন্নিবেশিত করিয়া, তাঁহার নিজ শিরঃ প্রদেশকে বিরাটরূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গরূপে, নিজ চক্ষুকে বৈশ্বানরের চক্ষু সূর্য্যরূপে, নিজ মুখ বিবরকে আকাশরূপে ক্রমে ধারণা করিয়া তাঁহার সহিত অভেদ ভাবাপন্ন হইবেন ; ধ্যেয় বস্তুর সহিত একরূপতা হওয়াকেই সম্পত্তি অথবা সমাপত্তি বলে। ]

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—আমনন্তি = উপদেশ করিয়াছেন ; চ এনম্ অস্মিন্ = এই উপাসক দেহে।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি মন্ত্রে এই দ্যুমূর্দ্ধাদি বিশিষ্ট বৈশ্বানরকে উপাসক দেহে পুরুষরূপে ধ্যানের উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বৈশ্বানর শ্রুতি ব্রহ্মবোধক।

ইতি নিম্বার্কীয় ব্রহ্মসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে
দ্বিতীয় পাদঃ।

—বাসুদেবানন্দ।

---

# শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠ ও দাতব্য চিকিৎসালয়

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনস্থ জয়রামবাটী গ্রাম শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পুণ্যাবির্ভাব ভূমি। এ স্থানের কার্য্যাবলী গত ১৩৩১ এবং ১৩৩২ সালের সংবাদপত্রে সঙ্ক্ষেপে প্রদান করিয়াছি। এই গ্রামের এবং চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সকলের অধিবাসীগণ বহুদিন হইতে বিশেষভাবে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। অত্রস্থ গ্রামগুলি একেবারে পল্লিগ্রাম এবং কোনও টাউন বা মহকুমা বা কোনও বিশিষ্ট স্থানের সহিত ইহাদের সংস্রব নাই। এখান হইতে রেলপথ চারিদিকে অন্যূন ২৫ মাইল দূরে থাকায় এবং রাস্তার অভাবে যাতায়াত বিশেষ কষ্টকর হওয়ায়, ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র জনসাধারণ রোগপ্রতীকারের সকল আশা ও উদ্যম বিসর্জ্জন দিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শিক্ষার অভাব এত বেশী যে, অত্রস্থ জনসাধারণ পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিটি গ্রাম ভিন্ন দুনিয়ার আর কোন খবর রাখে না বলিলেই হয়।

শ্রীশ্রীসারদা দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত ১৯২৫ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২০৯৫ জন নূতন রোগী এবং ১৫০০ জন পুরাতন রোগীর

চিকিৎসা হয়। গত বৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রকোপ হওয়ায় উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধীনে একটি অস্থায়ী শাখা-কেন্দ্র খোলা হয় এবং তথায় গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে ১৪২৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত উক্তবর্ষে ৫০২০ জন রোগীকে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠে বর্ত্তমানে ৩০ জন বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। বিদ্যালয়ের গৃহ না থাকায় শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের বারান্দাতেই ক্লাস হইয়া থাকে। ইহাতে শিক্ষাকার্য্য এবং পূজাকার্য্য এই উভয়েরই অসুবিধা হয়। গৃহাভাবে আমরা ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতেও পারিতেছি না।

উক্ত চিকিৎসালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার সহৃদয় জনগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। আগামী ম্যালেরিয়ার সময় কয়েকমাসের জন্য আমরা এখন হইতেই ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সংগ্রহ করিতে চাই। গতবর্ষে নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ ঔষধ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১। মেসার্স বি. কে. পাল এণ্ড কোং. ২। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন পাল ৩। মেসার্স জারমলিন. এণ্ড কোং ৪। মেসার্স সুরেশ হৃষীকেশ এণ্ড কোং ৫। মেসার্স ব্রজনাথ সাহা এণ্ড কোং ৬। মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আমাদিগকে ২০০ কুইনাইন ট্যাবলেট্ দিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে আর্থিক সাহায্য অল্পাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া মোট ৮৭৸৵১০ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৮৫৶৫ খরচ হইয়াছিল এবং ২৷৵৫ অবশিষ্ট ছিল।

যাহাতে একটি বিদ্যালয় স্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়া এই অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার হয় তজ্জন্য বিদ্যালয়ের ভূমি ক্রয়, গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এখানে উচ্চ প্রাথমিক ক্লাসের মত শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা শীঘ্র একটি বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে এই বিদ্যালয় এম, ই. স্কুলে পরিণত হইতে পারে।

এই দরিদ্র, রুগ্ন ও অশিক্ষিত জনগণের রোগ নিবারণ ও শিক্ষাদান রূপ সেবাকল্পে আমরা সহৃদয় জনগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি ।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির—জয়রামবাটী
পোঃ দেশড়া, জেলা বাঁকুড়া

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—
স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

---

# সমালোচনা

শ্রীসুশ্বেতা দেবী লিখিত 'কন্‌ভাসান্‌' ও 'ট্র্যাপ্‌' নামক গল্প দুইটি 'উদ্বোধনে' পড়িয়া ঐ সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিতে চাই। উহাকে গল্প বলিলে—ঠিক বলা হয় না, বরং তাহাতে অবিচারই করা হয়। বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে যে সমস্যা ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, যাহার উপর জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই, লেখিকা তাঁহার রচিত গল্পের দ্বারা এইরূপ দুই একটি অতি গুরুতর সমস্যার উপর অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। গল্প দুইটি মেয়েদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে লিখিত, সুতরাং ঐ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিবার দাবী রাখি।

মোটামুটি ধরিলে বুঝা যায়, কুমারী ও বিধবাদের সম্বন্ধে লেখিকা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 'সম্পূর্ণ নূতন ধরণের' বলিতেছি কেন—না, ব্যক্তিগতভাবে ঐ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলেও প্রকাশ্যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, জনমতের সম্মুখে ঐরূপ কোন অভিমত কেহ এপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম—কুমারীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের পর হইতে সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে একটি ধর্ম্ম-প্রবাহ আসিয়াছে। এই ধর্ম্মভাবে

অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিত বস্তু পবিত্রতা ও মুক্তি লাভের জন্য বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলাদেশে যতগুলি জেলা আছে, বোধ হয় প্রত্যেক জেলা হইতেই কমপক্ষে বিশ পঁচিশ জন যুবক মহত্তর জীবন যাপনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা সংসার একেবারে ত্যাগ করেন নাই, অথচ পবিত্র জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন এরূপ ছেলেও বাংলাদেশে কম নহে। যাঁহারা ঐভাবে আদর্শ জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন তাঁহারা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব-গণের মধ্যেও একটা গভীর দাগ ফেলিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের জীবন দেখিয়া তাঁহাদের ভাই, ভাইপো, ভাগ্নেরা যেমন ঐভাবে অনুপ্রাণিত হন—তাঁহাদের বোন্, ভাইঝি ও ভাগ্নীরাও ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। কারণ, মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই সমভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য বাস্তবিকই আন্তরিক সচেষ্ট। এই অমানব পুরুষদ্বয়ের পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা পুরুষগণকে যেমন আকৃষ্ট করে, স্ত্রীলোকদেরও ঠিক সেইরূপই আকৃষ্ট করে; তাঁহারাও নিখুঁত পবিত্র জীবন যাপন করিয়া শ্রীভগবানের করুণা লাভ করিতে চান। 'নিখুঁত পবিত্র জীবন' মানে—আমি এখানে ব্রহ্মচর্য্যের কথাই বলিতেছি। কারণ, উহা না হইলে কি ব্যক্তিগত জীবন, কি সামাজিক জীবন কিছুই উন্নত হইতে পারে না—অবশ্য হিন্দু-শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেদের যেমন স্বাধীনতা আছে, মেয়েদের ততদূর স্বাধীনতা আছে কি? ততদূর কেন—নাই বলিলেই হয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে ছেলেরা চিরকুমার থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করিতে পারেন; সমাজ তো তাহাতে বাধা দেয়ই না—বরং অনেক সময় দেশ-নেতা ও সমাজ-নেতাদের কাছে তাঁহারা উৎসাহই পাইয়া থাকেন, কিন্তু মেয়েরা উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক্—বিবাহ না করিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সমাজের চক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও অবাঞ্ছনীয়। এখানে

একটি কথা আমি বলিতে চাই। পবিত্রতা এবং ব্রহ্মচর্য্যের উপর যদি হিন্দুজাতির জাতীয়তা, উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে শুধু ছেলেরা ভাল হইলেই তো চলিবে না—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও ভাল হওয়া চাই। কারণ, যে কোন জাতি, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়াই গঠিত। সুতরাং হিন্দুজাতিকে উঠিতে হইলে ছেলেদের মধ্যে পবিত্রতার আদর্শ যেমন প্রচার করা উচিত, মেয়েদের ভিতরেও ঐ আদর্শ ঠিক সেই ভাবেই প্রচার করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিবেন—কেন? আমাদের সমাজে মেয়েদের মধ্যে পবিত্রতার আদর্শ প্রচার করা কি হয় না? ইহা কি একটা নূতনতর কিছু? আমি অতি বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি—হাঁ, তা হয়—কিন্তু ঐ পবিত্রতা কতদিনের জন্য? বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নহে কি? হিন্দুনারী কত বয়সে সাধারণতঃ আজকাল বিবাহিতা হয়?—বড় জোর পনের, ষোল। সুতরাং জীবনের প্রথম পনের ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিন্দুনারীগণের পবিত্র জীবন যাপন করিবার অধিকার দেওয়া আছে; তারপর যে পবিত্রতা তাহা বিবাহিত-জীবনের পবিত্রতা, চির-কুমারীর পবিত্রতার সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিবেন—তাহা কেন? তদুত্তরে বলি—যে যত বেশী পবিত্র সে তত উন্নত, মনের উপর কামনার দাগ যাহার যত কম পড়িয়াছে সে তত নির্ম্মল—ইহা কি অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে? যদি অস্বীকৃত না হয় তবে মেয়েরা অখণ্ড পবিত্র জীবন যাপনের জন্য কেন না স্বাধীনতা পাইবে?

প্রশ্ন হইতেছে—তাহারা পারিবে কি? ইহার উত্তর এই—পারা-না-পারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান। যেমন—যে সব ছেলের বুকের পাটা আছে তাহারা অকুতোভয়ে উচ্চ আদর্শের জন্য কঠোর ভাবে চেষ্টা করে, যাহাদের সে সাহস বা সে আন্তরিকতা নাই তাহারা বিবাহিত জীবন লইয়া সৎ গৃহস্থ হয়, তদ্রূপ যে সব মেয়ের নিজের উপর শ্রদ্ধা আছে, শ্রীভগবানের করুণা লাভে তীব্র ব্যাকুলতা আছে তাহারাও চির-কুমারীর জীবন অতি অবশ্য লইতে পারে—যাহারা ততদূর পারিবে না, বিবাহিতা হইয়া তাহারা সৎ পুত্রকন্যার জননীরূপে আদর্শ গৃহিণী হউন।

যাহারা উন্নত জীবন যাপনের জন্য সংগ্রাম করিতে চায় তাহারা সকলেই যে উহা সম্যক্ পারিবে তাহাও আশা করা যায় না, তবে তাহাদের অদৃষ্টে কি হইবে ? শ্রীভগবান ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

শ্রীসুশ্বেতা দেবী কুমারীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া এক্ষণে বিধবাদের সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া আমার আলোচনা শেষ করিব।

লেখিকা 'ট্র্যাপ' নামক গল্পের উপসংহারে তরঙ্গিণীর মুখে যাহা বলিয়াছেন—মেয়েদের পক্ষে তাহা অভিনব না হইলেও প্রাণপ্রদ। বাংলা-সাহিত্যে বিধবাদের একটা যা-তা কিছু করিয়া তাহাদের জীবন শেষ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তরঙ্গিণী যাহা বলিয়াছে—"পারি-না-পারি আদর্শকে কোন দিন আমি নীচু করবো না, কোন দিনও না—এই আমার ইচ্ছা। সমস্ত জীবন যদি পরাজয়কেই বরণ করতে হয় সেও ভাল—তবু দুর্ব্বলতার সঙ্গে সন্ধি করতে আমি নারাজ। আদর্শ চিরকাল আমার মাথায় থাক্, আমার দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাক্, তাও স্বীকার তবু দেবতার নৈবেদ্যকে যেন মাটিতে নামাবার মত দুর্ব্বলতা কখনো না আসে"—এইরূপ তেজঃপূর্ণ, ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কোন কথা বাংলা গল্প-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে কি ?

শ্রীসন্তোষকুমারী ঘোষ।

# সংঘ-বার্ত্তা

## স্বামী বেদানন্দ

স্বামী বেদানন্দ গত ১০ই কার্ত্তিক বুধবার বেলা ১২—৩০ মিনিটের সময় শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার বাড়ীর নাম প্রভাস; শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিবারে এবং তাহার বাহিরে তিনি স্বামী বেদানন্দ অপেক্ষা প্রভাস মহারাজ নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ন্যূনাধিক ষোল বৎসর পূর্ব্বে প্রভাস মহারাজ সংঘে যোগদান করেন এবং শরীর ত্যাগ কালে তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে বিগত কয়েকবৎসর অতিশয় দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে-ছিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় প্রভাস মহারাজ বেলুড় মঠেই ছিলেন, পরে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর গোবিন্দপুরের পল্লি-ভবনে তিনি কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে যান এবং সেইখানেই দুই তিন দিনের জ্বরে শরীর ত্যাগ করেন।

প্রভাস মহারাজের একাধারে অনেক গুণ ছিল। তাঁহার উন্নত চরিত্র, একনিষ্ঠ কর্ম্মময় জীবন, সপ্রেম সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা সকলের নিকট তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

## কার্য্য-বিবরণী

শ্রীহট্ট—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির ১৯২৫ সনের কার্য্য-বিবরণী। আলোচ্য বর্ষে—শিক্ষা এবং সেবা এই দুই বিভাগে কাজ হইয়াছে। গত সনের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া বোঝা গেল, সেবক-গণ দেশের অভাবের তুলনায় প্রতিকার করিতে নিতান্তই অসমর্থ। খাসিয়া পাহাড়ের আয় ব্যয়ের হিসাবে যাহা আয় তাহাই ব্যয় হইয়াছে—

৫১৫৷৵৯। সেবকগণের যাতায়াত খরচ ৯৩৷৴০ কেন হইল একটু বিশদ ভাবে লিখিলে ভাল হইত। খাসিয়া পাহাড় কেন্দ্র এবং মৌলবী-বাজার কেন্দ্র বিবরণী দৃষ্টে ঠিক বোঝা গেল না ইহারা শ্রীহট্ট—রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির অধীন-কেন্দ্র অথবা স্বাধীন-কেন্দ্র এবং ইহাব পরিচালক কাহারা? আয় ব্যয়ের হিসাবে ২০৮৷০ জমা এবং ১৩৮৴৬ পাই খরচ দেখান হইয়াছে। তহবিলে ৭০।৵৬ পাই থাকা সত্ত্বেও জমার ঘরে হাওলাৎ ৪৷৩ দৃষ্ট হইল।

শ্রীহট্ট—সেবা-সমিতির মোট আয় ১১০২৻৯ পাই—ব্যয় ৮৯৭৸৶৩ পাই—নগদ তহবিল ২০৪৶৬ পাই।

ভবিষ্যতে হিসাব একটু পরিষ্কার করিয়া দেখান হইলে, আলোচনা করিবার পক্ষে এবং যাঁহাবা সহজে আয় ব্যয় দেখিতে আশা রাখেন এই উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। এই সমিতির কার্য্যকরী সভার সভ্যগণের নাম উল্লেখ দেখিলাম না। প্রত্যেক আশ্রমের কার্য্যকরী সভার সভ্যগণের নাম মুদ্রিত করা উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

করিমগঞ্জ ( শ্রীহট্ট )—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্য্য-বিবরণী। এই আশ্রম শিক্ষা এবং সেবা দ্বারা কাজ আরম্ভ করিয়াছে। আশ্রমের আলোচ্য বিবরণী ৪ বৎসরের এক সঙ্গে দেখান হইয়াছে।

১৩২৭ সালে আয় সাবেক তহবিল সহ ৩০৬৸৶৩
১৩২৮ " " " " " ৩৫২৷৶৬
১৩২৯ " " " " " ৪৯০৷৬
১৩৩০ " " " " " ৫৭১৸৴৩
১৩৩১ " " " " " ৮২২।৫

খরচ ১৬৫৷৶৯ উদ্বৃত্ত ১৪১৵৬ পাই।
" ১৭৩।৴০ " ১৭৯।৴৬ পাই।
" ২৮৩৷৵৩ " ২০৭৶৯ পাই।
" ২৮০৶০ " ৩৬৩৷৵৩ পাই।
" ৩৪১৵৯ " ৪৮১৷৮ পাই।

বিবরণী পাঠে এবং আয় ব্যয় দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আশ্রমের পরিচালকগণ ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত বেশ অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রকার ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিলে শ্রীভগবানের কৃপায় উহা যে-আদর্শের জন্য স্থাপিত তাহার অনেকটা সার্থক হইবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

**লতপদী (ঢাকা)—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**

এই আশ্রম ১৩২৪ সনে স্থাপিত হইয়া বিগত ১০ বৎসর যাবৎ লতপদী কেন্দ্রে সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছে। তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেবা এবং শিক্ষা সহায়ে আশ্রম ধীরে ধীরে দেশের অভাবের প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আশ্রমের মোট আয় পূর্ব্বজমা বাদে ১০৯৬।৵ মধ্যে আশ্রমজাত ফসল বিক্রয়ে ৫২০।৴ আয় দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। দেশের দুর্দ্দিনে আশ্রমজাত শিল্প এবং কৃষি সহায়ে সেবকগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সে দিকে প্রত্যেক গ্রাম্য আশ্রমের দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আমরা দুগ্ধবতী গো-পালনের জন্য প্রত্যেক আশ্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গো-পালন বিষয়ে সম্যক জানিতে হইলে Cow keeping in India by Isa Tweed—Messrs. Thaker Spink & Co. Rs. 7-8 আনাইয়া পড়িয়া দেখিতে পারেন।

পূর্ব্বজমা সহ আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ১২৪১।০ মোট খরচ ১০৪৫৲ উদ্বৃত্ত ১৯৬।০ মাত্র। লতপদী কেন্দ্রে স্ত্রী-রোগের প্রসার চিন্তার কারণ। এই কেন্দ্র হইতে নিয়মিত ভাবে ১৬টি গ্রামে রোগীর সেবা করা হইতেছে, দুরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে আসিলেও বিপন্ন জনগণ সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

পৌষ, ২৮শ বর্ষ।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ

৫।২।২১—কাশীধাম

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ধ্যান ভজন করছি কিন্তু ওদিকে একটা taste (রুচি) হচ্ছে না, যেন জোর করে করছি—এর উপায় কি?"

শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "সে কি প্রথমে হয়? প্রথমে হয় না, তার জন্য খুব struggle (লড়াই) করতে হয়। যা তোমার energy (উদ্যম) আছে সব ওদিকে দাও। আর কোন দিকে দেখবে না; আর কোনও দিকে energy direct (উদ্যম নিয়োজিত) করো না। সমস্তই এদিকে দাও, এগিয়ে যাও, কখন satisfied (তুষ্ট) হয়ো না। একটা অশান্তি create (সৃষ্টি) করতে চেষ্টা কর যে, কি হচ্ছে আমার? —কিছুই হচ্ছে না। ঠাকুর বলতেন, 'মা, একটা দিন চলে গেল, এখনও দেখা দিলি নি?' রোজ রাত্রে শোবার আগে একবার চিন্তা করে দেখবে—কতটা সময় ভাল কাজে গেল; কতটা মন্দ কাজে গেল, কতটা সময় তাঁর চিন্তা ধ্যান ভজনে কাটলো, কতটা তমোগুণের কাজে কাটছে।

"তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মনটা strong (শক্ত) করে ফেলো। বড় লোকের বাড়ীতে দরোয়ান থাকে, তার কাজ—চোর, গরু টরু তাড়িয়ে দেওয়া, সেই রকম মন হচ্ছে দরোয়ান। মন যত strong (শক্ত) হবে ততই ভাল। ইন্দ্রিয়কে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়, যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক পথে চলে। খুব struggle (লড়াই) কর! কি করছো তোমরা? গেরুয়া নিয়ে সংসার

ত্যাগ কর্‌লেই কি সব হয়ে গেল, কি হয়েছে তোমাদের ? সময় শুধু চলে যাচ্ছে আর এক মুহূর্ত্তও waste ( নষ্ট ) কোরো না। খুব জোর আর তিন চার বৎসর কিছু কর্‌তে পারবে। তারপর শরীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয় ? তোমরা ভাবছো যে আগে অনুরাগ বিশ্বাস ভক্তি হোক্ তারপর ডাক্‌বো। তা কি কখনও হয় ? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে ? তিনি এলেই তবে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আস্‌বে। তাঁকে আনবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয় ? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন—'তপঃ, তপঃ, তপঃ,' দেখছো না অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত খাটতে হয়েছে ! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে ? বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, এঁদেরও কত তপস্যা কর্‌তে হয়েছিল। কি ত্যাগ ! কি তপস্যা ! বিশ্বাস কি প্রথমে হয় ? Realization ( অনুভূতি ) হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু, মহাপুরুষ এঁদের বাক্যে বিশ্বাস—blind faith ( অন্ধ-বিশ্বাস ) করে তবে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জানো তো ? স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জলের জন্য ঝিনুক হাঁ করে থাকে। ফোঁটাটা পেলে অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরী করে। তেমনি তোমরাও কাজে লেগে যাও, ডুবে যাও।

"তোমাদের একটা self-reliance ( আত্মনির্ভরতা ) নেই। সাধন-পথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর, চারটে বছর অন্ততঃ করে দেখ দেখি ; যদি কিছু না হয়, তখন আমার গালে চড় মেরো। রজঃ তমো ছাড়িয়ে সত্ত্বে না যেতে পারলে ধ্যান জপ কিছুই হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে, আর আস্‌তে না হয়। মানুষ-জন্ম কত দুর্লভ, অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। মানুষ-জন্মে ভগবান লাভ কর্‌তে হবে—এই জ্ঞান হয়। এই জন্মে খেটে খুটে এমন অবস্থায় যাও যেন আর আস্‌তে না হয়। মনটাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে

তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সবই তাঁর। কিছু calculate কোরো না, ( খতিও না )। Self-surrender ( আত্ম-সমর্পণ ) কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো সব হয়ে গেল। সেটার জন্য খুব struggle ( লড়াই ) কর্‌তে হয়।

"অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের জীবন বড় জোর একশ বছর। যদি eternal happiness (অনন্ত সুখ) চাও তো একশ বছরের সুখ ছেড়ে দাও।"

১২।২।২১—কাশীধাম

শ্রীশ্রীমহারাজ, যতীশ্বরানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "Work and worship ( কর্ম্ম ও পূজা ) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হয়। কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকৃতে পার্‌লে ভাল, কিন্তু ক'জন তা পারে? অজগর-বৃত্তি নিয়ে থাকা এক idiot ( বোকা ) কর্‌তে পারে, যার brain ( মস্তিষ্ক ) খাটাবার শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে আছে। আর এক মহাপুরুষেরাই পারেন, যাঁরা কর্ম্মের পারে; গীতাতেও আছে—কর্ম্ম না করে জ্ঞান লাভ হয় না। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ভজন করে, তাদের ঝুপড়ি বাঁধতে, আর রান্না কর্‌তে সময় কেটে যায়—দেখ্‌ছি তো? কর্ম্ম—ঠাকুর-স্বামিজীর, এই ভাব নিয়ে কাজ করলে কোনও বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে ( সাহায্যে ) spiritual ( আধ্যাত্মিক ), moral ( নৈতিক ), intellectual ( মানসিক ) সব রকম উন্নতি হবে। সব তাঁদের পায়ে অর্পণ কর; শরীর মন সব তাঁদের দিয়ে দাও, তাঁদের গোলাম হয়ে যাও। বল, 'এই তোমাদের দিয়ে দিলাম, এর দ্বারা যা করাবার কর। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, কর্‌বার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।' তখন তোমার ভার তাঁদের উপর। তোমাকে নিজে কিছু কর্‌তে হবে না। ঠিক্ ঠিক্ এইটি করা চাই। নইলে 'রাম বল্‌বে আবার কাপড়ও তুলবে' তা হলে চল্‌বে না।

"আমরাও পাঁচ ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর আবার কাজে লাগি। স্বামিজী আমাকে ডেকে বল্‌লেন, 'ওরে ওতে কিছু নেই, কাজ কর্।

আমরাও তো তখন সব রকম কাজ করেছি। কই তাতে তো কিছু খারাপ হয়েছি বলে বুঝ্তে পারি নি। আমাদের স্বামিজীর কথায় একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোমরাও এই দুই মহাপুরুষের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে চলে যাও, কিছু ভয় নেই। একটাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। কত লোক এর পর ভাংচি দেবে—ও আবার ঠাকুর স্বামিজীর কাজ কি ? কারুর কথা শুনবে না। জগৎ যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও ছাড়বে না যেটা পাকা করে ধরেছ।

"Work ( কাজ ) ও worship ( পূজা ) এক সঙ্গে কর্‌তে দু চার বার্ না পারলেই ছেড়ে দেবে কেন ? বার্ বার্ চেষ্টা কর্‌তে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে, সাত বার্ পড়ে যায়। তবুও ছাড়ে না, শেষে দৌড়তে শেখে।' কর্ম্মের মধ্যে থাকলে মনের একটা training ( শিক্ষা ) হয়। তখন সেই মনকে সাধন ভজনেও বেশ সহজে লাগাতে পারা যায়। নইলে ভাসা ভাসা রাখলে সাধন ভজনে লাগাবার সময়ও সেই মত হয়। একটা সময় আসে যখন সব কাজ ছেড়ে শুধু জপ ধ্যান নিয়ে থাক্‌তে হয়, তখন কাজ ছুটে যায়। মন যখন জাগা থাকে, তখন ঐটে হয় নতুবা জোর করে কর্‌তে গেলে দু চার দিন ভাল লাগে, তার পরেই monotony ( একঘেয়ে ভাব ) আসে। কেউ কেউ হয় তো পাগল হয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা খুব শক্তিও হয়। একটা লোক পঁচিশটা লোকের কাজ কর্‌তে পারে। আগেকার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মের মধ্যে কতকগুলি কাজ ছিল—জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, তীর্থ ভ্রমণ, সৎসঙ্গ ; এর মধ্যে নিজের কিসে ভাল হবে সবাই কি তা জানতে পারে ? সেইজন্য গুরু,- সাধু, মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হয়। তোমাদের পুরা freedom ( স্বাধীনতা ) দিচ্ছি, কর দিকি। কদিন সে ভাবে চল্‌তে পার ? দু চার দিন। মন এখন কাঁচা বলে, trained নয় বলে এত গোল হচ্ছে।

"আড্ডার মত শত্রু আর নেই, ওতে একেবারে ruin ( ধ্বংস ) এনে দেয়। নির্জ্জন বাস না কর্‌লে মনের workings ( গতি ) বুঝতে পারা যায় না। নানা রকম হট্টগোলের মধ্যে থাক্‌লে ভাবের development

(বিকাশ) হওয়া ভারী শক্ত। হিমালয়ের মত জায়গা আছে? কি নির্জ্জন, কি পবিত্র হাওয়া, শিবের স্থান; সেখানে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। আমি সকলকে freedom (স্বাধীনতা) দেই। নিজের নিজের ভাবে এগিয়ে যাক্। যেখানে বাধবে যেন জিজ্ঞাসা করে নেয়। একটা জায়গায় ঠাকুর-স্বামিজীর কাজ নিয়ে থাক্‌লে সব রকমে ভাল। এখানে বেশী দিন থাক্‌লে হয় তো তোমাদের মনে হতে পারে—কিছু করি না, বসে বসে খাবো! আমরা যখন কাজ করতাম তখন যেমন শরীর মন থাক্‌তো, আর তারপর কাজ ছেড়ে দিয়ে যে অবস্থা, এ দুটো তুলনা কর্‌লে আগেকারটাই ভাল বোধ হয়। এ আমাদের ভেতরকার কথা বল্‌ছি। লোকে মনে করে, এরা কাজ না করে থাকে—যেমন আমি, একটা স্থূল উদাহরণে বল্‌ছি—তেমনি আমরাও থাকবো না কেন? ওরকম বুদ্ধি কখনো কোরো না। অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে। দুচারটা জীবন না হয় তাঁদের কাজেই দিয়ে দিলে। ভুলও যদি হয় তো না হয় দুচারটে জন্ম গেলই, কিন্তু তা হয় না। তাঁদের কৃপায় দেখ্‌বে হাউয়ের মত কোথায় উঠে যাবে। ওরকম করে আলগা দিয়ে আর কাটিয়ো না। ল্যাদাড়ে সাধন ভজনে হবে না; যেটুকু কাজ করবে, ষোল আনা মন দিয়ে করবে—এই হলো কাজের secret (কৌশল), স্বামিজীও আমাদের তাই বল্‌তেন। লেগে যাও, কাজে বস্‌বার সময় একবার প্রণাম করবে। কর্‌তে কর্‌তে মাঝে মাঝে interval (সময়) পেলে স্মরণ কর্‌বে, আবার কাজ শেষ করে প্রণাম কর্‌বে। তাঁদের কথা, তাঁদের উপদেশ, আজ্ঞা, এই সব চিন্তা করেই দিন কাটাবে। অমুক কিছু বল্‌লে মনে কর্‌বে—বড় ভাই দুটো বকেছে। সব এক পরিবারের লোক; ভায়ে ভায়ে যেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, তেমনি কর্‌বে। অমুকও যেমন আমার আপনার, তুমিও তাই, সেই রকম সব।"

অন্য একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, "মনকে শান্ত রাখতে হবে। Emotionএর (ভাবপ্রবণতার) প্রশ্রয় না দিয়ে স্থির ভাবে মনকে প্রশান্ত কর্‌তে হবে। নতুবা

reaction ( প্রতিক্রিয়া ) সামলান যায় না, ফল খারাপ হয়। জপ ধ্যানের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলো আপনিই সব নত হয়ে আসে, কিন্তু প্রথমে কতকটা তাদিকে বশে রাখবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, ঐটেই দরকার। জপ, ধ্যান এক sittingএ ( একাসনে ) অনেকক্ষণ কর্‌তে হয়। প্রথম—দিনের মধ্যে চার পাঁচবার বসবার অভ্যাস ভাল। মন লাগুক বা, না লাগুক জপ করে যাওয়া উচিত; কারণ বসতে বসতে হয় তো আবার একাগ্র হবে—হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ শান্ত ভাবটার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও জপ, ধ্যান করে যাওয়া ভাল। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে থাকে। তখন মনেও হয় না ওসব আছে কি-না। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা।' বাহিরে কিছুই নাই, সব ভিতরে। বাহিরের গান কিছু নয়, ভিতরে এমন সুন্দর গান শোনা যায়, যেন সব জুড়িয়ে যায়। প্রণব ধ্বনি, দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদ এসব কেউ কেউ শুনতে পায়। ঠাকুর পঞ্চবটীতে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে শুনেছিলেন বীণার ধ্বনি।

"ভগবানকে বিশাল ভাবে ভাবতে হয়। তাই বিশাল জিনিষ—হিমালয় পাহাড়, কি সমুদ্র, এই সব দেখে সেই বিশাল ভাবটা আনবার চেষ্টা কর্‌তে হয়; না হয় আকাশ।"

---

# জন্মান্তর ও পতঞ্জলি

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ ॥ ২ পা, ১৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—যদি মনে সংস্কারের মূল থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ুঃ ও সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়। ( রাজযোগ )

ভাষ্যতাৎপর্য্য।—চিত্তভূমিতে যদি ক্লেশ ( অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ) থাকে তাহা হইলে কর্ম্মাশয় ( ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার )

বিপাক ( পরিণাম ) হয়। ক্লেশ-মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয় না। চাউল তুষের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও অঙ্কুর উৎপাদন করে। কেন না উহা তুষের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও উহার বিমোক বা বীজ-শক্তি নষ্ট হয় নাই। সেইরূপ ক্লেশরূপ বীজ-শক্তি প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা নাশ না করিতে পারিলে কর্ম্মাশয় অদৃষ্ট ফল জননে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবিপাক ( কর্ম্মফল ) তিন প্রকার—(১) জাতি—মনুষ্য, দেব, পশু প্রভৃতি জন্ম, (২) আয়ুঃ—জীবন ধারণের নির্দ্দিষ্ট সময় এবং (৩) ভোগ—বিবিধ সুখ এবং দুঃখ।

পূর্ব্বপক্ষ—(১) ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ একটি কর্ম্ম কি একটি জন্মের কারণ? অথবা (২) একটি কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? অথবা (৩) অনেক কর্ম্ম কি অনেক জন্মের কারণ? কিংবা (৪) অনেক কর্ম্ম একটি জন্মের কারণ হয়?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—(১) একটি কর্ম্ম একটি জন্মের কারণ এরূপ বলা যায় না। কারণ অনাদি কাল সঞ্চিত জন্মান্তরের অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম্ম এবং বর্ত্তমান শরীরে যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহাদের ফলক্রমের কোন নিয়ম নাই; অর্থাৎ কোনটির পর কোন্‌টি ফলপ্রসূ হইবে তাহার স্থিরতা না থাকায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন হেতু থাকে না। কি জানি যদি সারাজীবন ধর্ম্মপালন করিয়া একটি অসৎ কর্ম্মের ফলে আর একটি নীচগতি প্রাপ্ত হইতে হয়? এবং সেই নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া আবার আর একটি অসৎ কর্ম্মফলে আর একটি নীচগতি হইতে পারে এবং এইরূপে সৎ কর্ম্ম ফলিবার অবসর নাও হইতে পারে।

(২) একটি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না। কারণ, অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে যদি একটি, অনেক কর্ম্মের কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম্মের বিপাক বা ফল ফলিবার অবসরই ঘটিয়া উঠিবে না।

(৩) অনেকগুলি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ তাহাও বলা চলে না। কারণ, ইহাতেও একই দোষ হয়। অনেক জন্ম এক সময়ে হইতে পারে না, পর পর হইতে হইবে, অতএব সকল কর্ম্মের বিপাক হওয়া

অসম্ভব। মনে কর, বিগত জন্মের দশটি কর্ম্ম পর পর সাতটি জন্মের সৃষ্টি করিল এবং সাতটি জন্মের প্রথম জন্মের কৃত নূতন দশটি কর্ম্ম করে অপর সাতটি জন্মের সৃষ্টি করিবে? এই জন্য কতকগুলি কর্ম্ম একত্রে বহু জন্মের সৃষ্টি করিতে পারে না।

অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তীকাল যাহাকে জীবন বলে, যে কালে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কর্ম্ম প্রধান বা অপ্রধান ভাবে চিত্তে—অবস্থান করে। পরে মৃত্যুর পর উহার অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ ফল-জননে অভিমুখী হইয়া জন্ম প্রভৃতি কার্য্য জন্মাইতে বহু কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া একটি জন্ম সম্পাদন করে। এই কালে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা অভিভূত থাকে। এবং ঐ প্রারব্ধকর্ম্ম স্বজাতীয় অনেক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া একটি জন্ম উৎপন্ন হয়। এরূপ হইলে আর দোষ হয় না, যেমন এক এক জন্মে অনেক কর্ম্ম উৎপন্ন হয় তেমনি একটি জন্মদ্বারাও অনেক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এবং যে কর্ম্মসমষ্টি মনুষ্যাদিরূপ জাতি নির্ণয় করে তাহারাই জীবের আয়ুঃ ও সুখদুঃখ ভোগের নির্ণয় করে। উক্ত কর্ম্মসমষ্টি জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগের কারণ বলিয়া ত্রিবিপাক নামে কথিত হয়। একটি জন্মের কারণ বলিয়া একভবিক নামেও পরিচিত। দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় মাত্র ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক বিপাকারম্ভক বলে। আয়ুঃ ও ভোগের হেতু হইলে দ্বিবিপাকারম্ভক হয়। সর্ব্বাবয়বে গ্রন্থি-যুক্ত মৎস্যজালের ন্যায় চিত্ত অনাদি কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। অসংখ্য জন্মের অসংখ্য বাসনা চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মের দ্বারা ঐ একভবিক কর্ম্মাশয়ের কখন নিয়ত বিপাক ও কখন অনিয়ত বিপাক ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম্মের পরিণামের সময় অবধারিত থাকে এবং কতকগুলির পরিণাম কি ভাবে হইবে তাহা সঠিক বলা যায় না।

তবে দৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়-নিয়ত-বিপাক-কর্ম্মাশয় অর্থাৎ এই জন্মেই যে সকল কর্ম্মের পরিণামের সময় জানা যায় তাহাদিগকে একভবিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়-অনিয়ত-বিপাক-কর্ম্মাশয়ের

অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের পরিণাম এই জন্মে হইবে না এবং পারিণামের সময়ও যখন ঠিক নাই তখন তাহারা একভবিক হইবে এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। কেন না—

(১) ঐরূপ কর্ম্মাশয় বিপাক বা পরিণাম না জন্মাইয়া কৃত কর্ম্মাশয়ের নাশ হইতে পারে।

(২) কর্ম্মাশয়ের প্রধান কর্ম্ম বিপাক সময়ে আবাপগমন অর্থাৎ যাগাদি প্রধান কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ বিপাক হইবার সময় হিংসাদিকৃত অধর্ম্মও কিঞ্চিৎ দুঃখ জন্মাইতে পারে।

(৩) নিয়ত-বিপাক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালে ফলবান হইবে এইরূপ প্রধান কর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল একইরূপ থাকিয়া যাইতে পারে।

উদাহরণ—

(১) কর্ম্মাশয় পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াই শুক্লকর্ম্ম অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা নাশকরা যায়। পাপ ও পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মও নাশ হইতে পারে। এ বিষয়ে শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন, "পাপচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্মরাশি দুই প্রকার। একটি কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্ম্ম, অপরটি শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত, এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই পুণ্যদ্বারা গঠিত একটি কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুকৃত শুক্ল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পণ্ডিতগণ ইহ-জন্মেই তোমার কর্ম্ম নাশের বিধান করিয়াছেন।"

(২) কর্ম্মাশয়ের প্রধান কর্ম্মের দ্বারা লোকের যখন অবাপগমন অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা যখন স্বর্গাদি ফল ফলে, তখন যজ্ঞ করিতে গিয়া যে পশুহিংসাদি করিতে হয় তজ্জনিত যে অল্প মাত্র পাপ (অবিশুদ্ধি), ঐ প্রধান কর্ম্মের সহিত সঙ্কর বা মিশ্রিত হইয়া স্বর্গাদি লোকে গিয়া দুঃখ জন্মাইতে পারে। কিন্তু ঐ পাপকে সপরিহার অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ করিতে পারা যায়। যদি সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করা হয় তবে জীবনের প্রধান কর্ম্ম যে যজ্ঞাদি তাহার ফলে যে অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) হয় সেই কালে ঐ ক্ষুদ্র

হিংসাজনিত পাপ অনর্থ বা দুঃখ জন্মায়। তবে তাঁহারা বলেন যে, ঐ স্বর্গরূপ সুখ-সমুদ্রে ঐ দুঃখরূপ বহ্নি-কণিকা সহজেই সহ্য করা যায়।

(৩) কর্ম্মাশয়ে যদিও অনন্ত কর্ম্ম রহিয়াছে কিন্তু নিয়ত-বিপাক অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল ফলিবার সময় হইয়াছে এইরূপ ক্ষুদ্র কর্ম্মসকলকে প্রধান-কর্ম্ম বহুকালের জন্য অভিভূত বা দাবাইয়া রাখিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—(১) অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় (যে কর্ম্মের ফল এ জন্মে দেখা যায় না) নিয়ত-বিপাক-কর্ম্ম (যাহা পর-জীবনে ফল প্রদানের উপযোগী হইয়াছে) সকল মৃত্যুর পর অভিব্যক্ত হয়, ২) অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়-অনিয়ত-বিপাক-কর্ম্ম (যাহা পরজীবনেও ফলোন্মুখ হইবে না) সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে বা পরজন্মে প্রধান কর্ম্মের সহিত অবাপগমন (সহায়কভাবে অবস্থান) করিতে পারে, অথবা প্রধান-কর্ম্ম বহুকালের জন্য তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতেও পারে, যতদিন না প্রধান কর্ম্মের শক্তিক্ষয় হয় এবং ঐ সকল অনিয়ত ক্ষুদ্র কর্ম্মের স্বজাতীয় কর্ম্ম সকল উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলবান করিয়া না তুলে। সেই জন্য এই সকল অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়-অনিয়ত-কর্ম্মসকলের দেশকাল নিমিত্তের স্থিরতা নাই এবং এই হেতুই কর্ম্মবাদকে বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। "অপবাদ বিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে" —সামান্যবিধি বিশেষবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রবৃত্ত হয়। অপবাদ (বিশেষ কর্ম্ম) উৎসর্গকে (সামান্য কর্ম্ম) অতিক্রম করিতে পারে না। সারাজীবন অসদ্‌ভাবে কাটাইয়া (উৎসর্গ) একটি সৎ কর্ম্মের দ্বারা (অপবাদ) স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু ভগবান বলিতেছেন, "অতি অল্প মাত্রও মোক্ষ-চেষ্টা মানুষকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।"

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ২, পা, ১৪ সূ ॥

সূত্রার্থঃ—পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল আনন্দ ও দুঃখ। (রাজযোগ)

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ পুণ্যদ্বারা সাধিত হইলে সুখের হেতু হয় এবং পাপের দ্বারা সম্পাদিত হইলে দুঃখের হেতু হয়।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ পা ৪, সূ ৮॥

সূত্রার্থ:—এই ত্রিবিধ-কর্ম্ম (শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ) হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যে গুলি (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ) সেই অবস্থায় প্রকাশ হইবার উপযুক্ত। অপরগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিত ভাবে থাকে। (রাজযোগ)

স্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যা।—মনে কর, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন প্রকার কর্ম্মই করিলাম। তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্যদেহের ও দেবদেহের বাসনা একরূপ নহে। দেব-শরীর ভোজন, পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত-কর্ম্ম আহার ও পানের বাসনা সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে। অবশিষ্ট-গুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব-বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভবাসনাগুলিই প্রকাশ পাইবে, কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। যদি আমি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব-বাসনাগুলিই আসিবে। শুভবাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি দেখাই-তেছে? ইহাতে ইহাই দেখাইতেছে যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাসনাগুলিকেও দমন করা যায়। কেবল যে কর্ম্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের অনুকূল অবস্থা কর্ম্মকেও দমন করিতে পারে।

জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়ো-
রেকরূপত্বাৎ ॥ পা ৪, সূত্র ৯॥

সূত্রার্থ:—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য্য হইবে।

ভাষ্যতাৎপর্য্য।—বৃষদংশ ( মার্জ্জার ) রূপ-বিপাক অর্থাৎ মার্জ্জার-জন্ম ও সেই জন্মের আয়ুঃ ও ভোগের প্রেরক যে-বিগত জন্মের অদৃষ্ট কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মসমষ্টি তাহা নিজ কারণদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। বলিতে পার, জীবের পূর্ব্ব বিড়াল জন্ম, পর পর অসংখ্য জাতি, বহুদূরদেশ ও অসংখ্য কল্পের দ্বারা, ব্যবহিত রহিয়াছে, তখন বর্ত্তমান বিড়াল জন্মে তাহার অতীত বিড়াল জীবনের সংস্কার কি করিয়া স্মরণ হইতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা বলি ইহ-জন্মের বহুদিনের পূর্ব্ব-সংস্কার যেমন অবস্থা-নুরূপ সুযোগ পাইলেই জাগিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ সকল সংস্কারের ক্রম ( আনন্তর্য্য ) কদাপি নষ্ট হয় না।

স্মৃতি ও সংস্কার একই জিনিষ। সংস্কার অনুভব হইতে হয়। অনুভূতি সকলই সংস্কার রূপে থাকে। এই সংস্কার চিত্তরূপ অজ্ঞান ভূমিতে ( Subconscious Region ) সঞ্চিত থাকে, বাহ্য-ব্যাপারের ( Environment ) সংঘর্ষে চিত্তের স্মরণাত্মিকা শক্তি ( Memory ) তাহাকে জ্ঞান ভূমিতে ( Conscious Plane or Plane of Ego ) তুলিয়া আনে তখন উহাকে স্মৃতি বলে। এই সংস্কার সকল কর্ম্মবাসনা বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট কারণের সমান। কর্ম্মবাসনা যেমন শীঘ্র বা অতি দীর্ঘকাল পরে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগসৃষ্টি করে, সংস্কারও ঠিক তেমনি শীঘ্র বা দীর্ঘকাল পরে স্মৃতি জন্মাইতে পারে। ইহারা অসংখ্য জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও স্মৃতির সহিত ইহাদের পারম্পর্য্য নষ্ট হয় না।

### জন্মকারণ বাসনা ও তাহার নিবৃত্তি

পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ॥ ২ পা, ১৫ সূ॥

সূত্রার্থ :—প্রত্যেক বস্তুতে হয় পরিণাম কালে, নয় ভোগ-কালে দুঃখ কিংবা ভোগ ব্যাঘাতের আশঙ্কায়, অথবা উহার সংস্কার জন্য ভবিষ্যদ্দুঃখের প্রসবকারী বলিয়া গুণবৃত্তি, ( অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়া ) বিবেকীর নিকট সবই দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। ( রাজযোগ )

ভাষ্য-তাৎপর্য্য।—যোগীর পক্ষে সবই দুঃখ-স্বরূপ; কেন না আসক্তি কামনা (রাগ) হইতে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপায়দ্বারা সুখের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব এই রাগই কর্ম্মাশয় সৃষ্টি করে। প্রাণীর পীড়ন না করিয়া উপভোগ অসম্ভব, সেই জন্য শারীরিক, মানসিক ও বাচিক হিংসাদ্বারা কর্ম্মাশয় সৃষ্টি হয়। বিষয়সুখই অবিদ্যা। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া যখন তৃপ্তি আসে তখন ভোগ্যবস্তু হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি হয়—ইন্দ্রিয়ের এই উপশান্তিকে সুখ বলে। ইন্দ্রিয় যখন প্রবৃত্তি বশতঃ চঞ্চল হয় তাহাকে অশান্তি বা দুঃখ বলে। বিষয় কোটীবার ভোগ করিয়াও একেবারে তৃপ্তি আসে না। ভোগের অভ্যাস বা অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্ণ্য সম্ভব নয় বরং উহাতে অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার নানা কৌশল ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়; অতএব ভোগানুশীলন সুখের কারণ নহে। বৃশ্চিকের ভয়ে যেমন লোকে সাপের মুখে পড়ে তেমনি লোকে এক ভোগ হইতে অপর ভোগ চরিতার্থ করিতে গিয়া মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুখভোগ কালেও যোগীরা তাপ ভোগ করেন। আহার্য্য আসিয়াছে, কিন্তু অপরে খাইতে পাইতেছে না বলিয়া আহার কালেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

সুখের উপায় খুঁজিতে গিয়া শরীর, বাক্ ও চিত্তদ্বারা নানা কার্য্য করিতে হয়; ইহাতে অপরের প্রতি অনুগ্রহ নিগ্রহ উভয়ই সম্ভব; এই পরানুগ্রহ ও পরপীড়নদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় হয়; এই সঞ্চিত কর্ম্মাশয় মোহবশতঃ হইয়া থাকে—ইহাকেই তাপ-দুঃখ বলা যায়। সুখানুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহাকে সুখ-সংস্কার এবং দুঃখানুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহাকে দুঃখ-সংস্কার বলে। সুখ এবং দুঃখের অনুভব হইতে উভয়বিধ সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে রাগ বা দ্বেষ, এই দুইটি হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মে, তাহা হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় জন্মে, উহা হইতে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক, পরে পুনরায় সংস্কারের জন্ম হইতে থাকে। এই সন্তান প্রবাহ দেখিয়া যোগীরা কোন বিষয়েই সুখপান না। যোগীদের

হৃদয় অক্ষিপাত্রের ন্যায় কোমল ( sensitive )। সামান্য কারণে অশান্তি ভোগ করেন। যেমন উর্ণাতন্তু ( মাকড়সার জাল ) চক্ষে পড়িলে পীড়া দায়ক হয় কিন্তু হস্তপদে পড়িলে কোনও অনুভূতিই হয় না। কাহারও কষাঘাতেও কিছুই হয় না, কেহ একটি কথায় মরমে মরিয়া যায়। সামান্য কারণে সাধারণ লোকের কোনও কষ্ট হয় না। তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফল সুখ দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ করে আবার পুনবায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। অনাদি সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাইয়াও বাহ্যবস্তুতে অহংকার মমতাব বুদ্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখদ্বারা অভিভূত হয় ও পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ সকল পরস্পরের সাহায্য করিয়া শান্ত, ঘোর ও মূঢ় বা সুখ দুঃখ মোহরূপ জ্ঞান জন্মায়। সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ হইলেও রজঃ ও তমোকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না—যে হেতু অমিশ্র, নির্ম্মল বৈষয়িক সুখ হইতে পারে না। গুণের স্বভাব পরিণাম, সুতরাং তৎকার্য্য বুদ্ধিরও পরিণাম ঘটে। বিষয়াকারে বুদ্ধির প্রতিক্ষণ বৃত্তিরূপে পরিণাম ঘটিতেছে। রূপাতিশয় ( ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য ) ও বৃত্তি-অতিশয় ( সুখ, দুঃখ ও মোহ ) ইহারা পরস্পর বিরোধী—একটি অপরটির সময় হইতে পারে না। অধর্ম্ম যখন অভিব্যক্ত হয় তখন ধর্ম্ম অভিভূত হয়। যখন সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য অতিশয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয় তখনও রজঃ ও তমঃ সামান্যরূপে ( কারণরূপ ) তাহাতে অনুস্যূত থাকে। সেই জন্য, একে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সুখ, দুঃখরূপ মোহজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া সকলেই সকলরূপ। কেবল আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে ইহা সুখ, ইহা দুঃখ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই জন্য যোগী উভয়কেই দুঃখরূপে দেখেন।

দুঃখের কারণ অবিদ্যা। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য ( প্রতীকার ) ও ভৈষজ্য ( ঔষধ ) এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি

অধ্যায়ে বিভক্ত। সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখ-প্রচুর সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য; হেয় সংসারের হেতু প্রধান ও পুরুষের সংযোগ; উক্ত সংযোগ ও তাহার কার্য্য দুঃখাদিরূপ সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম হান; হানের উপায় সম্যগ্‌দর্শন বা প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক। হান কর্ত্তা যে পুরুষ তিনি মুক্তিরই স্বরূপ। তাঁহাকে ত্যাগ বা তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিলে শূন্যবাদ হয়। যদি বলা যায় 'তিনি মুক্তিলাভ বা গ্রহণ করেন', এরূপ বলিলে হেতুবাদ হইয়া পড়ে; মুক্তি জন্য-পদার্থ হওয়ায় পুরুষের স্বরূপ যে মুক্তি তাহাও নশ্বর হইয়া পড়ে। এই জন্য হেয় ও হেয়-হেতু নিরাস করিলে পুরুষের শাশ্বতত্ব বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই সম্যগ্‌দর্শন।

—বাসুদেবানন্দ।

---

# সৃষ্টি

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, ৫ই মার্চ্চ তারিখে ফ্রান্স দেশীয় গণিতজ্ঞ লাপ্লাস দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষবাণী, আমরা যাহা জানি তাহা অতি অল্প এবং আমরা যাহা জানি না তাহার পরিমাণ হয় না, "What we know is but little and what we do not know is immense."

লাপ্লাস-ই সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তাঁহার নীহারিকা বাদ ( Nebular theory ) হইতে আমরা এই বিষয়ে অনেক জানিতে পারি। লাপ্লাস লক্ষ্য করিলেন যে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় সকল গ্রহই একই নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘোরে। গ্রহ সকল নিজেদের মেরুদণ্ডে ( axis ) ঐ একই দিকে ঘুরিয়া থাকে। উপগ্রহদের ( satellites ) সম্বন্ধে ঐ একই কথা। তিনি

আরও দেখিতে পাইলেন, সূর্য্যও তাহার মেরুদণ্ডে ঠিক একই দিকে ঘোরে। তিনি চিন্তা করিলেন, এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক সমানতা কোন দৈবাৎ ঘটনা নয়, নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে।

বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখা যাউক। প্রথমে আমরা সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কথা আলোচনা করিব। পৃথিবী এক নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই একই দিকে নিজের মেরুদণ্ডে ঘোরে। চন্দ্রও প্রতি ২৯½ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘোরে। সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডে সেই একই দিকে ঘোরে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যতে সর্ব্বশুদ্ধ একই দিকে পাঁচটি বিভিন্ন গতি আছে। একটি পয়সা যদি পাঁচবার ছুড়িয়া ফেলা যায় এবং প্রত্যেকবারই যদি রাজার ছাপ বা অন্যদিক মাটির উপরে পড়ে, তাহা হইলে যেমন আশ্চর্য্যজনক হয়, ইহা কি তদপেক্ষা কম? অনুমান-শাস্ত্র ( Theory of Probability ) অনুসারে এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা মোটের উপর ষোল ভাগের মধ্যে এক ভাগ মাত্র।

সকলেই জানেন, সৌরজগতে উপরি উক্ত তিনটি ব্যতীত আরও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে, যথা—বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র এবং এই সঙ্গে তাহাদের উপগ্রহদের কথাও মনে রাখিতে হইবে। লাপ্লাসের সময়ে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য পাঁচটি গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে এবং নিজেদের মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘুরিতেছে, ইহাতে আমরা বারোবার ভিন্ন গতির হিসাব পাই। সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডে, চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ও নিজের মেরুদণ্ডে ঘোরে। ইহাতে আরও তিনটি গতির হিসাব পাই। ইহা ব্যতীত গ্রহদের সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটি উপগ্রহ আছে বলিয়া লাপ্লাসের সময়ে জানা ছিল, ইহারা সকলে ঐ একদিকে গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু ইহারা নিজেদের মেরুদণ্ডে ঘোরে কি-না, তাহা

অত্যন্ত দূরত্ব হেতু নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। যাহা হউক আমরা ত্রিশটি বিভিন্ন একই দিকে ঘূর্ণ্যমান গতির কথা জানিতে পারিলাম। অনুমান-শাস্ত্র ( Theory of Probability ) হইতে আমরা জানিতে পারি এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা পঞ্চাশ কোটীর মধ্যে একবার মাত্র। লাপ্লাস মনে করিলেন এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোন কারণ লুক্কায়িত আছে এবং তিনি ইহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। লাপ্লাস ইহার প্রাকৃতিক কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; তাঁহার এই উদ্যমের ফল হইতেছে নীহারিকা-বাদ ( Nebular theory )। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সূর্য্য ও গ্রহ-উপগ্রহ-সৃষ্টি সম্বন্ধে এমন এক ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন যাহাতে সকলের একই দিকে গতি সহজে বুঝা যাইতে পারে।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ এবং উপগ্রহ সকল লৌহ ও অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে লৌহ ও অন্যান্য দ্রব্য খুব উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পীয় আকারে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া নীহারিকা-রূপে ( Nebular matter ) বিদ্যমান ছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, কারণ এখনও দূরবীক্ষণের সাহায্যে এইরূপ বাষ্পীয় জিনিষ দেখা যায়, যেমন অরিয়ণের প্রধান নীহারিকা ( Great Nebula at Orion )। ঐ প্রকার বাষ্পীয় জিনিষের নিশ্চয় একটি ঘূর্ণ্যমান গতি ছিল। কালক্রমে ইহার উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া যাওয়াতে ইহা জমাট বাঁধিতে লাগিল, ইহার অধিকাংশ কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বস্তুর সৃষ্টি করিল এবং অবশিষ্ট ইহার চতুর্দ্দিকে বাষ্পীয় অবস্থায় রহিল। কালক্রমে তাহাও অন্যান্য ছোট কেন্দ্রের চারিদিকে জমাট বাঁধিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত ঠাণ্ডা হইবার ফলে নীহারিকা একটি সুবৃহৎ বস্তুর চারিদিকে অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তুর আকার ধারণ করিল। নীহারিকার পূর্ব্বেই ঘূর্ণ্যমান গতি ছিল এবং এই কারণে কেন্দ্রস্থিত সুবৃহৎ বস্তুও নিজের মেরুদণ্ডে ঘুরিতে লাগিল এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তুও কেন্দ্র-স্থিত বস্তুর চারিদিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মেরুদণ্ডে ঘুরিতে

লাগিল। এই সমস্ত ঘূর্ণ্যমান গতি একই দিকে হইবে। এইরূপে সূর্য্য ও গ্রহের সৃষ্টি হইল এবং উপগ্রহেরাও গ্রহের ন্যায় সৃষ্ট হইল। এইরূপে লাপ্লাস তাঁহার নীহারিকা-বাদের ( Nebular theory ) সাহায্যে সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রায় একশত বর্ষ হইতে চলিল লাপ্লাস দেহত্যাগ করিয়াছেন; ইহার মধ্যে অনেক নূতন তত্ত্ব আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলে নীহারিকা-বাদের আসন জগৎ সমক্ষে আরও সুদৃঢ় হইয়াছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের কথাই বলিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, উপগ্রহেরা বিভিন্ন গ্রহের চারিদিকে ঘোরে, গ্রহেরা সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, সূর্য্যও আবার এলফা হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নক্ষত্রের চারিদিকে ঘোরে। ইহা স্যার উইলিয়াম হার্শেল আবিষ্কার করেন, তাঁহার আবিষ্কারের প্রণালী অনেকটা এইরূপ;—মনে করুন, নদীতীরে কয়েকহস্ত অন্তরালে দুইটি বাতি জ্বলিতেছে এবং একখানি নৌকা বাতি দুইটির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নৌকা যখন খুব দূরে তখন বাতি দুইটি পাশাপাশি আছে বলিয়া মনে হইবে এবং নৌকা যতই তীরের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই বাতি দুইটির দূরত্ব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া মনে হইবে। হার্শেল এইরূপে দেখাইলেন যে, আমাদের সূর্য্যও অন্য একটি বড় সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দূরবীক্ষণের সাহায্যে নীহারিকা দেখা যায়। অদ্যাবধি ৬০০০ ছয় সহস্রেরও অধিক নীহারিকাপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে স্যার উইলিয়াম হার্শেল এবং তাঁহার পুত্র স্যার জন হার্শেল প্রায় পাঁচ সহস্র নীহারিকামণ্ডলীর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নীহারিকা হইতে কিরূপ ভাবে সৃষ্টি হয় তাহা আমরা এক প্রকার বর্ণনা করিয়াছি। জ্যোতিষীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নীহারিকা হইতেই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন নীহারিকাকে কে সৃষ্টি করিল ?

এই বিশ্ব জগৎ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিয়ত মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক জিন পল ( Jean Paul ) এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটি গল্প রচনা করিয়াছেন, উহা ডি কুইন্সে ( De Quincey ) ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটি এই :—

একদিন ঈশ্বর মৃতের রাজ্য হইতে এক মানবকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার মহিমা দেখ্‌বে, এস।" তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে দেবদূতেরা দাঁড়াইয়াছিল, একজন দেবদূতকে তিনি বলিলেন "এর রক্তমাংস সব দূর করে দাও, ইহার দৃষ্টিশক্তির সংশোধন করে দাও, কেবল মানব-হৃদয়ের—যা দুঃখে কাঁদে ও কিছু মহান্ দেখলে ভয় পায়,—কোন পরিবর্ত্তন করো না।" ঈশ্বরের আদেশ প্রতি-পালিত হইল, এবং মানব একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন দেবদূতকে পথ প্রদর্শক লইয়া ঈশ্বরের সৃষ্টি দর্শনে বহির্গত হইল। অনন্ত অসীম আকাশ। কোথাও সূচীভেদ্য অন্ধকার, কোথাও ক্ষীণ আলোক-রশ্মি, কোথাও গ্রহ উপগ্রহেরা সকলেই ঘূর্ণায়মান, কোথাও কোটী কোটী সূর্য্য দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া প্রচণ্ড বেগে জ্বলিতেছে, কোথাও উষা দেবী নিত্য বিরাজমানা। তাঁহার রাজ্য দেখা গেল, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে কি আছে তাহা আর জানা গেল না। তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ,—যেন স্বর্গের স্তম্ভ, তোরণ সব নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। উচ্চ নিম্ন, নিম্ন উচ্চ, মানবের নিকটে সবই সমান ; উচ্চও অলঙ্ঘ্য, নিম্নও অতল—মানব এবং তাহার দেবদূত অনন্ত অসীম আকাশের মধ্য দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা আরও আশ্চর্য্যজনক, আরও রহস্যপূর্ণ রাজ্যে যাইতেছ।"

ইহাতে মানব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত, সে বলিল—"দেবদূত, আমি আর অধিক দূর যাইব না, এই অনন্তের গাম্ভীর্য্য আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমাকে পুনর্ব্বার মৃতের রাজ্যে লইয়া চল এবং

অসীমের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি দেখিতেছি, এ সৃষ্টির শেষ নাই।" চতুর্দ্দিকস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ যাহারা এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তাহারা সমস্বরে বলিল, "এই ব্যক্তি যথার্থ বলিতেছে, আমরা সৃষ্টির শেষের কোন সংবাদ কখনও পাইলাম না।" দেবদূত গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, সৃষ্টির কোন শেষ নাই? এই দুঃখেই কি তুমি কাঁদিতেছ?" কেহ কোনও উত্তর দিল না। তখন দেবদূত ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ভগবানের সৃষ্টির অন্ত নাই, আরোও দেখ, আদিও নাই।"

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এ, বি-এস সি।

---

# শ্রীনিম্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষ্যম্

( প্রথম অধ্যায়ে—তৃতীয় পাদঃ )

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ সূ ॥

**সূত্রার্থ** :—দ্যু-ভূ-আদি-আয়তনং=দ্যু-ভু-আদির আয়তন ব্রহ্ম; স্বশব্দাৎ=স্ব বা আত্মশব্দ আছে বলিয়া।

বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যানুবাদ :—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং, মনঃ সহ প্রাণৈশ্চসর্ব্বৈস্তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুঃ।" দ্বিতীয় মুণ্ডকে আছে, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই অদ্বয় আত্মাকে অবগত হও, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের সোপান। এখানে দ্যুলোক ভূলোকাদির আশ্রয় যিনি—তিনি ব্রহ্ম, কারণ আত্মশব্দের দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—মুক্তঃ=মুক্তগণ কর্ত্তৃক ; উপসৃপ্য=প্রাপ্য ; ব্যপদেশাৎ =এই উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি বলিয়াছেন, মুক্ত পুরুষগণ ঐ আয়তনকে প্রাপ্ত হন, অতএব উক্ত স্বর্গ এবং পৃথিবীর আয়তন বিশিষ্টপুরুষ ব্রহ্ম।

[ শ্রুতি প্রমাণ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
২স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"
"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ন অনুমানম্=আনুমানিকেরা যাহা বলেন তাহা নহে ; অতৎশব্দাৎ=বেদে এইরূপ না থাকা হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—সাংখ্যস্মৃতির অনুমানগম্য প্রধান ঐ আয়তন পদবাচ্য নহে, কারণ তদ্বোধক কোন শব্দ শ্রুতিতে নাই।

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—প্রাণভৃৎ চ=প্রাণভৃতও নহে।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রাণভৃৎ যে জীবও দ্যুভ্বাদ্যায়তন ( দ্যু+ভূ+আদি +আয়তন ) শব্দের বাচ্য নহে।—কেন ? তাহাও শ্রুতিতে নাই।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ভেদ ব্যপদেশাৎ চ=ভেদের উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি উক্ত আয়তন বিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞেয় এবং জীবকে জ্ঞাতা বলিয়াছেন এই ভেদোপদেশ থাকা হেতু।

প্রকরণাৎ ॥ ৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকরণাৎ = প্রকরণ হইতে ।

ভাষ্যানুবাদ :—দ্যুভ্বাদ্যায়তন বিশিষ্ট আত্মা জীব নহেন কারণ যে প্রকরণে উহা বিচারিত হইয়াছে তাহা পরমাত্মবিষয়ক ।

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—স্থিতি = অসঙ্গরূপে অবস্থান ; অদনং = ভোক্ষণ বা ফল ভোগ । স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ = স্থিতি এবং অদন এই দুই কারণ হেতু ।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ শ্রুতিই "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে দুইটি পক্ষিরূপে জীব ও পরমাত্মার উপদেশ করিয়াছেন । পরমাত্মার অভোক্তৃত্বরূপে স্থিতি এবং জীবাত্মার ফলভোক্তৃরূপ উপদেশ আছে । ইহা হইতেও বুঝা যায় এই আয়তন বিশিষ্ট আত্মা জীব নহেন পরমাত্মা ।

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ :—ভূমা = সর্ব্বব্যাপী ; সম্প্রসাদাৎ = সুষুপ্ত স্থান হইতে ( সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্ ইতি সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তং স্থানং ) ; অধি উপদেশাৎ = উপরে উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া ।

ভাষ্যানুবাদ :—পরমাচার্য্য শ্রীকুমারগণ ( সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার ) আমার গুরু শ্রীমন্নারদকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য"—যাহা ভূমা তাহাই জিজ্ঞাসার বস্তু । এখানে ভূমা অর্থে প্রাণ হইতে পারে না, পরন্তু শ্রীপুরুষোত্তম ।—কেন ? কারণ প্রাণের উপর শ্রুতি ভূমাকে উপদেশ করিয়াছেন । সুষুপ্তিকালে প্রাণই একমাত্র জাগ্রত থাকে, অতএব প্রাণই সুষুপ্তি স্থানীয় । কাজে কাজেই প্রাণের অতীত বলায় সুষুপ্তিরও অতীত বুঝিতে হইবে ।

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ধর্ম্মঃ উপপত্তেঃ চ = ধর্ম্ম উপপত্তি হইতেও ।

ভাষ্যানুবাদ :—নিরতিশয় সুখরূপত্ব, অমৃতত্ব, স্বমহিম প্রতিষ্ঠিতত্ব আদি ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই উপপত্তি হয় এবং পরমাত্মাই ভূমা ।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অক্ষরং = ক্ষয় রহিত ব্রহ্ম, অম্বর অন্তধৃতেঃ = আকাশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যকের অক্ষর শব্দ ব্রহ্মবাচী,—কেন? ত্রিকালে পরিণাম প্রাপ্ত কার্য্য সকলের (পৃথিবী স্বর্গ প্রভৃতি) আধার আকাশও তিনি ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া।

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সা চ = সেই ধৃতি, প্রশাসনাৎ কারণ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রশাসনের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—সেই ধৃতি বা ধারণ পুরুষোত্তমের।—কেন? শ্রুতি সেই আকাশের ধারণকারী অক্ষর সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। অতএব ঐ অক্ষর-শব্দ পরমাত্মবাচী।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অন্যভাব = অক্ষর ব্রহ্ম ইহা ছাড়া অন্যভাব, ব্যাবৃত্তেঃ চ = নিষেধ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—এখানে জীব বা প্রধান অক্ষর শব্দের বাচিরূপে গ্রহণ হয় নাই, পরমাত্মরূপেই হইয়াছে।—কেন? "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"—হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও স্বয়ং মননকর্ত্তা, তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওতপ্রোত রহিয়াছে। এই হেতু ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব নিবারিত হইয়াছে।

ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ঈক্ষতি কর্ম্ম = দেখা ক্রিয়ার কর্ম্ম; সঃ = পরমাত্মা; ব্যপ-দেশাৎ = উপদেশ হেতুও।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে আছে, "ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স......পুরুষমীক্ষতে"—ওঁ এই অক্ষরের দ্বারা অভিহিত পুরুষকে ঈক্ষণ বা দেখা যায় পিপ্পলাদ সত্যকামকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ঈক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম্ম যে পুরুষ তিনি ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ নহেন ;—কেন ? কারণ শ্রুতি তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ম্"—সেই তিনি শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ইত্যাদি ধর্ম্ম পরমাত্মা সম্বন্ধীয়।

দহরউত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—দহর = দহর আকাশ পরমাত্মাই ; উত্তরেভ্যঃ = বাক্যশেষের দ্বারা জানা যায় এই হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ"—এই ব্রহ্মপুরে দেহে যে দহর (ক্ষুদ্র) পদ্মাকার গৃহ আছে। এই শ্রুতি প্রোক্ত দহবাকাশ পরমাত্মা হওয়াই উচিত।—কেন ? উত্তর বা বাক্যশেষ হইতে জানা যায় "যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানেষো অন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো"—এই বাহ্যাকাশ যে পরিমাণ এই দহর আকাশও তৎপরিমাণ। পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়েই ইহার অন্তরে অবস্থিত। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, বিজর। এই সকল পরমাত্মার ধর্ম্ম, সুতরাং দহরাকাশ পরমাত্মাই।

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—গতিশব্দাভ্যাং = গতি শব্দ সকল হইতে, তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ = তাহা ছাড়া আরও (দহর সম্বন্ধে) ব্রহ্ম লিঙ্গ আছে বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদের দহরাকাশ বাক্যে এইরূপ আছে "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যেতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি"—(ছা, ৮, ৩) এই সকল প্রজা প্রতিদিনই (সুষুপ্তিকালে) এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না। এই গতি ও ব্রহ্মলোক শব্দ দ্বারা শ্রুতি বলিতেছেন, পরমাত্মাই দহরাকাশ শব্দ বাচ্য। এই শ্রুতিতে অন্যত্রও সুষুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মে অবস্থানের কথা উল্লেখ আছে।

যথা—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"—হে সোম্য ! তৎকালে (সুষুপ্তি কালে ) জীব ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মলোক কর্ম্মধারয় সমাস, ব্রহ্মই যাহার লিঙ্গ। পরমাত্মা অর্থে ব্রহ্মলোকও শ্রুতিতে আছে, "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।"

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ধৃতেঃ মহিম্নোঃ = ধৃতরূপ মহিমা ; অস্য = দহর আকাশের ; অস্মিন = পরমাত্মাতেই , উপলব্ধেঃ = অন্যত্রও শ্রুতি হইতে বুঝা যায়।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ শ্রুতিতেই আছে, "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানাং"— ছা, ৮, ৪, ১ ) ইনি লোকসকলের বিধারক সেতুস্বরূপ, এই বিধারকত্ব দহর আকাশের পরমাত্মত্বই প্রতিপন্ন করে। এই দহর আকাশের ধৃতিরূপ মহিমার উপলব্ধি পরমাত্মাতেই হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতেও উপলব্ধি হয়, "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।"

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—প্রসিদ্ধেঃ চ = প্রসিদ্ধও আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন, "আকাশো হ বৈ নামরূপ-য়োর্নির্বহিতা সর্ব্বাণি হ বা ইমাণি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ( ছা, ৮, ১৪ )—আকাশ নামরূপের নির্বহিতা, এই ভূতসকল আকাশ হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে বুঝা যায় পরমাত্মাই আকাশ শব্দ বাচ্য। কাজে কাজেই দহরাকাশও পরমাত্মবাচী।

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ইতর পরামর্শাৎ = অন্যরূপ উপদেশ থাকায় ; স = উহা জীব , ইতি চেৎ = যদি এইরূপ বলি ; ন অসম্ভবাৎ = না অসম্ভব।

ভাষ্যানুবাদ :—যেখানে দহর শব্দ আছে, সেই বাক্যের শেষভাগে শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি" ( ছা, ৮, ৩, ৪ )—এই সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা। এখানে

জীবেরও পরামর্শ রহিয়াছে বলিয়া দহর আকাশকে ত জীবও বলিতে পারি? না, বলিতে পার না; কারণ অপহত-পাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম জীবে সম্ভব নয়।

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূ তস্বরূপস্তু ॥ ১৯ সূ ॥

সূত্রার্থ:—উত্তরাৎ চেৎ = ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির শেষ বাক্য হইতে যদি বলি জীবই দহর আকাশ; আবির্ভূত স্বরূপঃ তু = কিন্তু উহা জীবের আবির্ভূত স্বরূপ।

ভাষ্যানুবাদ:—প্রজাপতি ইন্দ্রকে যে শেষ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় জীবেরও "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" এই আটটি গুণ সম্ভব অতএব জীবই দহর পদবাচ্য হউক। কিন্তু এরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে, ঐ গুণগুলি জীবের স্বাভাবিক নহে, পরমাত্মারই স্বাভাবিক, জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে উহা আবির্ভূত হইয়া থাকে।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ সূ ॥

সূত্রার্থ:—অন্যার্থঃ চ = অন্য অর্থেই; পরামর্শঃ = উপদেশ করা হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ:—উক্তস্থলে যে জীবের কথা আছে তাহা প্রতিপাদ্য নহে; জীবের স্বরূপ যে পরমাত্মা তাহাই প্রতিপাদ্য বস্তু। জীবের পরমার্থ স্বরূপের আবির্ভাব হয় শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

অল্পশ্রুতেরিতিচেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ সূ ॥

সূত্রার্থ:—অল্প শ্রুতেঃ = অল্প শ্রুতি হেতু দহর বিভু-আত্মা হইতে পারে না; ইতি চেৎ = যদি এইরূপ বলি; তৎ উক্তম্ = না, ইহার উত্তর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ:—দহর আকাশ অল্প, শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, তাহা কিরূপে বিভু, সর্ব্বব্যাপী আত্মা হইবে? তাহার সমাধান আমরা পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্রে বলিয়াছি।

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ সূ ॥ ( পূর্ব্ব পক্ষীয় সূত্র )

সূত্রার্থ:—অনুকৃতেঃ = অনুসরণকারী জীবের; তস্যঃ চ = পরমাত্মার স্বরূপ কিরূপে হইবে।

ভাষ্যানুবাদ :—মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং"—তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া আর সকল প্রকাশিত হইতেছে; অতএব অনুসরণকারী জীব নিত্য-আবির্ভূত-স্বরূপ দহর-আকাশ হইতে পারে না।

অপিতু স্মর্য্যতে ॥ ২৩ সূ ॥ ( পূর্ব্ব-পক্ষীয় সূত্র )

সূত্রার্থ :—অপি তু স্মর্য্যতে = স্মৃতিতেও এইরূপ আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। "মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" —আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ রহিয়াছে।

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শব্দাৎ এব = শ্রুতি হইতেও; প্রমিতঃ = প্রমাণ হয়।

ভাষ্যানুবাদ :—কিন্তু কঠোশ্রুতি হৃদয়ান্তর্গত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। কারণ ঐ শ্রুতি ঐ অঙ্গুষ্ঠ পুরুষকে "ঈশানোভূত-ভব্যস্য"—তিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা এইরূপ বলিয়াছেন।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—হৃদি = হৃদয়ে; অপেক্ষয়া = অপেক্ষা হেতু; তু = কিন্তু হৃদয় ত বহু পরিমাণ-বিশিষ্ট; মনুষ্যাধিকারত্বাৎ = না, মাত্র মানুষের অধিকার হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও উপাসক হৃদয়কে অপেক্ষা করায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু জন্তুর শরীর নানাবিধ, কাজে-কাজেই তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণও ছোট বড় বহু; অতএব কি করিয়া বলিব যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কেবল মনুষ্য শরীরকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? —উপাসনা কেবল মনুষ্য শরীরেই অধিকার, কাজেকাজেই ঐ কথা কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই অপেক্ষা করে—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—তৎ উপর্য্যপি = মনুষ্যদিগের উপরে দেবতাদিগের; বাদ-রায়ণঃ = বাদরায়ণ বলেন; সম্ভবাৎ = ব্রহ্ম উপাসনা সম্ভব হেতু।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ভগবান বাদরায়ণ ব্যাস মনে করেন মনুষ্যদিগের উপরে দেবতাদিগেরও ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব ।

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ ॥ ২৭ সূ ॥

সূত্রার্থ ঃ—বিরোধঃ কর্ম্মণি ইতি চেৎ = দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিলে যাগাদি কর্ম্মে বিরোধ উপস্থিত হয়, ন = না ; অনেক প্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ = শ্রুতি দেবতাদের অনেক শরীর ধারণের কথা বলিয়াছেন ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—শরীর ছাড়া ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব নহে, সেই হেতু দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে যাগাদি কর্ম্মে বাধা উপস্থিত হয়, কেন না একই সময়ে একই যজ্ঞ বহুস্থলে হইলে সেই একই শরীরবান্ যজ্ঞীয় দেবতা একই সময়ে বহুস্থলে উপস্থিত হইবেন । না ইহাতে দোষ নাই । একই দেবতার যুগপৎ বহুশরীর ধারণের উপদেশ শ্রুতিতে আছে ।

[ বৃহদারণ্যকে আছে দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬, তাহার পর বলিয়াছেন ঐ ৩৩০৬ দেবতা ৩৩ দেবতারই বিভিন্ন মূর্ত্তি, পরে বলিয়াছেন ঐ ৩৩ দেবতা ৬ দেবতার বিভূতির রূপান্তর মাত্র । আচার্য্য শঙ্কর বলেন, যোগীরা যখন এককালে বহুশরীর ধারণ করিতে পারেন তখন দেবতাদের আর কি কথা ? ]

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ সূ ॥

সূত্রার্থ ঃ—শব্দ ইতি চেৎ = আকৃতি থাকিলে অনিত্য হয় কিন্তু শ্রুতি যে দেবতার নিত্যত্ব বলিতেছেন ; ন = না ; অতঃ = শব্দের আকৃতি থাকা হেতু ; প্রভবাৎ = শ্রুতির অর্থ প্রভাব হেতু দেবতা অনিত্য ; প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ = এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও জানা যায় ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিলে তাঁহারা অনিত্য হইয়া পড়েন । তাঁহারা যদি অনিত্য হন তাহা হইলে তাঁহাদের বাচী যে বৈদিক শব্দ অনিত্য হইয়া পড়ে । শব্দ যখন নিত্য তখন তাহার অর্থও নিত্য । অর্থের উৎপত্তি ও পরে বিনাশ স্বীকার করিলে শ্রুতি বিরোধ হয় ।—বিরোধ হয় না । শব্দ থাকিলেই তাহার আকৃতিও থাকিবে । এই হেতু দেবতাদের উৎপত্তি ও নাশ বলিতেছি । কারণ

শব্দ হইতে দেবতার উৎপত্তি শ্রুতি বলিয়াছেন—প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে শব্দ সকল স্মরণ করায় তাহার দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইল। তাহার পর তিনি দেবতা সকল সৃষ্টি করেন। শ্রুতিতে যখন দেবতার প্রকাশ ও অপ্রকাশ উল্লেখ আছে তখন বিরোধ কোথায়। (আবার দেখ প্রজাপতিকে শব্দ সকল স্মরণ করিতে হইয়াছিল, স্মরণের পূর্ব্বে শব্দ সকল অপ্রকাশিত ছিল। শব্দ সকল যখন প্রকাশিত হয় তখন দেবতাদেরও প্রকাশ ও অপ্রকাশ ঘটে। এইরূপ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না।) এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ এইরূপ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ"। স্মৃতি প্রমাণ—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা; আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।"

অতএব নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—অতএব = পূর্ব্বোক্ত কারণ হেতু; নিত্যত্বম্ = বেদ এবং দেবতার নিত্যত্ব।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রজাপতির সৃষ্টিও শব্দপূর্ব্বক। সেই জন্য বেদ নিত্য। (শব্দ যদি সংস্কার রূপে চিত্তে না থাকিত তাহা হইলে তাহার স্মরণ হইত কি করিয়া?)

[ স্মৃতি প্রমাণ—যুগান্তেঽন্তর্হিতান বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥

"ইতিহাসের সহিত বেদ সকল প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল; মহর্ষিগণ সে সকল তপস্যা দ্বারা স্বয়ম্ভুর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন।" ]

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সমাননামরূপত্বাৎ চ = একই প্রকার নামরূপ হেতু; আবৃত্তৌ অপি = পুনরুৎপত্তি কালে; অবিরোধঃ দর্শনাৎ = শ্রুতির অবিরোধ দর্শন হেতু; স্মৃতেঃ চ = স্মৃতিতেও আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—এই প্রকার সৃষ্টি-সংহারাত্মিকা আবৃত্তি (cycle) হইলেও কোনও দোষ হয় না। কারণ নামের পর যে সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ব্ব সৃষ্টিরই অনুরূপ নাম-রূপাদির সৃষ্টি হয়। অতএব শব্দ ও শব্দপ্রতিপাদ্য

দেবতা সম্বন্ধে আত্যন্তিক নাশ লইয়া কোনও বিরোধ হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (ঋ, বে—), "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ," এবং স্মৃতি বলিতেছেন, "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানা রূপানি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥"

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥ ৩১ সূ॥ (পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্র)

সূত্রার্থ :—মধ্বাদিষু=মধুবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যায়, অসম্ভবাৎ অধিকারং =অধিকার অসম্ভব হেতু; জৈমিনিঃ=জৈমিনির মত এইরূপ।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদের মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্য্যাদি দেবতা উপাস্য হওয়ায় তাঁহারাই আবার ঐ বিদ্যায় উপাসক হইতে পারেন না। সেই জন্য মধুবিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ॥ ৩২ সূ॥ (পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্র)

সূত্রার্থ :—জ্যোতিষি=জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মেই; ভাবাৎ চ=অধিকার হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—দেবতারা জ্যোতিঃ রূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। মধু প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই।

ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি॥ ৩৩ সূ॥

সূত্রার্থ :—ভাবং তু বাদরায়ণঃ অস্তি হি=বাদরায়ণ বলেন তাঁহাদের অধিকার (ভাব) আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, মধ্বাদি বিদ্যায় সূর্য্য বসু প্রভৃতি দেবতার অধিকার আছে, বাদরায়ণ এইরূপ মনে করেন। কেন না স্বীয় অন্তর্য্যামী ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা বর্ত্তমান কল্পান্তের পর নূতন কল্পে স্বাধিকার প্রাপ্তি পূর্ব্বক পূর্ব্ব সংস্কার হেতু ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে তাঁহাদের লিপ্সা বা আগ্রহ হয়।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবনাৎ সূচ্যতে হি॥ ৩৪ সূ॥

সূত্রার্থ :—শুক্=শোক; অস্য=এই জানশ্রুতি রাজার; তৎ অনাদর শ্রবণাৎ=হংস কর্ত্তৃক তাহার অনাদর বাক্য শ্রবণ হেতু; তৎ=ব্রহ্মজ্ঞ-রৈক; অদ্রবণাৎ=গমন হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় মুমুক্ষু জানশ্রুতি রৈক গুরুর নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা লাভেচ্ছু হইয়া গমন করিলে, তিনি তাহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করেন। কাজেকাজেই বলিতে হয় শূদ্রের ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার আছে।—না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। হংসগণ কর্ত্তৃক অনাদর বা অবজ্ঞা প্রদর্শন হেতু, মুমুক্ষু জানশ্রুতি শোকগ্রস্ত হইয়া রৈকগুরু সমীপে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে শূদ্র ( শুক্+দ্র+ক ) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ সূ ॥

সূত্রার্থ :—ক্ষত্রিয়ত্ব অবগতেঃ=ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় ; উত্তরত্র =শেষভাগে ; চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ=চৈত্ররথ শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়-লিঙ্গ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে একত্র ভোজন কালে চিত্ররথ বংশীয় অভিপ্রতারি নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত এককালে জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায় জানশ্রুতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানা যায়। অতএব তিনি শূদ্র নহেন। এবিষয়ে শ্রুতি এইরূপ "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়-মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষিসেনিং পরিবিষ্যমাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে"— পাচক কপিগোত্রীয় শৌনক ও কক্ষসেন পুত্র অভিপ্রতারিকে পরিবেশন করা কালে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল।

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ সূ ॥

সূত্রার্থ :—সংস্কার পরামর্শাৎ=উপনয়ন সংস্কারের পরামর্শ আছে বলিয়া, তৎ অভাব=তাহার অভাব হেতু, অভিলাপাৎ চ=নিষেধ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—বিদ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিতে দেখা যায়, "তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব" ইতি "হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ব্রহ্মান্বেষমাণা এবহ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি" "তেহ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্না" —তাহাকে উপনীত করার পর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্, উপদেশ করুন। পরব্রহ্ম অন্বেষণপর ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন এসমস্তই তিনি।

তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া গুরুর ' ট উপস্থিত হইলেন। এ সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় ব্রহ্মবি উপনয়ন সংস্কার সাপেক্ষ। "শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিরিতি" "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতীতি" শূদ্র চতুর্থবর্ণ একজাতি। শূদ্রে পাতকও নাই সংস্কারও নাই। এসকল বাক্যে শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের নিষেধ করা হইতেছে।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তিঃ ॥ ৩৭ সূ ॥

সূত্রার্থ :—তৎ অভাব-নির্দ্ধারণে চ = শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারিত হওয়ার পর ; প্রবৃত্তিঃ = প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্যে জাবালি যখন সত্যকথার দ্বারা নিজের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিল, গৌতম যখন বুঝিলেন এই সত্যবাক নিশ্চয় কোন ব্রাহ্মণ জাত, জাবালির যখন এইরূপে শূদ্রত্ব অপগত হইল, তখন তাঁহার তাহাকে উপনয়ন দিবার প্রবৃত্তি হইল।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ ॥ ৩৮ সূ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রবণ-অধ্যয়ন-অর্থ প্রতিষেধাৎ = শূদ্রের বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান নিষেধ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।—কেন? "শূদ্র সমীপে নাধ্যেতব্য" শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না, এই নিষেধ বাক্য হেতু।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৯ সূ ॥

সূত্রার্থ :—স্মৃতেঃ চ = স্মৃতিতেও এইরূপ আছে।

ভাষ্যানুবাদ :—স্মৃতিতে এইরূপ আছে, "নচাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ" শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ করিবে না, কোনও ব্রতও উপদেশ করিবে না।

কম্পনাৎ ॥ ৪০ সূ ॥

সূত্রার্থ :—কম্পনাৎ = কম্পন হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—কঠোপনিষদে "যদিদং কিঞ্চজগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—জগতের যাহা কিছু সব প্রাণ দ্বারা কম্পিত হয়—এই স্থলে প্রাণ শব্দ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পরম পুরুষ। কারণ তাঁহার সম্বন্ধে জগতের কম্পকত্ব, মহত্ত্ব ও ভীতিজনকত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে।

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪১ সূ ॥

**সূত্রার্থ** :—জ্যোতিঃ দর্শনাৎ = প্রাণ শব্দের পূর্ব্বে জ্যোতিঃ শব্দ দেখা যায় বলিয়া।

ভাষ্যানুবাদ :—কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত প্রাণ-বাক্যের পূর্ব্বে এই শ্রুতিটি আছে, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া সকল প্রকাশিত আছে, তাঁহারই জ্যোতিঃ জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছে। এই জ্যোতিঃ ধর্ম্ম পরমাত্মা সম্বন্ধেই খাটে অতএব ঐ প্রাণ অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত পর-পুরুষ।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ সূ ॥

**সূত্রার্থ** :—আকাশঃ অর্থান্তরত্ব-আদি-ব্যপদেশাৎ = আকাশ শব্দের সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া উহা পরমাত্মবাচী।

ভাষ্যানুবাদ :—ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন, "আকাশোহবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা"—আকাশেতেই নামরূপের (জগতের) নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; অতএব আকাশ শব্দবাচ্য পুরুষোত্তম।—কেন? জীব হইতে পৃথক মুক্ত পরমাত্মার নামরূপ উপলক্ষিত আকাশ সকল নামরূপ বস্তুর নির্ব্বাহক আধার, সেই হেতু পৃথক। আকাশ শব্দের সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়া, এইরূপ ভিন্ন অর্থ উপদেশ করায় ঐ আকাশ পরমাত্মা। তাহা ছাড়া ঐ আকাশ সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্বাদিরও উপদেশ আছে।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪৩ সূ ॥

**সূত্রার্থ** :—সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যঃ-ভেদেন = সুষুপ্তি এবং দেহ হইতে বহির্গমন এই ভেদ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাটকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যে পুরুষের কথা আছে, তিনি পরমাত্মা। কারণ ঐ শ্রুতি জীবাত্মার সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণনা দ্বারা জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ দেখাইয়াছেন।

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৪ সূ ॥

**সূত্রার্থ** :—পতি-আদি-শব্দেভ্যঃ = পতি প্রভৃতি শব্দ হেতু।

ভাষ্যানুবাদ :—"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ"—তিনি সকলের বশকারী অধিপতি—এই সকল বাক্যে পতি প্রভৃতি শব্দ থাকায় জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ বুঝা যাইতেছে অতএব পরমাত্মাই আকাশ-শব্দবাচ্য।

ইতি নিম্বার্কীয় ব্রহ্মসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ।

—বাসুদেবানন্দ।

---

# চিন্তা-কণা

স্বদেশ-প্রীতি শ্রেয়, কিন্তু ইহার বাড়াবাড়িই কালান্তক যুদ্ধের হেয় হেতু।

*     *     *

একজনকে হাসাইতে গেলে, অপরকে ইচ্ছা না থাকিলেও কাঁদাইতে হয়। মেঘের দেবতা বর্ষণ করে, কৃষক-বধূ তখন হাস্য করে, কুম্ভকার-পত্নী কাঁদিতে থাকে।

*     *     *

গোবর যদি জানিত যে ঘুঁটে তার জ্ঞাত-ভাই তবে সে ঘুঁটের পোড়া দেখিয়া হাসিত না। পরবশেরা কেহ বা গোবর, কেহ বা ঘুঁটে।

*     *     *

পলান্নই ভোজন কর, কিংবা ছাতুই খাও, বাহিরের ফলে কোন তফাৎ নাই, উভয়ই দুর্গন্ধময়। হাকিম ও চাপরাসী উভয়ই 'নকর'-গন্ধযুক্ত।

*     *     *

কর ( হাত ) দেহের অংশ বটে কিন্তু উভয়ের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফল

বিভিন্ন। কর-পৃষ্ঠ যিনি প্রদর্শন করান তিনি দাতা, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করায় সে ভীরু।

*　　*　　*

উপদেষ্টা ও তস্করের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই ; একে জীবে চক্ষুদান করেন, অন্যে জড়ে চক্ষুদান করে।

*　　*　　*

পেট ভরিলে যে কেন লোক মিষ্টভাষী হয় তাহা পাখোয়াজ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। 'আটা' না পাইলে পাখোয়াজে মধুর ধ্বনি উঠে না।

*　　*　　*

বিশ্বাসটা খোঁড়ার লাঠির মত। খোঁড়ার লাঠি কাড়িয়া লও, সে কাদায় লট পট করিবে, অপূর্ণ মানুষের বিশ্বাস কাড়িয়া লও সে পৃথিবীর পঙ্কিলতায় মজ্জিত হইবে।

*　　*　　*

অদৃষ্ট দেবতার হ্রস্ব দীর্ঘ চন্দ্রবিন্দু জ্ঞান নাই। তিনি এত তাড়াতাড়ি লেখেন যে 'ক' এবং 'ফ' একরকম দেখায় ; ফলে এই হয় যে তাঁহার মৃত্যু নামক নায়েব যাহাকে ফাঁসিতে ঝুলোনোর কথা, তাহাকে কাশীতে টানিয়া আনে।

*　　*　　*

নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো—এ কথাটা জিনিষ পত্তোর সম্বন্ধে বেশ খাটে, মামার সম্বন্ধে নহে। যার মামা কানা সে খোঁটায় খোঁটায় অস্থির হইয়া বলে, কানা-মামার চেয়ে মামা না থাকাই ভালো।

—ওমর।

# স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম্ম

ইন্দ্রিয়সংযম করিলেও মানসিক উপভোগ চলিতে থাকে। সেইজন্য গীতাকার বাসনা-মুক্তির পথনির্দ্দেশ করিতেছেন। কর্ম্মত্যাগই সম্পূর্ণ নয়, বাসনা ত্যাগই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ। সাময়িক ভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত রহিয়া যায়, পরে তাহা সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ছাপাইয়া প্রচণ্ডবেগে ভোগের প্রতি ধাবিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে ঠিক ইহাই হইয়াছিল। আপামর সকলকেই সন্ন্যাসের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ফলে গৈরিকের আবরণে ভোগবিক্ষুব্ধতায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্বামিজী বলিতেছেন, "যখন বৌদ্ধ মঠে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু। তখনই দেশটা ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।"

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত তাহা 'অর্জ্জুনের' "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ" এই ক্লীব ভাবেরই পরিণাম। ইহাতে মানুষকে শুধু ক্লীবই করে, বাসনা বিরহিত করিতে পারে না। ইহার ফলে জাতীয় জীবনে বৈনাশিক সন্ন্যাস আসিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে প্রেরণ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশকে এই বৈনাশিক সন্ন্যাসের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অভ্যুদয় পন্থী করিলেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, তিনি ত্যাগী হইয়াও কর্ম্মী, সন্ন্যাসী হইয়াও সচঞ্চল। তিনি কোন নূতন তত্ত্ব, কোন অভিনব দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিতে আসেন নাই। এমন কি তিনি রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকেও প্রচার করেন নাই। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষের স্তিমিত প্রাণ-স্পন্দনকে মুখর করিয়া তুলিতে, আর্য্য আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে; বিবেকানন্দের জীবন-ব্রত ভারতের নব জাগরণ সাধন—ভারতের স্বারাজ্য সংস্থাপন।

স্বামিজীর জীবনধর্ম্মকে কেবল এই দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। তিনি ভারতের—পতিত ভারতের উদ্ধার কর্ত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপক, তেমনি বিবেকানন্দ সিদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াও ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা, এই পতিত জাতির ভগীরথ। স্বামিজীকে দেখিয়াছি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী রূপে, ধ্যানী সাধক মূর্ত্তিতে, ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা রূপে, উহা কিন্তু সবই একটি মূল ভাবেরই বিকাশমাত্র। ঐ মূলভাবটি ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্থাপন। তাই তাঁহার বজ্রকণ্ঠে শুনিতে পাইতেছি, "আবাব ভাবতকে জগৎ জয করিতে হইবে, ইহাই আমার জীবন স্বপ্ন।"

ভারতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য এই দেশপ্রাণ সন্ন্যাসীর আবশ্যক হইযাছিল। ভারতের কল্যাণই যাঁহার কল্যাণ, ভাবতেব মুক্তিই যাঁহার মুক্তি, তিনি ব্যতীত কে আর অধঃপতিত ভারতকে বাঁচাইতে পারে? তাই স্বামিজীর কণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়াছে, "বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ।"

নবীন ভারত স্বামিজীর কাছে দীক্ষা পাইলেও "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়"। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভোগলালসাও যেমন, ত্রিতাপের জ্বালা হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত মুমুক্ষুত্বও তেমনি, উভয়ই স্বার্থসঙ্কীর্ণ—উভয়ই ক্ষুদ্রতর এবং অধর্ম্ম। মোক্ষের নামে এই স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতায় ভারতীয় চরিত্র একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, তাই ভারতের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

যখন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ছিল, তখন এই ক্ষুদ্রাকার ধর্ম্মের অস্তিত্বই ছিল না। রামায়ণের যুগে ও মহাভারতীয় সভ্যতার সময়ে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের এই সঙ্কীর্ণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও ভীষ্মদেব ইহার হীনতা দেখাইয়া ছিলেন। জড় স্বার্থবুদ্ধিই যে কেবল মাত্র বৈনাশিক তাহা নহে, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতাও অমঙ্গল জনক। একটি সমগ্রকে অস্বীকার করে পার্থিবতার দিক দিয়া—অপরটি সমগ্রকে তুচ্ছ করে মুক্তির দোহাই দিয়া। মোটের উপর দুইটিই অনার্য্যোচিত ও সৃষ্টি-সংরক্ষণের বিরোধী।

দেশে অদ্বৈতবিজ্ঞান-বিহিত মুক্তিতত্ত্ব আবরিত হইয়াছিল। তাই জাতি সত্ত্ব সাধনার নামে তমোভাবের পরিচর্য্যা করিয়া মৃত্যু-পথ প্রশস্ত করিতেছিল। স্বামিজী বজ্রনির্ঘোষে ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিকার চাহিলেন, "সত্ত্ব প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়। সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা।

দেশে সত্ত্বের পরিচয়ে যে বিষম তামসিকতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা মুসলমান বিজয়ে, ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে। সত্ত্ব শুদ্ধ অবস্থায় জাতি-জীবনে হীনতা রহিতে পারে না। স্বামিজী বলিয়াছেন, "আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি।"

স্বামিজী ভারতে নূতন করিয়া বেদান্তবাদ প্রচার করেন। ইহার কারণ ভারতীয় চিত্তটি বৈদান্তিক। আজও ভারতবাসী বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। যদি দেশে আবার নিষ্কলঙ্ক খাঁটি বেদান্ত-বাদ প্রচার করা যায়, তবে তাহার দ্বারাই জাতির অভ্যুদয় সাধিত হইবে। প্রকৃত বৈদান্তিকতায় মানুষকে স্বরাট করে, ইহা মহাবীর্য্যের প্রস্রবণ। তাই স্বামিজীর অভিমত, "বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।"

ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, বিবেকানন্দ পতিত ভারতের উদ্ধার কর্ত্তা আবার তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যাতা; এবং তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যানও ভারতের কল্যাণ কামনাতেই। তাই নব বেদান্তবাদীর মুখে নবীন ভারত নব বেদান্তব্যাখ্যান শুনিতেছে, "তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও; যাও অপরের সাহায্য করো। * * * তোমাদের সম্মুখে এই কর্ম্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি—"

ইহা নবীন ভারতের নবীন বেদান্তবাদ, নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র।

বেদান্ত ব্যাখ্যায় এই যে জাতি-প্রীতির উচ্ছ্বাস, ইহা দেশ প্রেমিকের ভাবুকতা নহে। বেদান্তের যুগধর্ম্মানুযায়ী ব্যাখ্যা। বর্ত্তমান যুগে বেদান্তবিজ্ঞান ঐ মূর্ত্তিতেই প্রতিভাত হইতে চায়।

দেশ-প্রীতি ভারতীয় দৃষ্টিতে একটা নূতন কিছু নহে। উহা ভাগবত ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। আর বর্ত্তমান যুগে দেশপ্রীতির অভ্যন্তরেই অখণ্ড ধর্ম্মভাব পরিণতি চাহিতেছে। তাই স্বামিজীর বেদান্তবিজ্ঞানের ঘোষণা, "এই জাতি যদি জীবিত থাকে তবে তুমি আমি—"

সকল যুগের ধর্ম্ম সমান নহে। যে কালে যাহার প্রয়োজন, ঐশ্বরিক প্রবর্ত্তনায় সেই কালে সেই ধর্ম্ম. ধর্ম্মের অপর সকল বিভাবকে আপনার মধ্যে সংহত করিয়া একটি প্রবল পরিপূর্ণ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিকৃত ভাবকে নিবৃত্ত করিতে, শঙ্করের সোহম্‌বাদ বৌদ্ধ সাধনার কদর্য্যতা নিবারণ করিতে উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কালেই সত্য। বর্ত্তমান যুগে আবার স্বাজাত্য বোধই ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট যুগধর্ম্ম।

বৌদ্ধবাদ তাহার যথা-নির্দ্দিষ্টকালে সত্য, শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মায়াবাদও সেই যুগোপযোগী। আবার স্বদেশাত্মিকতাও এই যুগের উপযোগী আদর্শ এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য শাশ্বত ধর্ম্ম।

লোকস্থিতির জন্য যখন যে মতবাদের আবশ্যকতা হয়, তখন তাহা বেদান্তবিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই এক একটি যুগধর্ম্ম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠামূলক নব যুক্তিবাদেরও সৃষ্টি হয়। যুগে যুগে ইহা হইয়া আসিতেছে। স্বামিজীর "কর্ম্মজীবনে বেদান্তবাদ" নবধর্ম্মের এই নবীন যুক্তিবাদ।

বেদান্ত চিরদিনই ভারতে আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়ক। বিবেকানন্দ কিন্তু উহাকে জাতির নিত্যকার কর্ম্ম-জীবনে প্রয়োগ করিলেন, "অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে তেজস্বী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়।"

অধঃপতিত আত্মশক্তিবিহীন জাতি যখন বেদান্তের মর্ম্মকে কেবল চিন্তাজগতের বিষয়ীভূত করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতেছিল, তখন

স্বামিজী বেদমর্ম্মের সঞ্জীবনী মূর্ত্তি প্রকট করিলেন। বহুশত বৎসরের দাসত্বে জাতির আত্মশক্তি কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। অদ্বৈতবাদের স্পর্শে তাহাকে প্রবুদ্ধ করাই নব প্রবর্ত্তকের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

এখানে একটি কথা পুনরুক্তির প্রয়োজন। অখণ্ড ধর্ম্ম অন্তর্বহিঃ লইয়া, স্বর্গমর্ত্ত্য সম্মিলিত করিয়া, মুক্তি ও বন্ধনকে একীভূত করিয়া। বিবেকানন্দ সেই অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক ; যে ধর্ম্মের আদেশ, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" এবং "জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্"।

বিবেকানন্দ এই অখণ্ড সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন—ভারতীয় জীবনেই এই ধর্ম্মের উৎস-মুখ। সেইজন্য তিনি ভারত-জাতিকে জাগ্রত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

( ক্রমশঃ ) শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

---

# আধুনিক বঙ্গ-কবি

সে একদিন যে দিন কবিগুরুর স্বকণ্ঠে গান শুনিলাম—"অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী।" মন কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল, সেখানকার সব রঙিন, স্বপ্নরাজ্যবৎ, সব অস্ফুট, কিন্তু সুন্দর। যিনি শুনিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসংখ্য কবিতারাজীর মধ্যে যেখানে পূর্ণগৌরবে অভিব্যক্ত, সেখানকার প্রধান সুরটাই এই স্বপ্নময়ত্ব। যেমন ধরুন—

তব সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তুমি নেমে
মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা বসে আপন মনে গাইতে ছিলাম গান
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে।
ইত্যাদি

অথবা— উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐযে তিনি ঐ যে বাহির পথে।
ইত্যাদি

আমার মন যেন কোলাহলপূর্ণ বাহ্যজগৎ ছাড়াইয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে প্রবেশ করিল—চেনা চেনা ঠেকে, তবুও অজানা, "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি" এই ভাব, এই প্রকার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

আমার কোন বন্ধু জানি না কাহার বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন। —"Rabindra nath is the poet of the learned, Rajani Sen is the poet of the mass"—'রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞ ভাবুকদের কবি, রজনী সেন সর্ব্ব সাধারণের কবি।' কথাটিতে সত্যতা আছে। রবীন্দ্রনাথের রঙিন রাজ্যে প্রবেশাধিকার সকলের নাই, তাই তাঁহাকে বলে mystic poet. কান্ত কবি কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী, সহজ সরল ভাষায় সূক্ষ্মভাবজগৎকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন—পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলে অনায়াসে তাহার দর্শন স্পর্শন করিতেছে, আনন্দ পাইতেছে। যেমন ধরুন—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
ইত্যাদি

অথবা—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল তোমারি করুণা চন্দনে।
ইত্যাদি

কান্ত কবির ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে কোন ভাষ্যের প্রয়োজন নাই—অপর পক্ষে আছে। অবশ্য তার একটি কারণ, ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর উচ্চে।

এখানে বিশদ আলোচনার স্থানাভাব, নতুবা একই বিষয় লইয়া লিখিত উভয় কবির "সেথা আমি কি গাহিব গান" এবং "অয়ি ভুবন-মন মোহিনী" এই দুইটি অতুলনীয় কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইত।

শব্দবিন্যাস ও ছন্দলালিত্যে রবীন্দ্রনাথ কান্তকবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শব্দঝঙ্কারে সত্যেন্দ্রনাথ ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কবি নজরুলের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে নজরুলের শব্দঝঙ্কারে গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা চপলতা অধিক। সত্যেন্দ্রের তদ্বিপরীত। নজরুলের কবিতায় অসি ঝণৎকার আছে, গদা ঘূর্ণন নাই; বিজলী চমক আছে, অশনি সম্পাৎ নাই; পার্ব্বত্য ঝরণার উদ্দাম নৃত্য আছে, সমুদ্রের মেঘস্পর্শী তরঙ্গমালার উদাত্ত গর্জ্জন নাই। মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহারের পর সে গভীর ধ্বনি আমরা পাই সত্যেন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথকে গম্ভীর না বলিয়া 'গভীর' বলাই সঙ্গত। রবীন্দ্রের ছন্দ চলিয়াছে অনাবিল স্রোতের মত, বীচি বিক্ষোভ নাই, কিছু মাত্র উন্মত্ততা নাই,—স্থির, ধীর, প্রশান্ত আর মনোহারী। রবীন্দ্রের ছন্দে নৃত্য আছে, কিন্তু সংযত;—মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য নয় অথবা নবজাত ধেনুবৎসের চপল নৃত্যও নয়। যেমন ধরুন—

তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তাঁর পায়ের ধ্বনি।

পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন নূপুর শিঞ্জন আসিয়া আমাদের শ্রবণে পৌঁছিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—

চরকার ঘর্ঘর, চরকা ঘর ঘর। ইত্যাদি

এখানেও চরকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। এই সঙ্গে তুলনা করুন নজরুলের ছন্দ—

এ কি রণবাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রণ রণ রণ ঝন ঝন।

সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি ধমকি'
দামা দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি
ওঠে চোটে চোটে, ছোটে লোটে ফোটে
বহ্নি ফিণিকি চমকি' চমকি'
ঢাল-তলোয়ার খন খন্।
ইত্যাদি

এ ক্ষেত্রে মায়ের আগমন কালের কতকগুলি চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, কতকগুলি আনুষঙ্গিক শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে। কিন্তু রবীন্দ্র ও সত্যেন্দ্র হইতে এখানে একটু বিশিষ্টতা আছে। সত্যেন্দ্রের গাম্ভীর্য্যের একটু পরিচয় লউন—

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত্‌ময়
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

অথবা—

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরস মুখে
শিরে তোর নাগের ছাতা কমল মালা ঘুমায় বুকে।
ঢল ঢল নয়ন যুগল জলভরে পড়ছে ঢুলে
কালো মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ঐ নিবিড় কাল চুলে।

রবীন্দ্রের অনাবিলতার, গভীরতার, প্রশান্ততার একটু পরিচয় লউন—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথা বিহারো
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি
হে প্রিয়! আপন সেথায় আমারো।

দূর হইতে যেন অনাহত বীণাধ্বনি আসিয়া কর্ণে পৌঁছিতেছে।

নজরুলের গদা ঘুরিতেছে—

সদা গদা ঘোরে বোঁও বন্ বন্
শোঁও শন্ শন্।

কিন্তু এ তো ভীমকর্ম্মার "ষষ্টি সহস্র" হাতী ঘোরানো গদা নয়,—ভাবে বীরত্ব আছে, ভীমত্ব নাই। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ বাদ্‌সাহী, নজরুলের romantic. (১)

কবি নজরুল তাঁহার প্রথম ফুলের ডালি (?) "অগ্নিবীণা" উৎসর্গ করিয়াছেন বঙ্গের বিপ্লববাদীর শিরোমণি 'অগ্নিঋষি বারীন্দ্রকে। এই বিপ্লববাদী যুবকসম্প্রদায় বঙ্গে যে এক অত্যদ্ভুত তেজোপূর্ণ romantic সাহিত্যের জন্ম দিয়াছেন, কবি নজরুল তাহার কবিতার দিক পূরণে অগ্রসর হইয়াছেন ও অদ্ভুত সাফল্যের সহিত এ পর্য্যন্ত তাহা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ চিরকাল একান্ত আগ্রহের সহিত এই অভিনব সাহিত্য পাঠ করিবে। ভবিষ্যতে আরও মহত্তর রত্নরাজি লাভের আশায় তাহারা বঙ্গ-কবি নজরুলের দিকে তৃষিত নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

আধুনিক অন্যান্য বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায়, অক্ষয় বড়াল, কামিনী রায়, চিত্তরঞ্জন, কান্তিচন্দ্র, কুমুদ মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতের দিক বাদ দিয়া ভাষার কিঞ্চিৎ অপূর্ণতা সত্ত্বেও "অন্তর্যামীর" চিত্তরঞ্জন কান্তকবির পাশাপাশি স্থান পাইতেও পারেন। সমালোচক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা "অন্তর্যামীর" চিত্তরঞ্জনের হস্তে জাতীয় ভাব অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছে। (২)

"ওমর খৈয়াম"এর অনুবাদে, ভাবে, সারল্যে ও গাম্ভীর্য্যে সুরেন্দ্রনাথ রায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শব্দবিন্যাসে ও ছন্দে কান্তিচন্দ্র কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুগমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি দোষ নাও হইতে পারে।

শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ।

---

(১) 'ঝর্ণা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে এ সকল সাধারণ মন্তব্য খাটিবে না।

(২) 'নারায়ণে' "অন্তর্যামীর" সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

# স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

মাদ্রাজে প্রথম কয়েক বৎসর, দারুণ অভাবের মধ্যে সহায়হীন অবস্থায় শশী মহারাজকে কাজ করিতে হইয়াছিল। এমন দিনও গিয়াছে যখন নিজের পরিমিত অত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য থাকা তো দূরের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যভোগের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও জুটিত না। একদিন ভোগের সময় দেখিলেন, ঠাকুরের রুটিতে মাখাইবার জন্য এতটুকুও ঘি নাই। টাকা পয়সাও নাই যে, সামান্য ঘি কিনিয়া আনিয়া সেই দিনের মত ঠাকুরের ভোগ চালাইয়া দেন। এইরূপ নিরুপায় ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একটি মাদ্রাজী ভক্ত আসিয়া বলিল, "স্বামিজী, সম্প্রতি অফিসে আমার পদবৃদ্ধি হয়েছে, আমার সাংসারিক অবস্থাও এখন সচ্ছল, ঠাকুরের সেবার জন্য আমি মাসিক কিছু কিছু দিতে চাই।" শশী মহারাজ উত্তর করিলেন, "না, না তুমি কোথায় পাবে ?" ভক্তটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল, "স্বামিজী, ভগবানের সেবা হতে দয়া করে আমায় বঞ্চিত করবেন না।" এই বলিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য সেদিন তিনি কিছু ঘি কিনিয়া আনিলেন।

এইরূপ জলন্ত বিশ্বাস, নির্ভরতা, ত্যাগ ও তপস্যা লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় পনের বৎসর কাল মাদ্রাজে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, বক্তৃতাকালীন তাঁহার আলখাল্লার দুই পকেটে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ছবি থাকিত। তিনি দুই পকেটে হাত রাখিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং বলিতেন, "ঠাকুর ভিতর হ'তে যেমন বলান্ গ্রামোফনের মত আমি তেমনিই বলে যাই, এতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া শশী মহারাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে ক্লাস করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়া, ছাত্র সংখ্যা অতি

অল্প হইলেও অধ্যাপনা করিতেন। কোন সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, তিনি ব্যতীত ক্লাসে আর কেহই উপস্থিত নাই, তবুও তিনি বিরক্ত হইতেন না ; ঐ সময় ধ্যান জপ করিয়া শান্ত মনে মঠে ফিরিয়া আসিতেন।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। জনৈক মাদ্রাজ-বাসী বলেন—

His method of teaching was unique. It was more or less conversational—instead of being stiff or formed, it appealed direct to the heart owing to the sincerity with which it was uttered. Time flew past, the minutes grew into hours, but we who were listening to his sublime discourses were enjoying a supreme happiness and felt not how time flew away. Great truth, complicated questions, controversial problems and all the heights and depths of ethics were discussed but in most simple manner possible, so that, even a child might understand them.

'অন্য সকলের শিক্ষাদান প্রণালী হইতে পূজনীয় শশী মহারাজের শিক্ষা দিবার ধারার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ দিতেন, সুতরাং উহা মোটেই 'কট মট' হইত না, বরং তাঁহার সরল হৃদয়ের কথাগুলি সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিত। তাঁহার উচ্চভাবপূর্ণ উপদেশাবলী শুনিয়া আমরা হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতাম। সময় কোন্ দিক দিয়া কখন্ চলিয়া যাইত কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মহান তত্ত্ব, জটিল প্রশ্ন, কঠিন সমস্যা এবং দর্শনশাস্ত্রের উচ্চ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি তিনি এরূপ সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, একটি বালকও অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিত।'

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতাবলী উত্তরকালে সংগৃহীত হইয়া "The universe and man" 'Sri Krishna the Pastoral,' 'Sri

Krishna the king maker' এবং 'The soul of man' প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ে নিবদ্ধ হইয়াছে; ইহা ব্যতীত 'শ্রীরামানুজ চরিত' নামক মূল বঙ্গ ভাষায় তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মাদ্রাজে যে সমস্ত ভাগ্যবান যুবক পূজনীয় শশী মহারাজের নিকট উপদেশ গ্রহণ ও ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য আসিত তিনি তাহাদের হৃদয়ে ত্যাগের আগুন জ্বালিয়া দিতেন। ইহাতে যুবকগণের অভিভাবক-মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; তাঁহারা শশী মহারাজকে সংবাদ পাঠাইলেন—যদি তিনি তাঁহার উপদেশের ভাবধারা পরিবর্ত্তিত না করেন, তবে আর তাঁহারা তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন না। সিংহ শিশুকে আঘাত করিলে সে যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, এই শাসনবাক্য শ্রবণে শশী মহারাজও তদ্রূপ বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন—

Am I to preach other than what I have learned from my Master? Certainly I won't do that. I care a fig for the big wigs. They are at liberty to do whatever they like. If I am ousted to-day from this castle I shall very gladly find accommodation in a pale of one of my students' houses. I am a sannyasin and do not know where my next meal would come from.

'গুরু মহারাজের নিকট যাহা শিখিয়াছি তাহার বিপরীত শিক্ষা আমায় দিতে হইবে? কখনই নহে। হোমরা চোমরা লোকদের আমি গ্রাহ্যই করি না। তাহাদের যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে। আজ যদি আমি এই 'ক্যাসল' * হইতে বিতাড়িত হই, আমার কোন ছাত্রের বাড়ীর এক কোণে আমি আনন্দে আশ্রয় লইব। আমি সন্ন্যাসী—কল্যকার ভিক্ষা কোথা হইতে জুটিবে তাহা আমি জানি না।'

এই মহাপুরুষের শুভেচ্ছা ও নিষ্কাম কর্ম্ম উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। সংসারে যাহাদের আপনার বলিতে কেহ নাই, উদরপূর্ত্তি কাহাকে বলে যাহারা কখনো জানে

* তখন মাদ্রাজ-মঠ Castle নামক কোন ভাড়া বাড়ীতে ছিল।

না, লাঞ্ছনা ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া ভালবাসা কি বস্তু যাহারা জীবনে একদিনের জন্যও অনুভব করে নাই, সেই সমস্ত হতভাগ্যদের জন্যও তাঁহার করুণ হৃদয় সর্ব্বদাই বিগলিত হইত। একবার কয়েম্বটোরে ( Coimbatore ) প্লেগ হইয়া একটি দরিদ্র পরিবার সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়া যায়। কয়েকটি অনাথ শিশু ব্যতীত সেই সংসারে আর কেহই ছিল না। শশী মহারাজ তাঁহার বিশাল বক্ষে বালকগণকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের শিক্ষা প্রভৃতির সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের বর্ত্তমান বিরাট Ramakrishna students' Home এর ( শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ভবন ) ভিত্তি এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানব-দুঃখে যাঁহার প্রাণ নিরন্তর ক্রন্দনশীল, সংসারের সকল হিয়ার দারুণ মর্ম্মবেদনা যাঁহার বক্ষ বিক্ষোভিত করে সেই রোদনপর মহাপ্রাণকে কে না শ্রদ্ধা করে? হয় তো স্থূলভাবে তিনি কাহারও কোন উপকারে আসেন না, হয় তো একটি কপর্দ্দক দিয়াও তিনি কাহাকেও সহায্য করিতে পারেন না, শুধু চোখের জল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও অনাথশরণের পাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার একমাত্র দান, তবুও তিনি জগতের যে-কোন শ্রেষ্ঠ দানী হইতেও মহৎ। তাই দেখিতে পাই, অনাথ পিণ্ডদ শ্রাবস্তিপুরের নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—

ওগো পৌরজন, কর অবধান,
ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান
দেহ তাঁরে নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।

তাঁহার কথা শুনিয়া,—

ফেলি দিল পথে বণিক ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।

ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে
ভিক্ষু কহে, ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো।
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট
আননে।

তখন,—

দীন নারী এক ভূতল শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ
কমলে।
অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
এক মাত্র বাস, নিল গাত্র হ'তে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
ভিক্ষু উর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ
কহে ধন্য মাতঃ, করি আশীর্ব্বাদ
মহা ভিক্ষুকের পূরাইলে সাধ
পলকে।

সেই অতি দরিদ্রা রমণী উলঙ্গিনী হইয়া, নিজ দেহ অরণ্য-আড়ালে কোন মতে লুকাইয়া তাহার শতছিন্ন বসনখানি ভিক্ষুকের পাদপদ্মে ফেলিয়া দিল, তাই উহা ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য; কিন্তু যাহার তাহাও নাই, শুধু চোখের দুফোঁটা অশ্রু যাহার বাকী আছে, অপরের ব্যথার তাপে তাহাই যদি বিগলিত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে, তবে সেই দুইটি অশ্রুবিন্দু নারায়ণের বক্ষে কৌস্তভ মণিরূপে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এইরূপ

বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণ লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

He thought that his salvation consisted in the salvation of humanity and with this end in view, he toiled and moiled to remove the misery of people, who had fallen from the high ideal of life enjoined in Scriptures.

'সমগ্র মানবের মুক্তিতেই তাঁহার মুক্তি—পূজনীয় শশী মহারাজ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন ; সেইজন্য শাস্ত্রকথিত মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে যাহারা বিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের দুঃখ দূরীকরণ মানসে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন ।'

ব্যক্তিগত মুক্তি সমষ্টিগত মুক্তির অপেক্ষা করে কি-না তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু হৃদয় বিচার মানে না। তর্ক, যুক্তি, বিচারের কোলাহল দমিত করিয়া, হৃদয়ের ক্রন্দনরোল চিরদিন ভুবন ভরিয়া রাখে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিশ্বজননীর সন্তানসন্ততির জন্য যৎসামান্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, লোকচক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, অনাথিনীর জীর্ণ মলিন বসন মানব-সাধারণের চক্ষে অতি তুচ্ছ ; কিন্তু তাহা পাইয়াই—

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ নখর
আলোকে ।

তদ্রূপ শশী মহারাজেরও সমস্ত জীবনব্যাপী অতি দীন মানবপূজা সকলের চক্ষে উপেক্ষিত হইলেও নারায়ণের হৃদয়ে চিরদিন বিপুল পুলকের সঞ্চার করিবে ।

আর দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ কাহিনী শেষ করিব। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেম ও অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচায়ক। তখন, পূজনীয় বুড়ো . বাবা ( স্বামী

সচ্চিদানন্দ ) পরিব্রাজক ভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; শশী মহারাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কয়েক মাস মাদ্রাজে থাকিবার পর রামেশ্বর দর্শন করিয়া বুড়ো বাবা মঠে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক হইলেন। যাত্রার দিন স্থির হইল। বুড়ো বাবা বলিতেন, "ঐদিন খুব ভোরে উঠে শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজোর পর আমাকে বল্লেন, 'এদিকে এস।' আমি নিকটে গেলে আমার কপালে দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, আসন পেতে খেতে বসালেন। আমি যখন খাচ্ছি তখন দেখি দোরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁদছেন। দুই চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার সময় মা যেমন কাঁদে। আমি তো অবাক! খাওয়া দাওয়া শেষ হলে শশী মহারাজ আমাকে নিয়ে ষ্টেসনে গেলেন, একখানি ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কেটে আমায় গাড়ীতে বসালেন, তখনও তিনি কাঁদছেন। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে আমি দেখলুম, যতক্ষণ আমায় দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।"

বুড়ো বাবার মাদ্রাজে অবস্থান কালে আর একটি ঘটনার বিষয় আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম। পূজনীয় শশী মহারাজ ও বুড়ো বাবা একই ঘরে রাত্রে শয়ন করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শশী মহারাজ "দীনু" "দীনু" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ( বুড়ো বাবা তখন "দীননাথ" নামে পরিচিত ছিলেন। ) বুড়ো বাবা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন, "দেখ দীনু, স্বপ্ন দেখলুম যেন নরেন ( স্বামী বিবেকানন্দ ) আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে—'শশী, থুতুর মত আমি শরীরটাকে ফেলে দিয়ে এসেছি'।" ইহাতে তাঁহাদের উভয়েরই মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পরের দিন স্বামিজীর দেহত্যাগের নিদারুণ সংবাদ লইয়া যখন বেলুড়-মঠ হইতে 'তার' আসিল, তখন স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে প্রচার কার্য্যে কখনও কখনও মাদ্রাজের বাহিরে ব্যাঙ্গলোর, ট্রিভাঙ্কোর, বোম্বাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও গমন

করিতে হইত। ১৯০৩ সালে তিনি বেদান্ত সোসাইটির সভ্যগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মহীশূরের রাজধানী ব্যাঙ্গলোর গমন করেন। তথায় তিনি জনসাধারণের নিকট 'Message of Sri Ramkrishna to the world', 'What is yoga' ও 'Vedanta' সম্বন্ধে ইংরাজীতে এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় একটি চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে শশী মহারাজ স্বামী আত্মানন্দকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঙ্গলোর আসিয়া তথায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের সহিত তিনি আর একবার ব্যাঙ্গলোর যান এবং ১৯০৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত শেষবার তথায় গমন করিয়া বর্ত্তমান ব্যাঙ্গলোর মঠের উদ্বোধন কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সোলাপুর যান। ঐ সালের শেষাশেষি তিনি প্রচার কার্য্যে রেঙ্গুন গমন করেন। ১৯০৫ সালের প্রারম্ভে, শশী মহারাজ পুনরায় ধর্ম্মপ্রচারকরূপে বোম্বাই যান এবং তাহার কিছুদিন পরে তিনি ঐ কার্য্যে রাজমহেন্দ্রি, ত্রিচিনাপল্লি, শ্রীরঙ্গম, পুদুকোটি-নেটিভ-ষ্টেটে গমন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি রাজোচিত সম্মানলাভ করিয়া মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসেন।

এতদিনে সেই কর্ম্মক্লান্ত শরীরে চিরবিশ্রাম সুখলাভের সময় আসিল। ইতিপূর্ব্বেই বহুমূত্র পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষয়-কাশ আসিয়া তাঁহার শেষ দিন আরও আসন্ন করিয়া তুলিল। গুরুভ্রাতা-গণ শশী মহারাজকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার চিকিৎসাভার সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজগণের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রভু যাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জগতের কোন কিছুই সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গতিপথে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-শাখা-মঠে যখন শশী মহারাজ রোগশয্যায় শায়িত তখন একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার জনৈক সেবককে বলিলেন, "আমি ঠাকুরের গান শুনবো।" তখনই শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি গান রচনা করিয়া দিলেন, সুগায়ক পুলিন বাবু আসিয়া সেই গান গাহিলেন,—

পোহাল দুখ রজনী
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে
হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়
যার নামে পূর্ণ অবনী।
কহিছে জননী—কেঁদ না
রামকৃষ্ণ পদ দেখ না
হের মোর পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে
ভুবন তারণ গুণমণি।

গান শুনিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, "আমি ঠিক এই ভাবের গানই শুনতে চেয়েছিলুম।"

তারপর মহাপ্রয়াণের দিন ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইল। ২১শে আগষ্ট ১৯১১ খৃষ্টাব্দ (১৮৩৩ শকে বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীগুরুর অভয় পাদ-পদ্মে চিরকালের জন্য মিলিত হইলেন।

* * * *

ফুলের গাছ যেমন অপরের জন্যই অঙ্কুরিত হয়, অপরের জন্যই মঞ্জুরিত হয়, অপরের জন্যই মুকুলিত হইয়া পুষ্পদান করে, তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, নিজের জন্য সে কোন দিন কিছুই চাহে না, তাহার কাজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষিতে পুষ্পিত হওয়া, আর প্রভাতে হাসি-মুখে সেই পুষ্পভার নিঃশেষে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ঢালিয়া দেওয়া, সারা জীবন অন্যের সুখের জন্যই সে যেমন বাঁচিয়া থাকে, তদ্রূপ শশী মহারাজের এই অমূল্য মানব-জীবন আমাদের সুখ, আনন্দ ও আদর্শ দান করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, দলিত হইয়াও উহা কণ্টকবিদ্ধ করে নাই, কেবল গন্ধই দান করিয়াছে।

( সমাপ্ত ) —চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

# দীনের গান

দীনের দুখের কথা
কেহ নাহি শুনে হায়
দীনের বুকের ব্যথা
বাতাসে মিলায়ে যায়।

পরণ কুটীরে দুখে
নীরবে কাঁদিছে দীন
বিশ্ব-জননীর বুকে
বাজিছে সে স্বর ক্ষীণ।

তাই না আজিকে মোর
হৃদয়ের তারে তারে
নীরব ক্রন্দন সুর
বেজে উঠে বারে বারে।

আজি এ বীণায় তাই
গাহিব দীনের গান—
গরীব আমার ভাই
গরীব আমার প্রাণ।

হে মোর পতিত দেশ,
ধনীর দুয়ারে বাঁধা
পড়েছ আরামে বেশ
তাই কি লেগেছে ধাঁধা ?

তাই কি দেখ না আর
নিজের সন্তানগণে ?
তাহাদের হাহাকার
তাই কি পশে না কাণে ?

অথবা নিজের দোষ
দুখিনী জনম ভূমি
না দেখি করিছি রোষ
ক্ষম গো আমারে তুমি।

মুখের সুমুখে ওই
অযাচিত অন্ন ভার
ধরে ছিলে স্নেহময়ী
বুঝি নি আদর তার।

দীনের গরাস কাড়ি
পরের চরণে ডালি
ক্ষুধিত স্বজনে ছাড়ি
তাই ত দিয়েছি ঢালি।

আমরা ধনীর দল
ভেবেছিনু তব স্নেহ
পাব মোরা অবিরল
দীনেরা পাবে না কেহ।

শোননি মোদের কথা
দীনেও লয়েছ কোলে
গরবে পাইয়া ব্যথা
তাই গেছি দূরে চলে।

দীনেও দিয়াছ ভাত
ধনীর সমান ভাগে
কত কথা দিন রাত
শুনায়েছি সেই রাগে।

বুঝি নি, বুঝি নি তবে
মার কাছে ভেদ নাই
তোমারি সন্তান সবে
ধনী দীন এক ভাই।

দুর্ভাগ্য জননী, তোর
অভাগা সন্তান মোরা
ছাড়ি নাই মোহ ঘোর
রয়েছি আঁধারে ঘেরা।

স্বদেশ বাসীরে তাই
দীন বলি করি হেলা
বিদেশে ছুটিয়া যাই
দেখিয়া ধনীর মেলা।

দেশকে না বাসি ভালো
বিশ্বেরে বাসিতে চাই
দেশকে না দিয়া আলো
বিশ্বেতে বিলা'তে যাই।

বুঝাই কতই তোরে
মহান উদার মোরা
বাঁধিব প্রেমের ডোরে
নিশ্চয় আজি এ ধরা।

উজাড় করিয়া তাই
ভাণ্ডারের রত্নরাজি
বিদেশীরে বলি ভাই
অরঘ দিতেছি আজি।

সোণার ভাতের থালা
ভাঁড়ারের চাবিগুলি
গলার মুকুতা মালা
বিদেশীর হাতে তুলি

দিতেছি সকলি হেসে
শুনি না বারণ তোর
কত তোর গেছে ভেসে
শতধারে অশ্রুলোর।

ছুটেছি বিশ্বের টানে
বড়ই উদার তাই
তাই ত দেশের পানে
তাকাতে সময় নাই।

বড়ই উদার কিনা
তাতেই সাগর পারে
মরে কেবা অন্ন বিনা
খুঁজে দেখি বারে বারে।

তাদের বাঁচাতে মোরা
না ডাকিতে ছুটে যাই
মোদের চাহে না তারা
তবু করি 'ভাই' 'ভাই'।

হেথায় গৃহের দ্বারে
মরিছে দেশের লোক
ফিরেও দেখি না তারে
তাহাতে করি না শোক ।

তাহার দীনতা দেখি
তাহারে বলি না ভাই
রোগ জীর্ণ দেহ দেখি
ঘৃণা ভরে সরে যাই ।

কাঁদি না তাহার তরে
দেখি না তাহার দুখ
নিঠুর আঘাত করে'
ভেঙে দিই তার বুক ।

বুঝিনা জননী তোরি
বুকে বাজে সেই ব্যথা
দীনে অপমান করি
পূজা তাই হয় বৃথা ।

দিয়েছি জননী তোরে
না ভাবি কতই দুখ
দীনেরে আঘাত করে
ভাঙিয়াছি তোর বুক ।

হৃদয় আঁধারে রাখি'
জননী জনম ভূমি,
বারে বারে কত ডাকি
তাতেই আস না তুমি ।

হায়, অন্ধমোহে মেতে
তোমারে ভুলিয়া যাই
ধনীর প্রসাদ পেতে
ধনীর পশ্চাতে ধাই ।

ধনীর কল্পিত দুখে
দেখাই কতই দুখ
ধনীর কল্পিত সুখে
দেখাই কতই সুখ ।

ধনীর ইঙ্গিত মত
ঢেলে দিই অর্থরাশ
দীনে করি আশাহত
কাড়িয়া মুখের গ্রাস ।

দীনের প্রকৃত দুখে
হাসিয়া উড়াই কত
যদিও আমরা মুখে
দীনের কল্যাণে রত ।

দীনে লয়ে করে মজা
এ রূপেতে যে সমাজ
উড়াব বিদ্রোহ-ধ্বজা
তাহার বিরুদ্ধে আজ ।

যে সমাজে কাঁদে দীন
পাইয়া বেদনা ঘোর
যাহারা হৃদয়-হীন
সে সমাজ নহে মোর ।

ধন-গর্ব্ব পদে পদে
　　যারা মাথা পেতে লয়
অন্যায়ের প্রতিবাদে
　　যাহাদের লাগে ভয়।

যাহারা দেশের নামে
　　নিজের প্রচার চায়
মাতিয়া বিশ্বের প্রেমে
　　দীনদেশে ভুলে যায়।

দীনহীনে ছাড়ি যারা
　　অর্থেরে পূজিতে ধায়
এ দীন দেশের তারা
　　কেহ নয়, কেহ নয়।

দেশের সেবার নামে
　　যারা চাহে নিজ সুখ
নামাইয়া মহারণে
　　পলায়নে উন্মুখ।

নিজেরা সুবিধা বাদী
　　না হ'তে যুদ্ধের শেষ
সাদরে শত্রুরে ডাকি
　　মিলে যারা যায় বেশ,

দীনের শ্রমের ধন
　　দেশের উদ্ধার ছলে
শুষিতে চাহে যে জন ;
　　দীনে অন্ন দেবে বলে'।

টাকার গদিতে বসে'
　　ধন ভিক্ষা নিতে লাজ,
এ দীন দরিদ্র দেশে
　　নাহি পায় যে সমাজ।

দীনের দুর্দ্দশা দেখি
　　ফিরাইয়া লয় মুখ
যে জাত ; মানি না তারে
　　কপট তাহার দুখ।

বুঝিনা ত' একি ধাঁধা
　　দীনের সুখের লাগি'
দীনের মুছাতে অশ্রু
　　তারই কাছে ভিক্ষা মাগি।

দীনের ভাণ্ডার লুটে
　　তারেই বিতরি অন্ন
তাতেই 'মহৎ' বলে
　　দীন করে ধন্য ধন্য !

জানে না নিজের বল
　　তাই ত নিজেরে হীন
মনে করে, দেশবাসী
　　ভাবে তারা অতি দীন।

তাই ত জাগাতে চাই
　　চাহি গো জানাতে আজ
দীনেরই শকতি বলে
　　চলিছে বিশ্বের কাজ।

দীন যদি ছেড়ে দেয়
আজি এ বিশ্বের হাল
সমস্ত সংসার তবে
হয়ে যায় বান্‌চাল ।

উঠ, জাগ দেশবাসী
ঘুমাইবে কত আর
ধনের গরব নাশি
দরিদ্রের হাহাকার

মিটাও মিটাও ; আর
না হয়ে ধনের দাস
দীন-হীনা জননীর
ঘুচাও মলিন বাস ।

রিপুর নিগড়ে বাঁধা
থেক না, থেক না আর
কোমল বিলাস বাধা
ছিন্ন কর বলি—ছার ।

নাশ গো দেশের দুখ
ফুটাও দীনের হাসি
মায়ের আশীষ লহ
দীনজনে ভালবাসি ।

হে দীন জননী মোর
ছিঁড়িয়া আলস্য পাশে
তোমারে পূজিতে চাই
কর্ম্মের নৈবেদ্য রাশে ।

সার্থক হোক্ এ পূজা
মিটাও মনের সাধ
আজিকে জননী মোরে
কর এই আশীর্ব্বাদ ।

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

# এক দিনের ঘটনা

পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ একবার কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের যেখানে ভোজনের আসন হইয়াছিল, সে স্থান হইতে দূরে এক পার্শ্বে তাঁহাকে আসন দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার থালায় কেবল ভাত, ডাল ও একটা তরকারি দিবার পর যখন বাড়ীর গৃহিণী তাঁহার আর কি আবশ্যক তাহা আদৌ লক্ষ্য করিলেন না অথচ সেই সমাগত ভদ্রলোকদিগকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার ব্যঞ্জন, দধি, পায়স, মিষ্টান্নাদি পরিবেষণ করিতে লাগিলেন তখন নিজের হতাদর দর্শনে লাটু মহারাজের মন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এমন কি মনের দুঃখে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনই তিনি মনের এই আবেগ দমন করিয়া ফেলিলেন। তিনি মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া এখনো কি উচ্চসম্মান পাইবার আশা পোষণ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয় না? গৈরিক বসন পরিধান করিয়া কি গৃহস্থের মাথা কিনিয়াছ যে, সে তোমাকে আহ্বান করিয়া একমুঠা অন্ন দিয়াছে—ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া না মানিয়া তাহার বিনিময়ে গৃহস্থের অকল্যাণের জন্য চোখের জল ফেলিয়া যাইবে? মন, তুমি এমনি অকৃতজ্ঞই বটে; যাহার নিকট এক দিনেরও উপকার পাইলে তাহার যাহাতে অকল্যাণ এবং অনিষ্ট হয় তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছ। গৃহস্থেরা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং ভুল ভ্রান্তি তো আছেই, আজ সারাদিন ঘুরিয়াও হয় তো কোথাও ভিক্ষা মিলিত না, এই গৃহস্থ-পরিবার যে সেই পরিশ্রম হইতে রক্ষা করিয়া দুই মুঠা অন্ন দিয়াছে, তাহাই অম্লানবদনে ভোজন করা উচিত। এই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিয়া ডাল, ভাত ও তরকারি একত্রে মিশাইয়া, খুব তাড়া-

তাড়ি ভোজন শেষ করিয়া যখন সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে হাত ধুইতেছেন, তখন গৃহিণী তাঁহার নিকটে দ্রুত আসিয়া অতি কুণ্ঠিতভাবে ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—অন্যান্য লোকের সেবা পরিচর্য্যাতে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহাকে আরো পাঁচ রকম ব্যঞ্জন, দধি, পায়স, মিষ্টান্নাদি দিবার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে, মহারাজ যেন রাগ না করেন সেজন্য বারম্বার তাঁহার নিকট তিনি ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজ তাঁহাকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া আশ্বাস এবং অভয় দিলেন। তাহার পর তথায় অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া গৃহস্থের যাহাতে কোন অকল্যাণ না হয় তজ্জন্য কিছু জপ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

শ্রী—

# সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার

**সাংখ্য দর্শন—**

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল সম্পাদিত সাংখ্যদর্শন-কারিকা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। 'নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানম্' অতএব যিনিই এই সাংখ্য-জ্ঞান সাধারণের সুগম করিয়াছেন তিনিই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। রায় মহাশয় ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার উপর তাঁহার বাংলা টীকা দ্বারা উহাই করিয়াছেন। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সেই পণ্ডিতজন গৌড়পাদের ভাষ্য ও বাচস্পতির তত্ত্বকৌমুদী পাঠ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা সে রসে বঞ্চিত, তাঁহারা রায় মহাশয় রচিত এই সোপানের সাহায্যে অনায়াসে সাংখ্য-তত্ত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে পারিবেন।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে প্রত্যেক কারিকার বিষয়-নির্দ্দেশক একটি সূচীপত্র এবং গ্রন্থশেষে একটি শব্দানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে তত্ত্ব-সমাসোক্ত সূত্রগুলির মূল ও অনুবাদ মুদ্রিত

করিয়াছেন। ইহার দ্বারা গ্রন্থের উপকারিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্গভাষা-ভাষীকে আমি এই গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে বলি। ইতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শে ভাদ্র, কলিকাতা।

VOICE OF TRUTH—বার্ষিক মূল্য পাঁচ ডলার, সম্পাদক—স্বামী বিদেহানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিদেহ। কোয়ালালামপুর, এফ-ম-এস, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে নব-প্রকাশিত ইংরাজি মাসিক পত্রিকা।

শ্রমিক—বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

সম্পাদিকা—শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়।

শ্রমিক আন্দোলনের মুখপত্র—সাপ্তাহিক।

---

# সংঘ-বার্ত্তা

## উটাকামণ্ডে মঠ-প্রতিষ্ঠা

মাদ্রাজের অন্তর্গত নীলগিরি পাহাড়ের উপর উটাকামণ্ড সহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ কর্ত্তৃক গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৭,৫০০ ফিট উচ্চ Hill slopeএ মঠটি অধিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে কোন লোকালয় নাই, কাজেই স্থানটি এত নির্জ্জন যে মনে হয় সমস্তই ধ্যানস্থ; জোর করিয়া ধ্যান করিতে হয় না, আপনা হইতেই মন অন্তর্ম্মুখী হইয়া আসে।

২৪শে প্রাতে স্থানীয় ভক্তগণ বাস্তুপূজা প্রভৃতি কাজ পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া, মহা সমারোহে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দকে লইতে আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বড় ফটো ফুল ও মালা দিয়া সাজাইয়া নূতন

মঠে লইয়া যাওয়া হয়। Processionএর সঙ্গে পুরোহিতের দল বেদ পাঠ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঐ দেশের প্রথামত তাঁহারা কর্পূরের আরতি করিলেন। তাহার পর পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোখানি মন্দিরের ভিতর সিংহাসনে বসাইলেন। আরাত্রিকাদি শেষ হইলে Local Committeeর secretary একটি report পাঠ করিয়া উক্ত মঠ ও মন্দির মিশনের হাতে সমর্পণ করিলেন। বৈকালে স্বামী যতীশ্বরানন্দ Ideal and teachings of Sri Ramkrishna সম্বন্ধে মঠ-হলে একটি বক্তৃতা দেন। মিশনের Activity সম্বন্ধে স্বামী অবিনাশানন্দ তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মঠ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে স্বামী যতীশ্বরানন্দ সহরে তিন দিন তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন; বক্তৃতার বিষয় ছিল,— Essential principles of Hinduism, Ideals of worship, এবং Aggressive Hinduism.

স্বাগতম্

স্বামী প্রভবানন্দ, মিসেস্ চাইল্ড ও আমি, স্বামী পরমানন্দ এবং তাঁহার সহিত নবাগত স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দের অভ্যর্থনার জন্য ১৫ই জুন পোর্টল্যাণ্ড হইতে সানফ্রান্সিস্কো রওনা হইলাম।

তাঁহাদের জাহাজ ১৮ই জুন সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে আসিয়া লাগিল। স্বামী প্রভবানন্দ 'মন্দিরে' ( Temple ) তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত ছাত্র এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে স্বামী পরমানন্দ, স্বামী অখিলানন্দকে লইয়া সেখান হইতে লস্ এঞ্জেলস্ ( Los Angels ) রওনা হইলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ সেই সময় 'শান্তি আশ্রমে' ছিলেন। আমরা স্বামী দয়ানন্দকে লইয়া মোটরে সেখানে রওনা হইলাম এবং বৈকালে পৌঁছিলাম।

'শান্তি আশ্রম' Antone Valleyতে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের জমি স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

চার দিন 'শান্তি আশ্রমে' থাকিবার পর আমরা সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ফিরিয়া আসিলাম।

রবিবারে স্বামী প্রভবানন্দ স্বামী দয়ানন্দকে 'মন্দিরে' (Temple) উপাসনার সময় বেদান্ত সোসাইটির সভা এবং হিতৈষিগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া আমেরিকায় কার্য্যোপযোগী হইবার ইচ্ছা জানাইলেন। তাঁহার সেই কয়েকটি কথার মধ্যেই সকলে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য, স্থির-প্রতিজ্ঞা এবং সদিচ্ছার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

পোর্টল্যাণ্ড, ওরিগণ। —লোটি আই, স্কট।

### শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি

আগামী ১১ই পৌষ ইং ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর চতুঃসপ্ততিতম জন্মতিথি। বেলুড়মঠে এবং কলিকাতা, বাগবাজার বসুপাড়া ৫নং নিবেদিতা লেনস্থ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় বাটীতে তদুপলক্ষে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে। পুরুষ ভক্তগণ ঐ দিবস বেলুড়মঠে এবং স্ত্রী ভক্তেরা উক্ত বিদ্যালয় বাটীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমাতৃ-দেবীর পুণ্য দর্শন ও প্রসাদ লাভে ধন্য হইবেন।

---

# শেষকথা

পুরাতনের জীর্ণ নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া নূতন আত্মপ্রকাশ করে। অব্যক্তে লীন অতীত জগতের বীজ হইতেই অনাগত জগতের সৃষ্টি, সর্ব্বত্র ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রাসাদ ধ্বংস হইয়া ধূলিকণারূপে পরিণত হয়, তাহাতেই আবার নবসৌধ গড়িয়া ওঠে, বারিবিন্দু বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া পুনরায় নববর্ষার শ্রাবণধারায় ঝরিয়া পড়ে, পুষ্পরেণু শুকাইয়া, ফল হইয়া, পাকিয়া, পচিয়া নববৃক্ষে নূতন মুকুলরূপে দেখা দেয়; ভগবানের যুগবাণীও ঠিক এমনি করিয়া নবকণ্ঠে, নবগানে, নব-

রূপে, নবছন্দে ধ্বনিত হইয়া সেই চিরপুরাতন কথাই আমাদের কাছে নবভাবে বলিয়া যায়, যাঁহার কণ্ঠে সেই বাণী প্রথম ধ্বনিত হয় তিনিই সেই যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, চালক, নিয়ন্তা। যে যুগে যে মন্ত্র প্রয়োজন সেই যুগের ঋষি তাহাতে সিদ্ধ হইয়া, তাহার ফল জাতির কল্যাণের জন্য রাখিয়া যান—শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল অবতারেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। যাহা সত্য, যাহা সনাতন সেই বাণীই এবার শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে, তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছে, তাই উহাই এবারের যুগবাণী। এই বাণীই আজ ভারতের ধর্ম্মে, কর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে সত্য হইয়া জাতির গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে। ধর্ম্মে ইহা নবভাব আনিবে, কর্ম্মকে তমোগুণ বিমুক্ত করিবে, রাষ্ট্রে নূতন গতি দিবে, সমাজকে উদার করিবে, শিল্পে চিরসুন্দর প্রকাশিত হইবে এবং সাহিত্যকে জাতির ও জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের ভাবসম্পদে ভরিয়া তুলিবে।

যুগাবতারের এই কর্ম্ম সাধন করিতে ‘উদ্বোধনের’ জন্ম, তিনিই ইহার স্রষ্টা ও পালয়িতা। জন্মাবধি আটাশ বৎসর ধরিয়া সে ইহাই করিয়াছে এবং যতদিন বাঁচিবে অনাবৃত, অকপট ও সহজ সত্যের উপর দাঁড়াইয়া সে ইহাই করিবে। অতীত ও অনাগত বর্ষের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মুক্ত কণ্ঠে আমরা আজ বলিতেছি—যাহা তোমার বাণী কেবল তাহাই ইহাতে সত্য হউক, আর যাহারা ইহার সেবক তাহারা তোমারই যন্ত্রস্বরূপ—এই বুদ্ধি তাহাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক্।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

নব বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অপ্রকাশিত ঘটনাবলী প্রকাশিত হইবে।

# ঢাকা শক্তিঔষধালয়।

( ১৩০৮ সালে স্থাপিত )

ঢাকা, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, গৌহাটী, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কাশী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, রাজসাহী, মেদিনীপুর, বহরমপুর, মাদারীপুর, ভাগলপুর ও কাণপুর।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭১।১ রসারোড, ভবানীপুর।

## ঢাকা শক্তিঔষধালয়ে ঔষধের বিশিষ্টতা

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্রীয় ঔষধগুলি বিশ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ পূর্ণমাত্রায় ও বিশুদ্ধভাবে বার বার প্রস্তুত করিয়া ঔষধে "ঋষিশক্তি" বজায় রাখিতে শক্তিঔষধালয় যে সুবিধা ভগবানের কৃপায় পাইয়াছে তাহা কুত্রাপি কেহ পায় নাই। সেই জন্যই শক্তিঔষধালয়ের ঔষধের একটা "বিশিষ্টতা" জন্মিয়াছে; অর্থাৎ শক্তিঔষধালয়ের ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী, পাক-প্রণালী, আস্বাদন, উপকারিতা ও বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ। এ কথা গ্রাহকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিলে বিশেষ একটি লোকহিতকর কার্য্য করা হইবে মনে করিয়াই "ঢাকা শক্তিঔষধালয়ের ঔষধের বিশিষ্টতা" সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লউন এবং "আত্মহিতায় বহুজনহিতায় চ" এই সত্য গ্রহণ করুন এবং সর্ব্বত্র প্রচার করুন।

শক্তিঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া—হরিদ্বারের মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানন্দগিরি মহারাজ অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলিয়াছিলেন—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপ্ তো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।" রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী লিখিয়াছেন—"এরূপ বিপুল আয়োজনে ও বহুল পরিমাণে ঔষধ (manufacture) প্রস্তুত হয় দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলাম। এখানে প্রত্যেক ঔষধই অধ্যক্ষের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ঠিক ঠিক শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে প্রস্তুত হইতেছে।" ইত্যাদি—বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির গবর্ণর লর্ডলীটন বাহাদুর লিখিয়াছেন—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement) এই কারখানার কার্য্য কলাপ অতীব সুচারুরূপে ও সুবন্দোবস্তের সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং এই কারখানাটি সুচারুরূপে চালাইবার জন্য আবশ্যকীয় উপকরণাদি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর লিখিয়াছেন—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি।" ইত্যাদি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয় লিখিয়াছেন—"শক্তিঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান যেরূপ সুচারুভাবে চলিতেছে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" এইরূপ নবাব সামসুল হুদা, সার হেনরী হুইলার প্রভৃতিও অনেক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

সারিবাদ্যরিষ্ট—যকৃতের যে কোন প্রকার দোষ নিশ্চয় দূরীভূত করে এবং লিভারকে কার্য্যক্ষম রাখিয়া মল-মূত্রসহ পিত্তনিঃসরণ করিয়া পিত্তাধিক্যের সমতা করে। হাত-পা জ্বালা, চক্ষু জ্বালা, দাহ প্রভৃতি বায়ু-পিত্ত রোগ দূরীভূত করে। পিত্ত দূষিত হইলে রক্তও দূষিত হয় মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা।

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ জ্বরান্তকযোগ—৷৹ সপ্তাহ। সর্ব্বজ্বরকুলান্তক "অমৃতারিষ্ট"—৸৹ শিশি।

কেশবর্দ্ধক, কেশপাত ও টাকনিবারক, মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারক আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল। মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের।

দ্রষ্টব্য:—( কয়লার পাকে ঔষধ জ্বাল দেওয়া হয় না। )

REGISTERED NO C295.


অল্প খরচায় পরম আনন্দ!

চলতি মূল্যে সর্ব্বজন প্রিয়

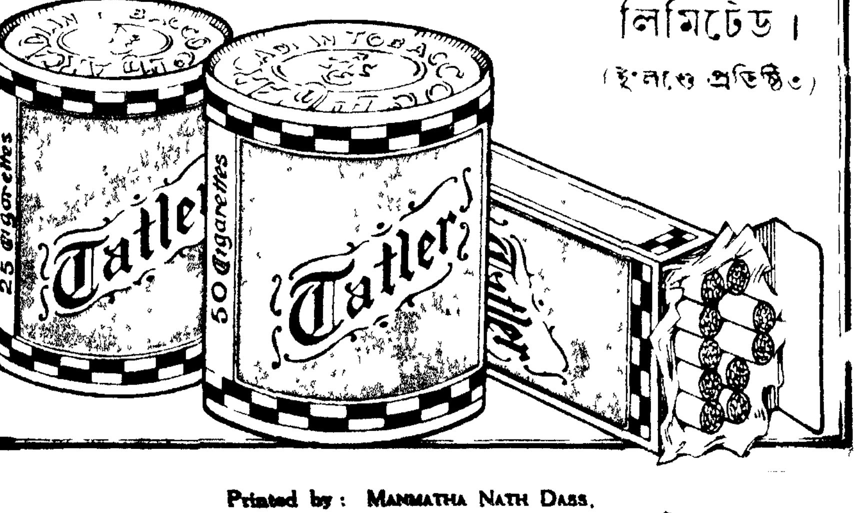
# ট্যাটলার

ভার্জিনিয়া সিগারেটের

ধূমপান করিয়া আপনার খরচার হ্রাস করুন।

প্রত্যেক টিনে ৫০টী
২৫টী
প্যাকেটে ১০টী

আরকেডিয়ান
টোব্যাকো কোং
লিমিটেড।
(ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত)





Printed by: Manmatha Nath Dass,
Sri Gouranga Press, 71/1, Mirzapur Street, Calcutta.